মাসুদ রানা
খুনে মাফিয়া
কাজী আনোয়ার হোসেন

খুনে মাফিয়া

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

এক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হয়েছে প্যান অ্যাম এয়ারলাইন্সের বোয়িং, প্রায় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে ফ্লোরিডা রাজ্যের ক্যাটস্‌কিল এয়ারপোর্টে। আরও অনেক বিশিষ্ট যাত্রীর সঙ্গে এক্সিকিউটিভ ক্লাসে রয়েছে দুর্ধর্ষ বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা।

এবার রুটিন একটা কাজে আমেরিকায় আসা, বিশটা রাজ্যে রানা এজেন্সির বাহান্নটা শাখা ভিজিট করতে হবে। কাজ-কর্মের অবস্থা কী দেখবে, প্রয়োজনে জট ছাড়িয়ে দেবে; ব্যবসার হিসাব-পত্রে চোখ বুলাবে; প্রিয় এজেন্টদের সঙ্গে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেটাও একটু ঝালিয়ে নেওয়া হবে।

আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে ঝকঝকে-তকতকে মাঝারি আকারের শহর ক্যাটস্‌কিল। ধনী, কম ধনী, বোকা, ভালমানুষ, ধান্দাবাজ, শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো—পাঁচমেশালি মানুষের বসবাস এখানে।

পাশে ওই রকম আরেকটা শহর সানসিটি, সেটাও আটলান্টিকের তীরে। ওখানেও রানা এজেন্সির শাখা আছে, দুটোর মধ্যে দূরত্ব মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার। এত কাছাকাছি দুটো শাখা থাকার কারণ হলো, শহর দুটোয় অপরাধের সংখ্যা খুব বেশি।

ক্যাটস্‌কিল শাখার প্রধান মলি চৌধুরি, তার সহকারী লরেন্স সাইমন। সানসিটি শাখার প্রধান নাহিদ হাসান, সহকারী তারই স্ত্রী টিসা হাসান। টিসা স্প্যানিশ-আমেরিকান, রানা এজেন্সিতে ভর্তির লক্ষ্যে ট্রেনিং নেওয়ার সময় পরস্পরের প্রেমে পড়ে ওরা, তারপর খুব তাড়াতাড়ি বিয়েও করে ফেলে।

রাত নয়টা। একটা সাদা মার্সিডিজ নিয়ে এয়ারপোর্টে রানাকে রিসিভ করতে এসেছে সানসিটি শাখার অপারেটর রয় ফিজিও। আর সবার মত রয়ও রানার ভক্ত; বিশ্বস্ততা, আনুগত্য এবং দক্ষতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

তবে রয় ফিজিওর অতীত একটু রহস্যময়; কেউ জানে না মাত্র দেড় বছর আগে কোত্থেকে এসে জয়েন করল চাকরিতে, কীভাবেই বা স্বয়ং এজেন্সি ডিরেক্টরের এত বিশ্বস্ত, এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারল।

একসময় অত্যন্ত বিপজ্জনক এলাকা বলে গণ্য করা হত সানসিটি আর ক্যাটস্‌কিলকে, সেই তখন থেকেই রানা এদিকে এলে ওর শোফার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে রয়। তবে নিজেকে বস্‌-এর বডিগার্ড বলে ধরে নিয়ে মনে মনে ভারি গর্ব অনুভব করে ও।

রানাকে নিয়ে প্রথমে সরাসরি ক্যাটস্‌কিল শাখাতে চলে এল রয়। এখানকার

কাজ শেষ হলে ওকে পৌঁছে দেবে 'ফাল্গুন' ভবনে। নিজেও হয়তো থাকবে ওখানে, কারণ কাল সকালে রানাকে নিয়ে সানসিটিতে যেতে হবে।

সানসিটি-ক্যাটস্‌কিল শহরের ঠিক মাঝখানে পাপিট রোড, ওই রোডের শেষ মাথায় ফাল্গুন নামে দোতলা বাড়িটা এক সময় রানা এজেন্সির সেফ-হাউস হিসাবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু মাফিয়া ডন ডিকো ভিটোরির তাণ্ডব চলার সময় ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। এর পর থেকে অনেকদিন খালি পড়েছিল বাড়িটা, শুধু রানা এলে দিন কয়েক থাকত। পরে, রানার অনুমতি নিয়ে, ক্যাটসকিলের শাখা-প্রধান মলি চৌধুরি উঠেছে ওখানে। একতলায় একা থাকে সে। রানা এলে দোতালায় ওঠে।

বছর দেড়েক আগে পর্যন্ত ফ্লোরিডা রাজ্যের এই দুই শহরকে জ্বলন্ত নরক বানিয়ে রেখেছিল মাফিয়া ডন ডিকো ভিটোরি আর তার গুণ্ডা-পাণ্ডারা। পরিস্থিতি এতটা খারাপ হওয়ার পিছনে কারণও ছিল। রক্ষক ভক্ষক হয়ে উঠলে যা হওয়ার কথা এখানেও তা-ই হয়েছে।

তবে ও-সব নিয়ে ক্যাটস্‌কিল শাখার এজেন্টরা এই মুহূর্তে মাথা ঘামাচ্ছে না। ওরা ওদের প্রিয় মাসুদ ভাইকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে আছে।

করমর্দন, কুশলাদি বিনিময়, আপ্যায়ন ইত্যাদি শেষ হওয়ার পর রানাকে ওর ব্যক্তিগত চেম্বারে নিয়ে এল শাখা-প্রধান মলি চৌধুরি, ওদের সঙ্গে মলির সহকারী লরেন্স সাইমনও রয়েছে।

সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, সাহসী এজেন্ট মলি। একহারা গড়ন, খুব ভাল জুডো-কারাতে জানে। তার পরেও সব সময় একটু নার্ভাস দেখায় ওকে।

তবে আজ একটু বেশিই নার্ভাস দেখাচ্ছে মলিকে। তার কারণ হলো জরুরি একটা কাজে কোথাও যেতে হয়েছিল ওকে, ফেরার সময় ঘণ্টায় একশ' মাইল স্পিডে গাড়ি চালাতে হয়েছে—ভয় পাচ্ছিল তা না হলে মাসুদ ভাইকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত থাকতে পারবে না। ভাগ্য ভাল, সময়মতই ফিরতে পেরেছে ও, কেউ ওকে কোনও প্রশ্নও করেনি।

ক্যাটস্‌কিলের মলি চৌধুরি, সানসিটির নাহিদ হাসান, বছর পাঁচেক আগে ঢাকায় এই দুজনকে নিজে ট্রেনিং দিয়েছে রানা। মলিকে তখনই সাবধান করে দিয়ে বলেছিল ও, 'এই নার্ভাস ভাবটাকে বিদায় করো, তা না হলে সংকটের সময় ওটা তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করিয়ে দেবে।'

সমস্যাটা দূর করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেনি মলি, কিন্তু লাভ হয়নি কোনও। ডাক্তাররাও ওর এই রোগ সারাতে পারেননি। আসলে জন্মসূত্রেই ওর মানসিক গঠনটা এমন যে কোনও কারণ না থাকলেও সারাক্ষণ নার্ভাস বোধ করে।

আর নাহিদকে রানা বলেছিল... আপাতত সে-প্রসঙ্গ থাক।

ফাইল-পত্র যা যা দেখতে চাইতে পারে রানা তার সবই একটা সিডিতে কপি করে রাখা হয়েছে। চেম্বারে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসে পিসি অন করল রানা, সিডি

চালিয়ে ফাইলগুলো দেখছে।

কাজের ফাঁকে হঠাৎ খেয়াল হতে সাইমনের দিকে তাকাল ও, বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসো।' তারপর মনে পড়ল, বলে লাভ নেই—ছোকরা বসবে না।

'না, মানে, সব সময় তো বসেই থাকি, বস্,' সবিনয়ে বলল সাইমন। বাংলাটা যে-কোনও শিক্ষিত বাঙালির মতই বলতে পারে ও। বয়স মাত্র বত্রিশ, অত্যন্ত যোগ্য অপারেটর, ক্যাটস্‌কিল আণ্ডারওয়ার্ল্ডের কোথায় কী হচ্ছে সব ওর নখদর্পণে। সুদর্শন, মাথাভর্তি সোনালি চুল। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, পিস্তলে খুব ভাল হাত। চার বছর হলো বছর তিনেকের ছোট মলি চৌধুরির সহকারী হিসেবে কাজ করছে।

রানাকে এত বেশি শ্রদ্ধা করে সাইমন, ওর উপস্থিতিতে কক্ষনো বসবে না। রানাকে দেখামাত্র লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়াটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সহকর্মীরা সেজন্য বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না ওকে: 'মাসুদ ভাই বাঘ না ভাল্লুক যে ওঁকে ওরকম ভয় পেতে হবে!'

ঘণ্টাখানেক কাজ করল রানা। মাঝে-মধ্যে মুখ তুলে ওদেরকে দু'একটা প্রশ্ন করল। ভাব-ভাষাই বলে দিচ্ছে রিপোর্ট পড়ে খুশি ও।

'এবার, মলি, তোমার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাই,' পিসি বন্ধ করে মলিকে বলল রানা, 'কেমন চলছে সব?'

'এক চক্কর টহল দিয়ে আসি।' কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সাইমন, বুঝতে পেরেছে এখানে অন্য কারও উপস্থিত থাকা উচিত নয়।

শুধু একজন বাদে কেউ কোনও কাজ করছে না আজ। ওর নাম ঝরনা হক। রিসেপশনে বসে বরাবরের মত কিছু না কিছু ঠিকই করছে মেয়েটা। আর এ-ও সবাই জানে যে গুরুত্বহীন কোনও কাজে সময় নষ্ট করবার মেয়ে ঝরনা নয়।

সাইমন দেখল, এ-মুহূর্তেও তার কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কমপিউটারে এই মাত্র একটা তালিকা তৈরির কাজ শেষ করল ঝরনা। প্রিন্ট-আউটটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নিজে পড়ো, মলি আপাকে পড়তে দাও, তারপর বস্‌কে দেবে। কিছু যোগ করার থাকলে জানিয়ো।'

পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা ঝরনা, একরত্তি চর্বি নেই শরীরে, বয়স মাত্র সাতাশ। নিয়মিত ব্যায়াম করে, প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে অফিসে আসে। ছোট পরদার অ্যাড-এ মাঝে-মধ্যে মডেলিংও করে।

চার বছর আগে সরাসরি বিসিআই থেকে ঝরনাকে এখানে নিয়ে এসেছিল রানা। পরের বছরই শাখা-প্রধানের দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে রাজি হয়নি ও।

কাগজটা নিয়ে পড়ছে সাইমন। সাধারণ কোনও তালিকা নয়, মাসুদ ভাইকে দেওয়ার জন্য একটা সুপারিশমালা। প্রথমেই বলা হয়েছে, রেগুলার রিফ্রেশিং কোর্স বন্ধ থাকায় এজেন্টদের রিফ্লেক্স, দক্ষতা আর কাজের প্রতি উৎসাহ কমে যাচ্ছে।

অনুযোগের সুরে কিছু বলবার জন্য মুখ ফেরাতে সাইমন দেখল, এরইমধ্যে

অন্য একটা কাজে ডুবে গেছে ঝরনা।

'আচ্ছা, ঝরনা, সারাক্ষণ একটার পর একটা কাজ করতে তোমার খারাপ লাগে না?' জিজ্ঞেস করল সাইমন। 'আমার তো মনে হয় না কেউ তোমাকে কখনও বসে থাকতে দেখেছে।'

কাজ থেকে মুখ না তুলেই মৃদু শ্রাগ করল ঝরনা, বলল, 'কাজ থাকলে করতে হবে না?'

'কেন, একা শুধু তোমাকেই কেন করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল সাইমন। 'মণ্টানা তো সারাদিন বসে বসে মাছি তাড়ায়, ওকে দিয়ে করাতে পার না?'

'নতুন এসেছে, বয়স কম, রাত দশটার পর ওকে আমি কীভাবে কাজ করতে বলি!'

'মণ্টানা ছাড়াও অফিসে...'

'কাজ করতে আমার ভাল লাগে, সাইমন,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল ঝরনা।

'আমি এ-ও লক্ষ করেছি, অনেকে নিজের কাজ তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়...'

'আমি তাতে কিছু মনে করি না,' মৃদু হেসে বলল ঝরনা।

'কিন্তু তোমার বয়-ফ্রেণ্ডও কিছু মনে করে না?'

'কেউ আমাদের দিব্যি দিয়েছে, বোকার মতো উদ্ভট সব কথা বলতে হবে, সাইমন?' হঠাৎ করেই ঝরনার পটলচেরা চোখ দুটো ঠাণ্ডা হয়ে উঠল।

বিপদ-সংকেত চিনতে পেরে সাবধান হয়ে গেল সাইমন, প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'আচ্ছা, তুমিই বোধহয় এখানে সবচেয়ে পুরনো...'

এই সময় রিসেপশনের কাউণ্টারে রাখা একটা টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কথা বলল ঝরনা, 'রানা এজেন্সি, ক্যাটস্‌কিল ব্রাঞ্চ। গুড ইভনিং।'

তাকিয়ে রয়েছে সাইমন, লক্ষ করল বিস্ময়ে একটু উঁচু হলো ঝরনার ভ্রূ।

'বস্‌ ফ্রি আছেন কি না দেখতে হবে, লেফটেন্যাণ্ট,' বলে রিসিভারটা কাউণ্টারে নামিয়ে রাখল ঝরনা। 'সাইমন, মাসুদ ভাইকে বলো হোমিসাইড ব্যুরো-র লেফটেন্যাণ্ট মার্লি উইলিয়াম ফোন করেছেন। সরাসরি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'পুলিশ জানল কীভাবে যে বস্‌ ক্যাটস্‌কিলে?' বিড়বিড় করল সাইমন। 'জরুরি আলাপ করছেন, এখন কি ওঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে, ঝরনা?'

মাথা ঝাঁকাল ঝরনা, চোখ দুটোয় সতর্ক দৃষ্টি। 'বস্‌কে বলো, এটা বোধহয় আরও বেশি জরুরি।'

ঘুরে দাঁড়াবার আগে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঝরনাকে ভাল করে একবার দেখে নিল সাইমন, তারপর হন হন করে রানার চেম্বারের দিকে এগোল।

রিসিভার তুলে ঝরনা বলল, 'বস্‌কে খবর পাঠিয়েছি।'

অপরপ্রান্তে ভারি গলায় 'হুম!' করে একটা আওয়াজ ছাড়ল লেফটেন্যাণ্ট, তারপর বলল, 'কাউকে বলুন গ্যারেজ থেকে মিস্টার রানার গাড়িটা যেন বের করে রাখে। আমার কথা শোনার পর খুব তাড়াহুড়ো করবেন উনি।'

লেফটেন্যাণ্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরেকটা ফোন তুলে রয় ফিজিওর সঙ্গে

কথা বলল ঝরনা। 'রয়, গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে তৈরি হয়ে থাকো, মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে এখনই কোথাও যেতে হবে তোমাকে।'

'এত তাড়াতাড়ি...'

রয়কে থামিয়ে দিয়ে ঝরনা বলল, 'হোমিসাইড ব্যুরো থেকে লেফটেন্যান্ট মার্লি ফোন করেছেন। মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে যাচ্ছ তুমি, চোখ-কান খোলা রাখবে, ব্যস! কী বলছি বুঝতে পারছ?'

এক সেকেণ্ড পর ভারী গলায় বলল রয়, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

যোগাযোগ কেটে দিচ্ছে ঝরনা, দেখল চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, ভাঁজ করা হাতে কোটটা ঝোলাচ্ছে। পিছনে সাইমন।

কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে ইঙ্গিতে ক্রেডল থেকে নামানো ফোনের রিসিভারটা রানাকে দেখাল ঝরনা, বলল, 'লেফটেন্যান্ট মার্লি, মাসুদ ভাই; আপনার জন্যে লাইনে অপেক্ষা করছেন।' রানার চেম্বারে কানেকশন দেয়নি ও বসকে একটু সময় পাইয়ে দেওয়ার জন্য।

রিসিভার তুলল রানা। 'কী ব্যাপার, লেফটেন্যান্ট?'

ঝরনার কানের কাছে ফিসফিস করল সাইমন, 'বসের সঙ্গে কারও যাওয়া দরকার...'

'রয়কে বলা হয়েছে।'

'গুড।' মাথা ঝাঁকাল সাইমন।

রানাকে বলতে শুনল ওরা: 'কখন?'

চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা নিয়ে দৃশ্যটা দেখছে ঝরনা—কাউন্টারের উপর ঝুঁকে রয়েছে রানা, ভ্রূ দুটো কুঁচকে শূন্যে তাকিয়ে আছে, লম্বা কয়েকটা আঙুল কাউন্টারে ছোবল মারার ভঙ্গিতে স্থির।

রিসিভারে রানা বলল, 'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট। আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত কেউ যেন কিছু না ছোঁয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

রিসেপশনে পিন-পতন নীরবতা। মলিকে রানার চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ওরা, সে-ও কোনও আওয়াজ করছে না।

'গাড়ি?' ঝরনাকে জিজ্ঞেস করল রানা, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বদলে গেছে ওর চেহারা—ক্লান্ত, বিমূঢ়, ম্রিয়মান একজন মানুষ।

'দরজায়, মাসুদ ভাই,' বলল ঝরনা। ওর মত বাকি সবাইও উত্তেজনা-উদ্বেগে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

'খুব খারাপ একটা খবর,' বলল রানা, নিজেও জানে না কীভাবে স্বাভাবিক থাকতে পারছে। 'আমাদের হাসান...নাহিদ হাসান...' কথাটা শেষ করতে পারল না।

'মাসুদ ভাই?' নীরবতার মধ্যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, প্রায় কর্কশ শোনাল মলির গলা। 'কী হয়েছে নাহিদের?'

মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়েছে রানা, শান্ত ভাবে বলল, 'পুলিশ বলছে, মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করেছে ও—সুইসাইড।'

আঁতকে ওঠার আওয়াজ বেরুল কারও গলা থেকে। মুখে হাত চাপা দিয়ে

নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল ঝরনা।

আত্মহত্যা করেছে সানসিটি শাখার প্রধান নাহিদ হাসান? এ কীভাবে সম্ভব? কখন? কেন? কোথায়? প্রশ্নগুলো সবার মনে একযোগে ভিড় করে এল।

'কোথায় ও...কোথায় পাওয়া গেছে ওকে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল ঝরনা।

'সানসিটি ব্রাঞ্চে, নিজের চেম্বারে...'

'ও আল্লাহ!'

'ওর মত হাসিখুশি একজন মানুষ আত্মহত্যা করবে... অ্যাবসার্ড মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'আমি যাই, দেখি কী ব্যাপার।'

'বস্, আমি আপনার সঙ্গে আসি?' জিজ্ঞেস করল সাইমন।

সাইমন থামতেই ফুঁপিয়ে উঠল মলি। 'আমরা, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল ও। 'নাহিদ এভাবে চলে যাবে, আমাদেরকে জানতে হবে না কেন? আমরা ওকে দেখতে যাব না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'সবার আগে শুধু আমাকে লাশটা দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে লেফটেন্যান্ট মার্লি,' বলল ও। 'অবশ্যই তোমরা যাবে, তবে এখনই নয়। ব্যাপারটা আগে আমাকে বুঝতে দাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সাইমন।

হতচকিত ভাবটা এখনও ওরা কেউ কাটিয়ে উঠতে পারেনি; নিষ্পলক চোখে রানার চলে যাওয়া দেখছে।

দরজার কাছে পৌঁছে থামল রানা, ঘুরে ঝরনার দিকে তাকাল। 'তুমি থেকো, কেমন?' বলল ওকে। 'তোমাকে আমার দরকার হতে পারে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি কিছু না জানালে বাড়ি চলে যেয়ো।'

'জী, মাসুদ ভাই,' বলে মাথা ঝাঁকাল ঝরনা।

রিসেপশন থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা।

দুই

সানসিটি, ড্যাণ্ডি রোড।

সুদৃশ্য একটি দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের পিছন দিক। আগাছাভর্তি ছোট একটা বাগান আছে এখানে, সেটার ভিতর দিয়ে সরু একটা গলি চলে গেছে, দু'পাশে ছ'ফুট উঁচু পাঁচিল।

গলিটা রাতে অন্ধকার থাকে, কেউ খুব একটা ব্যবহারও করে না, তাই গরমের সময় কম-বয়েসী ছেলেমেয়েরা এখানে প্রেম করতে আসে।

প্রায় একঘণ্টা হলো এক তরুণ অপেক্ষা করছে গলিটায়, চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের চারতলার উপর।

লোকটা তেমন লম্বা নয়, আবার বেঁটেও নয়; তবে তার কাঁধ দুটো যেমন চওড়া তেমনি শক্তিশালী। মাথায় চকলেট রঙের হ্যাট, চওড়া কারনিস চোখের

কাছে নামানো। চাঁদের নিষ্প্রভ আলোয় শুধু পুরু ঠোঁট, নোঙর আকৃতির চিবুক দেখা যাচ্ছে। মুখের বাকি অংশ হ্যাটের ছায়ায় ঢাকা।

সুদর্শন যদি না-ও বলা যায়, সুবেশি বলতে হবে তাকে। বাদামী রঙের লাউঞ্জ সুট, সাদা সিল্কের শার্ট ও লাল ডোরাকাটা বো টাই পরেছে—সবই খুব দামি। শার্টের আস্তিন সরিয়ে রোলেক্সের ডায়ালে চোখ বুলাল সে। ঘড়ির স্ট্র্যাপটা সোনার, কাফ-লিঙ্কে বসানো হীরে ঝিক করে উঠল আলো লেগে।

অপেক্ষার সময়টা অটল দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। সারাক্ষণ চুইংগাম চিবাচ্ছে, নির্দিষ্ট ছন্দে কোনও বিরতি ছাড়াই নড়ছে চোয়াল দুটো। ষাট মিনিট ধরে তার এই ধৈর্যধারণের সঙ্গে ইঁদুরের জন্য অপেক্ষায় থাকা শিকারি বিড়ালের মিল আছে।

রাত দশটার কিছু পর চারতলা ফ্ল্যাটের আলো নিভে যাওয়ায় গোটা ভবনটাই অন্ধকারে ডুবে গেল।

বাদামী সুট পরা লোকটা নড়ল না। একদিকের চওড়া কাঁধ পাঁচিলে ঠেকিয়ে হেলান দিল, হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করল। তারপর, আরেকবার হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে, পায়ের কাছে অন্ধকারে ফেলে রাখা সরু কর্ডের কুণ্ডলীটা তুলল। কর্ডের এক প্রান্তে রাবার মোড়া হুক রয়েছে।

পাঁচিলের খাঁজে জুতোর ডগা আটকে ছোট্ট লাফ দিয়ে প্রথমে ওটার মাথায় চড়ল সে, আরেক লাফে নেমে পড়ল ওপারে। তারপর দ্রুত, নিঃশব্দে এগোল আঁকাবাঁকা একটা পথের দিকে। অযত্নলালিত বাগানের ভিতর দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের ঠিক পিছনে পৌঁছেছে ওই মেঠো পথ। পথের দু'পাশে এখানে-সেখানে স্তূপ করা ছাই পড়ে রয়েছে।

সাদা বিল্ডিঙের গায়ে ফায়ার এস্কেপ-এর লোহার সিঁড়িটা চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মাটি থেকে বেশ খানিকটা উপরে ঝুলছে। প্রয়োজনের সময় সিঁড়ির শেষ প্রান্ত জমিনে নামিয়ে আনা যায়।

বাদামী সুট পরা নিশাচর ঝুলন্ত লোহার সিঁড়ির নীচে এসে থামল। ওটার দিকে যদি হাতও তোলে, নাগাল পেতে আরও পাঁচ ফুট লম্বা হতে হবে তাকে। কর্ডের কুণ্ডলী ছাড়িয়ে হুকটা উপরে ছুঁড়ল সে। ফায়ার এস্কেপের কোথাও ভালভাবেই আটকাল সেটা। কর্ডে টান দিতে নিঃশব্দে নেমে আসতে শুরু করল সিঁড়ি, স্থির হলো মাটিতে পৌঁছে।

হুক খুলল সে, কর্ড গুটাল, তারপর রেখে দিল সিঁড়ির শেষ ধাপে, ফেরার পথে নিয়ে যাবে।

প্রতিবার দুটো করে ধাপ বেয়ে উঠছে সে, আচরণে কোনও রকম ইতস্তত ভাব নেই, ঘাড় ফিরিয়ে একবার যাচাইও করছে না কেউ তাকে দেখছে কি না।

চারতলার জানালায় পৌঁছে থামল। এই ফ্লোরের উপরই দেড় ঘণ্টা ধরে নজর রাখছে। জানালাটা উপর-নীচে কয়েক ইঞ্চি করে ফাঁক দেখে সন্তুষ্ট বোধ করল সে। লক্ষ করল পরদাটা পুরো জানালা জুড়েই টানা রয়েছে।

জানালার নীচের ফাঁকে কান তুলে ভিতরে কোনও শব্দ হচ্ছে কি না শুনছে লোকটা। কয়েক মিনিট ওভাবেই স্থির হয়ে থাকল, তারপর জানালার ফ্রেমের

তলায় হাত রেখে সাবধানে চাপ দিল উপর দিকে। কোনও শব্দ না করে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে জানালার কাঁচ।

ফাঁকটা বড় হচ্ছে, মাথা ঘুরিয়ে নীচে তাকাল লোকটা। অন্ধকার বাগান, কিংবা সরু গলিতে কিছুই নড়ছে না। চারদিক নীরব হয়ে আছে।

ফাঁকটা যথেষ্ট বড় হতে কামরার ভিতরে ঢুকল লোকটা। কিছুটা দূরে ঝুলছে পরদা, ওটার গায়ে হাত দিল না। সাবধানে ঘুরল, আবার ধীরে ধীরে বন্ধ করছে জানালা, এতটুকু শব্দ করছে না। জানালা আগের অবস্থায় নেমে আসার পর সিধে হলো সে, পরদা সামান্য একটু ফাঁক করে কামরার ভিতর দিকে তাকাল।

পারফিউম আর ফেইস পাউডারের গন্ধ বলে দিচ্ছে কামরা চিনতে ভুল করেনি সে। কান পাতল। দু'এক মুহূর্ত পর ধীর লয়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনল, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

সরু, পেন্সিল আকৃতির টর্চ বেরিয়ে এল হাতে। আঙুল দিয়ে বালবটাকে আড়াল করে অন করল সেটা। অস্পষ্ট আলোয় বিছানা, চেয়ার, চেয়ারের হাতলে ঝোলানো কাপড়চোপড়, বিছানার পাশে নাইট টেবিল, তাতে শেড লাগানো ল্যাম্প, ঘড়ি, বই ইত্যাদি দেখতে পেল।

বিছানার পিছন দিকটা জানালার কাছে। চাদরের গায়ে মানুষের কাঠামো ফুটে আছে। বেডপোস্ট থেকে ঝুলছে একটা ড্রেসিং-গাউন।

লক্ষ রাখছে টর্চের আলো যাতে সরাসরি বিছানায় না পড়ে, একটু সামনে এগিয়ে দাঁড়াল লোকটা, তারপর হাত তুলে ড্রেসিং-গাউনের সিল্ক কর্ড ধীরে ধীরে টান দিয়ে লূপ থেকে খুলে নিল।

কর্ডটার শক্তি পরীক্ষা করল সে। সন্তুষ্ট হয়ে ঝুঁকল, তুলে নিল নাইট টেবিলে পড়ে থাকা বইটা।

একই হাতে টর্চ আর ড্রেসিং-গাউনের কর্ড, অপর হাতে বই, সাবধানে পিছু হটে আবার পরদার পিছনে চলে এল বাদামী সুট। এরপর টর্চ নিভিয়ে পকেটে রাখল, পরদা ফাঁক করে বইটা ছুঁড়ে দিল অন্ধকার ঘরের সিলিঙের দিকে।

ভারী বইটা পালিশ করা কাঠের মেঝেতে বিচ্ছিরি শব্দ করে নামল। গোটা বাড়ি নীরব হওয়ায় বেশ জোরাল হলো আওয়াজটা।

জানালার পরদায় এখন কোনও ফাঁক নেই, ওটার পিছনে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে সুবেশী অনুপ্রবেশকারী। বিরতিহীন চিবানোর ফলে নিয়মিত ছন্দে উঁচু-নিচু হচ্ছে তার চোয়াল।

শুনতে পেল ক্যাচ ক্যাচ করে উঠল বিছানা। তারপর একটা মেয়ে তীক্ষ্ণ সুরে বলল, 'কে?'

লোকটা অপেক্ষা করছে, অটল মূর্তি, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক, মাথাটা একদিকে কাত করে শুনছে।

বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বলল, পরদার ভিতর দিয়ে আবছা আলো ঢুকল এপাশে। লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরদা একটু সরিয়ে ফাঁকে চোখ রাখল সে।

বিছানার উপর বসে রয়েছে স্বচ্ছ নাইটড্রেস পরা রোগা, অপরূপ সুন্দরী

একটা মেয়ে। চোখ দুটো দরজার উপর স্থির, চাদরটা মুঠো করে ধরে রেখেছে, হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন।

ড্রেসিং-গাউন থেকে খুলে নেওয়া কর্ডের একটা প্রান্ত ডান হাতে, আরেক প্রান্ত বাম হাতে, কাঁধ দিয়ে পরদা সরাল লোকটা। ওখানে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে দেখছে সে, অপেক্ষা করছে।

মেঝেতে পড়ে থাকা বইটা দেখতে পেল মেয়েটা। ঝট করে নাইট টেবিলে তাকাল, পরমুহূর্তে আবার বইটার দিকে। তারপর লোকটা যা আশা করছে তাই করল সে—এক ঝটকায় চাদর সরিয়ে মেঝেতে পা রাখল, ড্রেসিং-গাউনের নাগাল পাওয়ার জন্য হাত উঁচু করছে।

সিধে হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা, ড্রেসিং-গাউনের আস্তিনে হাত ঢোকাচ্ছে, ঘুরে জানালার দিকে পিছন ফিরল।

এতক্ষণে পরদাটা পুরোপুরি সরিয়ে নিঃশব্দ পায়ে সামনে এগোল লোকটা। চোখ দিয়ে অনুসরণ করা যায় না, এমন ক্ষিপ্রবেগে মেয়েটার মাথায় গলিয়ে দিল হাতের কর্ড। গলার চারধারে ওটাকে জড়িয়ে নিয়ে দুই প্রান্ত দুদিকে টানল, সেই সঙ্গে মেয়েটার মেরুদণ্ডের একেবারে নীচের গাঁটে ভাঁজ করা হাঁটুর চাপ দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল ওকে।

গলায় ডেবে গেছে কর্ড, ভীত চিৎকার এত অস্পষ্ট যে কামরার বাইরে পৌঁছাল না। মেয়েটার কাঁধের দিকে ঝুঁকল সে, কর্ডটা এখনও দুদিকে টানছে।

এই ভঙ্গিতে বেশ কিছুক্ষণ স্থির থাকল লোকটা, চুইংগাম চিবানো থেমে নেই; মোচড় আর ঝাঁকি খাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখছে মেয়েটাকে, দেখছে হাত দুটো কার্পেট খামচাচ্ছে। তবে সাবধান সে, খুব বেশি শক্তি ব্যবহার করছে না—কর্ডে টান দিচ্ছে নির্দিষ্ট মাত্রায়, যাতে শুধু মাথায় রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফুসফুসে তাজা বাতাস ঢুকতে না পারে।

একসময় স্থির হয়ে গেল মেয়েটা, শুধু কিছু পেশি মাঝে-মধ্যে কাঁপছে। তারপরও তিন কি চার মিনিট ওর পিঠ থেকে নামল না লোকটা, ঢিল দিল না কর্ডে।

যখন দেখল মেয়েটার আর কিছু নড়ছে না, গলা থেকে সাবধানে খুলে নিল কর্ড, ধরে চিৎ করল লাশ। নাকের একটা ফুটো থেকে সামান্য রক্ত গড়িয়ে কার্পেটে দাগ ফেলে দিয়েছে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল। চোখের ভিতর আঙুল দিয়ে খোঁচাল সে, পাতা কাঁপল না দেখে সিধে হয়ে দাঁড়াল। ট্রাউজার থেকে ধুলো ঝাড়ছে, সেই ফাঁকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে কামরার চারদিক।

বিছানার উল্টোদিকে দরজার কাছে চলে গেল সে, সেটা খুলে ছোট বাথরুমটা দেখল। কবাটের ভিতরের গায়ে স্ক্রু দিয়ে আটকানো শক্ত একটা হুক দেখে খুশি মনে শিস দিল।

পরবর্তী দশ কি বারো মিনিট কামরার দৃশ্যটা নিজের খুশিমত সাজাল লোকটা; পকেট থেকে এটা-সেটা বের করে এখানে-সেখানে কিছু রোপণও করল। নড়াচড়ায় এতটুকু ব্যস্ততা নেই, সম্পূর্ণ শান্ত সে। সবশেষে উজ্জ্বল চোখে দ্রুত একবার দেখল হাতের কাজটা, নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে স্ক্রু হিসাবে ব্যবহার করা

যায় এমন কোনও খুঁত আছে কি না।

তারপর আলোটা নিভিয়ে জানালার সামনে চলে গেল সে। খুলল ওটা, ঘুরে পরদাটা অ্যাডজাস্ট করল, পা রাখল ফায়ার এস্কেপে, টান দিয়ে জানালার কবাট নামাল, রেখে যাচ্ছে ঠিক যেভাবে পেয়েছে।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে দ্রুত, নিঃশব্দে পায়ে নীচের অন্ধকার বাগানে নেমে যাচ্ছে লোকটা।

তিন

দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, বিরাট সাদা মার্সিডিজটা সানসিটির মেইন রোড থেকে একটা সাইড রোডে ঢুকে পড়ল। প্রায় একশ' গজ দূরে, একটা বাইশতলা বিল্ডিঙের সামনে, টহল পুলিশের দুটো কার দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাততলার দুটো জানালা ছাড়া বিল্ডিঙের আর কোথাও কোনও আলো নেই।

গাড়ির স্পিড কমিয়ে পাশে বসা রয় ফিজিওর দিকে একবার তাকাল রানা। ইমিডিয়েট বস্ আত্মহত্যা করেছেন, খবরটা শুনে এত বেশি মুষড়ে পড়েছিল ছেলেটা, গাড়ি চালাতে দিতে সাহস হয়নি ওর। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটা কথাই বলতে চেয়েছে রয়—অসম্ভব, মিস্টার নাহিদ আত্মহত্যা করতে পারেন না!

জোড়া পুলিশ কারের পিছনে মার্সিডিজ থামাল রানা। ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে যাচ্ছে। 'আমি আসব, বস্?' পিছন থেকে জানতে চাইল রয়। এখন অনেকটাই স্বাভাবিক লাগছে ওকে।

'এসো।'

ফুটপাথ ধরে দুজন টহল-পুলিশের দিকে এগোল রানা, বাইশতলা বিল্ডিংটার গেটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রানাকে দেখামাত্র চিনতে পারল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে স্যালুট করল।

রানাকে ওদের চিনতে পারার কারণ আছে।

মাফিয়া ডন ডিক্কো ভিটোরির আমল সেটা। তার অত্যাচারে সানসিটি আর ক্যাটস্‌কিল শহর তখন বাসযোগ্য ছিল না। খুন-খারাবি, গুণ্ডামি-পাণ্ডামি, জুয়াচুরি, ডলার জাল, ব্ল্যাকমেইলিং, হেরোইন আমদানি ও বিক্রি, দেহব্যবসা, ইত্যাদি যত রকমের অপরাধ আছে সবগুলোতে তাদেরকে গোপনে সাহায্য করছিল পুলিশ।

তবে প্রকৃতির নিয়মেই অপশক্তি যত বেশি শক্তিশালী হবে, তার পতনও হবে ততটাই ভয়ঙ্কর। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দেড় বছর আগে আকস্মিক একটা আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে পুলিশের সহায়তায় গড়ে ওঠা অপরাধচক্রটি।

হঠাৎ একদিন বিনা নোটিশে দুই শহরে একযোগে শুরু হয়েছে যৌথবাহিনীর চিরনি অভিযান। প্রধান উদ্যোক্তা এফবিআই, সহায়ক বাহিনী ফেডারেল পুলিশ।

প্রথমেই তারা থানায় থানায় হানা দিয়েছে, বেছে বেছে গ্রেফতার করেছে মাফিয়ার বন্ধু বলে প্রমাণিত পুলিশ অফিসারদের। সাধারণ মানুষ কখনওই সব তথ্য বিশদ জানতে পারে না, তবে মানুষের মুখে মুখে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল—কে বা কারা যেন ভিডিওতে তোলা সচল ছবি পাঠিয়েছিল এফবিআই হেডকোয়ার্টারে, সে-সব ছবিতে দেখা গেছে মাফিয়া গুণ্ডাদের সঙ্গে এই সব অফিসারদের ওঠাবসা, মাখামাখি।

যৌথবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সাঙ্গপাঙ্গসহ নিহত হয়েছে ডন ডিকো ভিটোরি। শুধু তার ছেলে ইকো ভিটোরি যৌথবাহিনীর জাল ছিঁড়ে কীভাবে যেন বেরিয়ে গেছে।

অল্প বয়সেই আর্ট কালেক্টর হিসাবে বেশ নাম করেছিল ছেলেটা। তার নামে কোনও কেস কিংবা অভিযোগ না থাকায় যৌথবাহিনী পরে আর তাকে খোঁজেনি।

এই ব্যাপারটার সঙ্গে রানা এজেন্সির সংশ্লিষ্টতার কথাও তখন শোনা গিয়েছিল, ওরাই নাকি দৃশ্যগুলো ভিডিওতে ধারণ করে এফবিআইকে দিয়েছে। তবে রানা এজেন্সি বিষয়টা স্বীকার বা অস্বীকার, কোনওটাই করেনি।

তবে তা না করলে কী হবে, যে-সব পুলিশ যৌথবাহিনীর অভিযান থেকে রক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই রাতারাতি রানা এজেন্সির ভক্ত হয়ে উঠেছে। এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা যে ওই সময় এলাকায় উপস্থিত ছিল, ওদের কাছে এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

'লেফটেন্যান্ট আপনার জন্যে সাততলায় অপেক্ষা করছেন, মিস্টার রানা,' টহল পুলিশদের একজন বলল। 'এলিভেটরটা নীচেই পাবেন।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রায় অন্ধকার লবিতে ঢুকল রানা, নীরব ছায়ার মত ওর পিছনে লেগে রয়েছে রয়। এলিভেটরে ঢুকল ওরা।

ওভারকোটটা গাড়িতে রেখে এসেছে রানা। টাক্সিডো জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ও। চোখ দুটো শীতল, স্থির; যেন ধ্যানমগ্ন। ওর দিকে একবার তাকাল রয়, তারপর চট করে চোখ সরিয়ে নিল।

সাততলায় থামল এলিভেটর। প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। এখানেও আলো খুব কম। মেঝেতে দামি কার্পেট। সামনেই একটা খোলা দরজা, ওদের এজেন্সির সানসিটি শাখা, ভিতরে আলো জ্বলছে। এই ফ্লোরে আরও তিনটে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, সবগুলো বন্ধ, তবে দুটো দরজার নীচের ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে।

রানা ভিতরে ঢোকার আগেই খোলা দরজা দিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল লেফটেন্যান্ট মার্লি উইলিয়াম। বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই করছে, দৈহিক কাঠামো শক্ত-সমর্থ, চেহারা ও আচরণে মার্জিত একটা ভাব সহজেই চোখে পড়ে। ওর গায়ের রঙ যেমন সাদা, ছোট্ট গোঁফ জোড়া তেমনি কুচকুচে কালো।

'অত্যন্ত দুঃখিত, মিস্টার মাসুদ রানা,' বলল ও, কণ্ঠস্বর খাদে নামানো। 'আমি জানি, আপনাদের সবার জন্যেই বিরাট একটা আঘাত। তবে আপনি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবেন, কারণ মিস্টার হাসানকে আপনি নিজে হাতে-কলমে ট্রেনিং দিয়েছিলেন।'

'কে ওকে প্রথম দেখেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেয়ারটেকার। প্রতিটি অফিসে তালা দেয়া হয়েছে কি না চেক করছিল। আমাকে ফোন করে জানাল। এক ঘণ্টার বেশি হয়নি এখানে আমি এসেছি।'

'আপনি জানলেন কীভাবে আমি ক্যাটস্‌কিলে আছি?' জিজ্ঞেস করল রানা, লেফটেন্যান্টের চোখে চোখ।

'ফোন করে প্রায়ই খোঁজ নিই, আবার কবে আসছেন আপনি,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ঠিক মনে করতে পারছি না কে যেন বলল আজ সন্ধ্যায় আপনার আসার কথা।'

ইঙ্গিতে রয়কে প্যাসেজে থাকতে বলে শাখা অফিসের রিসেপশনে ঢুকল রানা। ওর পিছু নিয়ে মার্লিও ঢুকল, তারপর ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল শেষপ্রান্তের একটা কামরার দিকে। ওটার দরজার মাথায় লেখা রয়েছে: হেড অভ দ্য ব্রাঞ্চ—নাহিদ হাসান।

কামরাটার দরজায় সাদা পোশাক পরা দুজন ডিটেকটিভ কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজন একযোগে ম্লান সুরে কোরাস গাইল: 'গুড ইভনিং, মিস্টার রানা, স্যর।' ওদের একজন আঙুল দিয়ে হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল।

'গুড ইভনিং,' ম্লান সুরে বলল রানা।

দরজার একপাশে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট, নরম সুরে বলল, 'এখানে, এইদিকে।'

ডিটেকটিভদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে নাহিদের চেম্বারে ঢুকল রানা, পিছু নিয়ে লেফটেন্যান্টও।

বেশ বড়সড় কামরা । দেয়াল ঘেঁষে ফেলা হয়েছে দুটো ফাইলিং ক্যাবিনেট। আরেক দিকের দেয়ালে লেযার প্রিন্টার সহ কমপিউটার। মেঝেতে দামি কার্পেট। রিভলভিং চেয়ার সহ বিরাট ডেস্কটা জানালার পাশে। মক্কেলদের জন্য এপাশে রয়েছে তিনটে চেয়ার।

প্রথমেই নাহিদের লাশের উপর চোখ পড়লেও, টুকিটাকি প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে রানা। মারা যাওয়ার সময় চেয়ারে নয়, ডেস্কের উপর বসেছিল নাহিদ। লাশটা এখন ডেস্কের উপর পড়ে রয়েছে, লেটার প্যাডের উপর মাথা, ডেস্কের কিনারা থেকে মরা সাপের মত ঝুলছে ডান হাত, আঙুলগুলো কার্পেট ছুঁয়ে আছে। ওখান থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে পড়ে রয়েছে পিস্তলটা—.৩৮ ল্যুগার। বাম হাত ডেস্কের উপর।

জমাট বাঁধা রক্তের মধ্যে পড়ে আছে নাহিদের মাথা আর মুখ। তরল অবস্থায় ওই রক্ত ডেস্কের উপর দিয়ে একটা তির্যক পথ ধরে এগিয়েছে, তারপর কিনারা থেকে ঝরে পড়েছে কার্পেটে রাখা ধাতব ওয়েস্ট-বাস্কেটে।

প্রিয় মুখটার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা, চেহারায় কোনও ভাব নেই, শুধু কপালে চিন্তার একটা সরু রেখা ফুটে আছে।

পাশ থেকে ওকে লক্ষ করছে লেফটেন্যান্ট মার্লি, থমথম করছে তার চেহারা।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ডেস্কের দিকে এগোল রানা। বেশ খানিক ঝুঁকে, খুব কাছ থেকে, আরও কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল নাহিদের নিষ্প্রাণ মুখ। হঠাৎ করেই

ওর পাঁচ বছর আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল—ট্রেনিঙের সময় নাহিদকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল ও: সব সময় এত হাসি-খুশি থাকো, সেটা ভাল কথা; কিন্তু সবাইকে বিশ্বাস করাটা ভাল নয়। মানুষকে একটু-আধটু সন্দেহ করতেও শেখো।'

সরল বিশ্বাসই নাহিদের কাল হয়নি তো?

সিধে হলো রানা, এক পা পিছিয়ে মেঝেতে হাঁটু গাড়ল, কার্পেটে পড়ে থাকা পিস্তলটাও দেখল ভাল করে।

'কতক্ষণ হলো মারা গেছে ও?' সিধে হয়ে ঘোরার সময় জানতে চাইল রানা।

'আন্দাজ করি ঘণ্টা দুই, স্যর,' বলল লেফটেন্যান্ট মার্লি। 'কেউ গুলির শব্দ পায়নি। প্যাসেজে একটা নিউজ এজেন্সি আছে, ওই সময় ওখানে আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়ে টিভিতে কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখছিল ওরা, গুলির শব্দ তাতেই চাপা পড়ে গেছে।' একটু থেমে জানতে চাইল সে, 'পিস্তলটা, মিস্টার রানা। ওর কি না বলতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, ওরই,' বলল রানা; তারপরেই জানতে চাইল, 'কিন্তু কী করে বুঝলেন যে নাহিদ আত্মহত্যা করেছে?'

ইতস্তত করছে লেফটেন্যান্ট; তারপর ঘুরে এগোল, ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল কামরার দরজা। 'আমার কানে আগেই এসেছে ব্যাপারটা।' রানার সামনে এসে বলল ও, গলা খাদে নামানো। 'মিস্টার হাসান প্রচুর ধার-দেনা করে ফেলেছিলেন।'

স্থির হয়ে গেল রানা। লেফটেন্যান্টের দিকে ঠাণ্ডা, কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। 'ধার-দেনা? কার কাছ থেকে?' মনে মনে বলল: অসম্ভব! কেন? এখনও ছেলেমেয়ে হয়নি, দেশেও সচ্ছল অবস্থা, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই ভাল বেতন... তা হলে ধার করতে হবে কেন?

'একটা ক্যাসিনোয় প্রায় একবছর ধরে নিয়মিত মোটা টাকা হারছিলেন মিস্টার হাসান,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ওখানে কারা সুদে টাকা ধার দেয় আপনি তো জানেন—প্রত্যেকে একেকটা রক্তচোষা জোঁক। সুদ না পাওয়ায় ওঁর জীবন নিশ্চয়ই নরক বানিয়ে ফেলেছিল তারা।'

'হুম।'

'তবে আমার ধারণা, স্যর,' বলল লেফটেন্যান্ট মার্লি, 'টাকার অভাব নয়, অপরাধ বোধই ওঁকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছে।'

'পুলিশের কাজ পুলিশ করবে, কিন্তু আমরাও কেসটা তদন্ত করব,' বলল রানা। 'যতক্ষণ না পরিষ্কার প্রমাণ পাচ্ছি, ততক্ষণ এটাকে আত্মহত্যা বলে মানতে রাজি নই আমি।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি।' মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট।

'আপনাদের এখন অনেক কাজ এখানে, কাজেই দেরি করিয়ে দেব না,' বলল রানা। 'গাড়িতে গিয়ে বসি, আপনাদের কাজ শেষ হলে আমরা শুরু করব।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে লেফটেন্যান্ট মার্লি বলল, 'ঘণ্টাখানেক বা তারও বেশি লাগতে পারে আমাদের, মিস্টার রানা। আপনি কি অতক্ষণ অপেক্ষা

করবেন?'

'করব,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'ওর স্ত্রীকে জানিয়েছেন?'

'আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই জানাইনি আমি, স্যর,' বলল মার্লি। 'আপনি বললে ওঁর বাংলোয় এখনই একজন অফিসারকে পাঠিয়ে দিই।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট। আমি নিজে যাচ্ছি ওর কাছে। ভাল কথা, নাহিদকে আপনারা সার্চ করেছেন?'

গম্ভীর হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'দশ হাজার ডলার পেয়েছি।'

ওর বাড়ানো হাত থেকে নাহিদের মানিব্যাগটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে ফেরত দিল রানা। সামান্য টান টান হলো ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি, তারপর হঠাৎ জানতে চাইল, 'কেন আপনার মনে হলো অপরাধ বোধই ওঁকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছে, লেফটেন্যান্ট?'

একদিকের চোয়াল চুলকাচ্ছে লেফটেন্যান্ট মার্লি, গাঢ় চোখ দুটোয় অস্বস্তি। 'কথাটা আমি পুলিশ কমিশনারের মুখ থেকে শুনেছি, স্যর। তিনি জানেন মিস্টার হাসানকে আমি চিনি, তাই ব্যাপারটা নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেন আমাকে। কাল আমি মিস্টার হাসানের সঙ্গে দেখা করতাম।'

'কোন্ ব্যাপারটা নিয়ে, কী কথা?'

অন্যদিকে তাকাল মার্লি। 'লোকজনকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছিলেন মিস্টার হাসান।'

'হোয়াট? আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। শুধু তাই নয়, শোনার সঙ্গে সঙ্গে আইডিয়াটা বাতিল করে দিল ও। 'এ-সব গাঁজাখুরি গল্প কোত্থেকে পান আপনারা?' কিন্তু মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে এ-ও ভাবছে যে পুলিশ ওকে মিথ্যে কথা বলবে কেন?

বিব্রত, করুণ দৃষ্টিতে তাকাল মার্লি; কিছু বলছে না।

'কারা তারা? কাদেরকে ভয় দেখাচ্ছিল নাহিদ?' অবশেষে জানতে চাইল রানা।

'তিন কি চারজন, গত বছর আপনাদের এই শাখার ক্লায়েন্ট ছিলেন,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'কমিশনারের কাছে অভিযোগ করেন ওঁরা। ভুক্তভোগীর সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশি হবে। বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে, মিস্টার রানা, কিন্তু কথাটা সত্যি—বেঁচে থাকলে মিস্টার হাসান ওঁর প্রাইভেট-আই লাইসেন্সটা হারাতেন।'

চোখ দুটো সরু হয়ে আছে রানার। 'কমিশনার তা হলে হাসানের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেন আপনাকে। কিন্তু প্রথমেই তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন না কেন? এমন তো নয় যে ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না!'

'আমি কমিশনার স্যরকে বলেছিলাম কথাটা, মিস্টার রানা,' বলল লেফটেন্যান্ট, একটু লালচে হয়ে উঠল মুখ। 'কিন্তু ওঁকে কোনও কথা বোঝানো খুব কঠিন।'

রানার ঠোঁটের কোণে নির্দয় হাসির সূক্ষ্ম একটা রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'আমাকেও।'

'আপনাকে যা বলেছি, মিস্টার রানা, সব অফ দ্য রেকর্ড,' তাড়াতাড়ি বলল লেফটেন্যান্ট মার্লি। 'কমিশনার জানতে পারলে আমার গায়ে চামড়া বলে কিছু থাকবে না...'

'ঠিক আছে, কমিশনার জানবেন না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'তবে আমাকে জানতে হবে নাহিদের নামে কারা ঠিক কী ধরনের অভিযোগ করেছে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে লেফটেন্যান্ট মার্লি বলল, 'এ-ও অফ দ্য রেকর্ড, স্যর। মিস্টার হাসান টাকার জন্যে একজন ক্লায়েন্টকে হুমকি দেন। মহিলা কেস করার ঝামেলায় যাচ্ছেন না ঠিকই, কিন্তু কাজটা তো ব্ল্যাকমেইলিঙের পর্যায়েই পড়ে, তাই না?'

হঠাৎ করে রানার চোয়াল দুটো ফুলে উঠল। 'এই শব্দটা আমি আর আপনার মুখে শুনতে চাই না, লেফটেন্যান্ট মার্লি।'

মাথা নিচু করল মার্লি। 'দুঃখিত, স্যর।'

'আপনার সময় আর নষ্ট করব না,' বলে দরজার দিকে এগোল রানা। 'আশা করি কাল সকালে দেখা হবে, কেসটা নিয়ে তখন আমরা আলোচনা করব।'

'জী, স্যর।' মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট।

রিসেপশন হয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, না থেমে রয়ের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, সোজা হেঁটে ঢুকে পড়ল এলিভেটরে।

মার্সিডিজটা রানাই চালাচ্ছে। পাশের সিটে রয়।

'পাবলিক বুদ থেকে মলিকে ফোন করতে হবে,' বলে ফুটপাথ ঘেঁষে গাড়ি থামাল রানা, পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করছে। 'তুমিও এসো,' বলে নীচে নামল। 'কী বলি শোনো।'

ফোন বুদে ঢুকল রানা, নোটবুক খুলে পাতা ওল্টাচ্ছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রয়।

লাইন পাওয়ার পর মলিকে প্রথমেই রানা জিজ্ঞেস করল, 'এটা তোমার ইমার্জেন্সি মোবাইল নম্বর, তাই না? রেজিস্ট্রেশনে নিজের নাম-ঠিকানা ব্যবহার করোনি?'

'জী, মাসুদ ভাই,' বলল মলি। 'করিনি।'

'এই কেসটা নিয়ে কথা বলার সময় আমাদের সবাইকে সাবধান থাকতে হবে,' বলল রানা। 'পুরনো মোবাইল আর অফিসের ফোনে জরুরি, গোপনীয় কিছু যেন কেউ না বলি। ঠিক আছে?'

'জী,' বলল মলি, তারপর জানতে চাইল, 'লাশ দেখে কী বুঝলেন, মাসুদ ভাই? সত্যি সুইসাইড?'

'রানা এজেন্সির তরফ থেকে সানসিটির সংশ্লিষ্ট থানায় আজ রাতেই আমাদের সলিসিটর শহীদ সাবেরকে একটা মামলা করতে বলো, মলি,' উত্তরটা নিজের মত করে দিচ্ছে রানা। 'তার আগে বিফ্রিং করবে ওকে। সুইসাইড নয়, এটাকে খুন

বলে সন্দেহ করছি আমরা; তবে খুনির পরিচয় সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। ওকে আরও বলবে, কোথাও কোনও ক্লু কিংবা এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এমন কিছু চোখে পড়লে আমাকে যেন জানায়।'

নোটবুকে টোকার সময় রানার বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করছে মলি, অপরপ্রান্ত থেকে তার অস্ফুট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। 'জী, মাসুদ ভাই।'

'আরও কাজ আছে, সব সেরে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে তোমার,' বলল রানা। 'কাজেই একা বেরিয়ো না, সাইমনকে সঙ্গে রাখো। প্রয়োজন মনে করলে মায়ামি শাখা থেকে কয়েকজনকে ডেকে নাও।'

'জী।'

'নাহিদের দেশের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করবে তুমি, জানতে চাইবে লাশ ওখানে পাঠাতে হবে, নাকি এখানেই আমরা দাফনের ব্যবস্থা করব,' মলিকে নির্দেশ দিল রানা। 'থানা থেকে বেরিয়ে মর্গে যাবে তোমরা, পুলিশের কাছ থেকে লাশ বুঝে নেবে।'

'জী, মাসুদ ভাই, ঠিক আছে।'

'এবার ঝরনাকে ডেকে বলো, ওর ইমার্জেন্সি মোবাইল থেকে বুদের এই নম্বরে আমাকে ফোন করুক।'

'জী।'

রানা ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখার একটু পরেই রিং হলো। রিসিভার তুলল ও। 'ঝরনা?'

'জী, মাসুদ ভাই।'

'অনেক কাজ তোমার,' বলল রানা। 'টিসা ছাড়া সানসিটি শাখার সব এজেন্টকে বলো, আমার অনুমতি ছাড়া পুলিশের সঙ্গে যেন কোনও কথা না বলে। তুমি সব লিখে নিচ্ছ তো?'

'জী,' বলল ঝরনা। 'মাসুদ ভাই, ওদের মধ্যে জক আর পায়েল ছুটি নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে গেছে...'

ঝরনা থামার আগেই জানতে চাইল রানা, 'সানসিটির এত খবর তুমি জানো কীভাবে?'

'নাহিদ ভাইয়ের খবর শুনেই ওদের দু'একজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি আমি,' জবাব দিল ঝরনা।

'আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট,' বলল রানা।

'বস্,' রানার পিছন থেকে বলল রয়। 'মাত্র কদিন আগে ফ্ল্যাট বদলেছে সানসিটির নোরা বার্ন। ওর নতুন ঠিকানা আমি জানি না, আর কেউ জানে কি না তা-ও বলতে পারব না। ঝরনাকে বলুন, অফিসের খাতা দেখে জেনে নিতে হতে পারে।'

'ধন্যবাদ, রয়।' ঝরনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল রানা, তারপর বলল, 'লেফটেন্যান্ট মার্লি বলছে, নাহিদ নাকি নিয়মিত জুয়া খেলছিল, সানসিটির ক্লায়েন্টদের ব্ল্যাকমেইল করছিল। ওদের তিনজনের প্রত্যেককে ভালভাবে জিজ্ঞেস করো, এ-ব্যাপারে ওরা কতটুকু কী জানে।'

'জী, ঠিক আছে, মাসুদ ভাই,' বলল ঝরনা।

'দুজন এজেন্টকে সানসিটি ব্রাঞ্চে পাঠাও...' ঝরনাকে আরও মিনিট পাঁচেক নির্দেশ দিল রানা, তারপর রয়কে নিয়ে ফিরে এল গাড়িতে।

রয় অনুরোধ করায় এবার ওকেই ড্রাইভ করতে দিচ্ছে রানা। 'তুমি জানো এখন কোথায় যাব আমরা?' রয় গাড়ি ছাড়ার পর জিজ্ঞেস করল ও।

'ওদের নতুন বাড়িটা আমি চিনি, বস্।'

এবার অত্যন্ত কঠিন একটা দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে রানা। নাহিদের স্ত্রী টিসার সঙ্গে দেখা করে বলতে হবে, তোমার স্বামী বেঁচে নেই।

কাজটা আরও বেশি কঠিন লাগছে এই জন্য যে ওদের বিয়েতে উপস্থিত ছিল রানা। তিন কি চার বছর আগের কথা, নাকি আরও বেশি? অথচ মনে হচ্ছে এই তো সেদিন! ভালবাসার বিয়ে। নিজেদেরকে নিয়ে ওদের পাগলামির কথা সবার মুখে মুখে ফিরত।

রানার বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে। ওর জানা নেই এত বড় আঘাত টিসা সহ্য করবে কীভাবে!

চার

হাইওয়ে ধরে পাঁচ মাইল ছোটার পর একটা অ্যাভিনিউয়ে ঢুকল রয়। রাস্তার দু'পাশে ছবির মতো সুন্দর ছোট ছোট বাংলো, ভিতরে চোখ জুড়ানো বাগান।

'পৌঁছে গেছি, বস্,' বলল রয়। 'ল্যাম্পপোস্টের পাশের ওই সাদা বাড়িটা।' স্পিড কমাল, ফুটপাথের কিনারা ঘেঁষে দাঁড় করাল মার্সিডিজ।

সাদা বাংলোর উপর চোখ রেখে গাড়ি থেকে নামল রানা, ঠাণ্ডা বাতাসে চওড়া কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে উঠল। কোটটা গাড়িতে রেখে যাচ্ছে ও। দু'তিন সেকেণ্ড ওখানে দাঁড়িয়ে বাংলোটার দিকে তাকিয়ে থাকল—শুধু বিস্মিত হয়নি, অস্বস্তিও বোধ করছে।

মারাত্মক টাকার অভাবে পড়েছে এমন একজন লোক এরকম অভিজাত এলাকায় এত সুন্দর বাড়িতে থাকে কীভাবে? রানা জানে এক বছরও হয়নি এখানে উঠে এসেছে ওরা। যদি ভাড়া নিয়ে থাকে, সে-ও তো অনেক টাকার ব্যাপার!

গেট খুলে সিরামিকের চৌকো টালি বসানো সরু পথ ধরে সদর দরজার দিকে এগোল রানা, দু'পাশের বাগান থেকে গোলাপের সুবাস এসে লাগল নাকে।

কলবেলের বোতাম টিপল রানা। টুং-টুং করে ঘণ্টা বাজল বাড়ির ভিতরে।

সঙ্গে সঙ্গে কেউ সাড়া দিল না। পর্টিকোয় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রয়, ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেও জ্যাকেটের চেইন খুলে রেখেছে, ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে হিপ-হোলস্টারে গোঁজা কালো কুচকুচে পিস্তল।

একটু পর বাড়ির ভেতর থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। চেইন লাগানো দরজা ফাঁক হতে শুরু করেছে, টিসার গলা শুনতে পেল রানা, 'কে?'

'আমি—মাসুদ রানা।'

'মাসু... কে? মাসুদ ভাই?' আকস্মিক আনন্দে অধীর একটা কণ্ঠস্বর; আরও কাতর করে তুলল রানাকে।

কবাট দুটো পুরোপুরি খুলে গেল, প্রায় একই সঙ্গে দরজার মাথার কাছে উজ্জ্বল একটা আলো জ্বলে উঠল।

'মাসুদ ভাই, সত্যি আপনি!' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে ঠিক যেন জাপানি একটা পুতুল। কী মনে করে কে জানে টিসা আজ লাল একটা কিমোনোও পরেছে।

রানা লক্ষ করল, আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে মেয়েটা। সরল, নিষ্পাপ ভাবটা এখনও এতটুকু ম্লান হয়নি। এই মেয়েকে আমি কীভাবে দিই খবরটা!

'কাল সকালে না অফিসে পৌঁছানোর কথা আপনার...'

'আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি, টিসা,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'চলো, ভেতরে বসি।'

'ইস্, দেখুন কেমন দাঁড় করিয়ে রেখেছি! আসুন, প্লিজ,' তাড়াতাড়ি বলল টিসা, পিছিয়ে গিয়ে পথ করে দিল রানাকে। 'নাহিদ এখনও ফেরেনি। জরুরি কাজ... আমাকে একটা ফোন করলেই আমি চলে যেতাম...'

টিসার পিছু নিয়ে সাজানো একটা ড্রয়িংরুমে ঢুকল রানা। 'জরুরি কাজ মানে, খুব খারাপ একটা খবর, টিসা।'

খারাপ খবর শুনেই চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল, হাত তুলে একটা সোফা দেখাল টিসা। 'আপনি বসুন, মাসুদ ভাই।' জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছে না কী খারাপ খবর।

বসল রানা। 'তুমিও বসো।'

রোবটের মত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে পড়ল টিসা, পরমুহূর্তে আবার দাঁড়াল। 'আমি আপনার জন্যে কফি করে আনি, মাসুদ ভাই? ততক্ষণে নাহিদ হয়তো এসে পড়বে...'

'আমি ওর ব্যাপারেই এসেছি,' শান্ত সুরে বলল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে দুর্ভাগা মেয়েটার দিকে তাকাল। 'বসো, টিসা তোমাকে জানাতেই হবে, তাই আমার আসা।'

'ও!' হঠাৎ ধপ করে বসল টিসা, পায়ে যেন শক্তি পাচ্ছে না। পুতুলের লালচে মুখ সাদা হয়ে গেছে। 'ওর কি কোনও বিপদ হয়েছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, কোনও বিপদ হয়নি। ব্যাপারটা আরও খারাপ।' নিষ্ঠুর হতে চাইছে ও, বলতে চাইছে তোমার স্বামী বেঁচে নেই, কিন্তু পুতুলের মত নিভাঁজ মুখ, কালো চোখে রাজ্যের আতঙ্ক, সরু ঠোঁটের অদম্য কাঁপন বাধা দিচ্ছে ওকে।

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, মাসুদ ভাই!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টিসা, এখনই কেঁদে ফেলবে। 'কী হয়েছে বলুন আমাকে! নাহিদ অ্যাক্সিডেন্ট করেছে?' চোখাচোখি

হতেই শিউরে উঠল, রানা যেন ওকে মারতে যাচ্ছিল। 'ও...বেঁচে আছে তো?'

'না, নেই,' বলল রানা। 'দুঃখিত, টিসা। নাহিদ বেঁচে নেই।'

'বেঁচে নেই?' বলল টিসা। 'কী বলছেন? ও মারা যাবে কেন!'

চুপ করে আছে রানা।

'মাসুদ ভাই, আপনি আমার সঙ্গে জোক...না, না তো! কিন্তু কীভাবে? কেন?' টিসার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে।

'পুলিশ বলছে আত্মহত্যা করেছে ও,' বলল রানা। 'নিজের .৩৮ ল্যুগার দিয়ে মাথায় গুলি করেছে। আমরা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছি।'

'আমি বিশ্বাস করি না!' ডুকরে কেঁদে উঠে বলল টিসা। 'আপনি দেখেছেন ওকে? কোথায় ও?' সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'আমি যাব...'

দরজার দিকে এগোল টিসা। তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে ওর পথ আগলে দাঁড়াল রানা। 'লাশটা হয়তো এখন আর অফিসে নেই, মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,' বলল ও। 'ডাক্তারের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ কাউকে দেখতে দেবে না।'

ঘুরে সোফার সামনে গিয়ে ধীরে ধীরে আবার বসল টিসা, মুখ ঢাকল দু'হাতে, কান্নার দমকে পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে।

'সকাল হোক, আমাদের কেউ একজন এসে তোমাকে লাশ দেখাতে নিয়ে যাবে,' নরম সুরে বলল রানা।

মুখ থেকে হাত সরাল টিসা। 'মাসুদ ভাই, এ আমি কীভাবে মেনে নিই? প্রচুর দেনা করে ফেলেছিল ও, আমাকে বলল, সব শোধ করে দিয়েছে...অসম্ভব, নাহিদ আত্মহত্যা করতে পারে না!'

'আমারও তাই বিশ্বাস,' বলল রানা।

'তা হলে?'

'আসল সত্য ঠিকই বের করে আনব আমরা, টিসা। এরইমধ্যে তদন্ত শুরু হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'অফিসের কাগজ-পত্র চেক করা হচ্ছে। ব্রাঞ্চের প্রতিটি এজেন্টকে প্রশ্ন করছে ঝরনা। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই কিছু জানে, নাহিদ আত্মহত্যা করুক বা খুন হোক।'

'তা ঠিক। কিন্তু যার স্বামী মারা গেছে, সেই আমি তো কিছুই জানি না, মাসুদ ভাই! আমার মাথাতেই ঢুকছে না কী কারণে আত্মহত্যা করবে নাহিদ! কিংবা কেনই বা কেউ ওকে খুন করবে!'

'সামনেই রয়েছে, অথচ কেউ দেখিয়ে না দিলে বড় কোনও অসঙ্গতিও অনেক সময় চোখে ধরা পড়ে না,' বলল রানা। 'রাতটা তুমি বিশ্রাম নাও। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব আমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল টিসা, কিমোনোর ভাঁজ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল।

'পরিচিত এমন কেউ আছে, রাতে এখানে তোমার সঙ্গে থাকবে?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা। 'নাকি আমি কাউকে পাঠিয়ে দেব?'

'আমি সুস্থ থাকতে চাই, মাসুদ ভাই,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল টিসা।

'আত্মহত্যা নয়, খুন করা হয়েছে নাহিদকে। সেই খুনিকে আমি পার পেতে দেব না।'

'আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি,' আশ্বস্ত করল রানা।

'এখন আমি স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাব, মাসুদ ভাই। না, ধন্যবাদ, কাউকে পাঠাতে হবে না।'

বাংলো থেকে বেরিয়ে একটা পাবলিক বুদে ঢুকল রানা, ঘনিষ্ঠ বন্ধু সলিসিটর শহীদ সাবেরের বাড়িতে ফোন করবে। জানে সাবেরকে পাবে না—এই মুহূর্তে মলির সঙ্গে থানায় কিংবা মর্গে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে ও—ফোন করেছে ওর স্ত্রী নীলা সাবেরের সঙ্গে কথা বলবার জন্য।

ছোট বোনের বান্ধবী হিসাবে টিসাকে অত্যন্ত স্নেহ করে নীলা, টিসাও ওকে খুব সমীহ করে। রানার ইচ্ছে আজ রাতে টিসার কাছে থাকুক নীলা, খুব ভাল হয় টিসা ঘুমিয়ে পড়বার আগেই যদি পৌঁছাতে পারে ও।

ফোন ধরল ওদের মেয়ে তারিন। ওর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, আজ রাতে টিসার পাশে থাকার জন্য তিন মিনিট আগেই রওনা হয়ে গেছে ওর মা।

•

এক ঘণ্টা পর। রয়কে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল রানা। ইতিমধ্যে মাঝরাত পার হয়ে গেছে।

রয় গাড়িতে উঠছে, রাস্তা পার হয়ে একটা টেলিফোন বুদে ঢুকল ও। ডায়াল করল ঝরনার নম্বরে।

ঝরনা রিপোর্ট করল: 'সানসিটি ব্রাঞ্চের এজেন্ট নোরা বার্নের নতুন ঠিকানা নাহিদ ভাইয়ের নোটবুকে পাওয়া গেছে, মাসুদ ভাই। ওর নতুন নম্বরে ফোন করেছি, কিন্তু কেউ ধরছে না। এত রাতে নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমাচ্ছে।'

সেটাই স্বাভাবিক, ভাবল রানা। তবে অনুভব করল, মনটা একটু খুঁতখুঁত করছে। 'কাল সকালে আমি ওকে ফোন করব,' বলল ও। 'ফোন নম্বর, ঠিকানা বলো—লিখে নিই।' লেখা শেষ করে জানতে চাইল, 'সানসিটি শাখার বাকি দুই এজেন্ট কী বলছে—সাদাত আর ফ্রিম্যান?'

'নাহিদ ভাইয়ের আচরণে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেনি ওরা,' বলল ঝরনা। 'সব সময় হাসিখুশি, অমায়িক দেখেছে। তবে দুজনেই বলছে বেশ কিছুদিন ধরে কিছু ক্লায়েন্ট বেমালুম গায়েব হয়ে যাচ্ছিল।'

'বুঝলাম না, ব্যাখ্যা করো।'

'ব্রাঞ্চে এল ক্লায়েন্ট, অগ্রিম ফি নিয়ে ওরা লিখল কী সমস্যা, তদন্তও শুরু করল—কিন্তু তারপর আর ক্লায়েন্ট আসে না। এরকম এক-আধটা নয়, অনেক।'

রানা ভাবল, বিশ্বাস করে নিজের দুর্বলতার কথা বলবার পর ক্লায়েন্ট যদি বুঝতে পারে তাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা হচ্ছে, আর সে আসবে কেন! 'ওরা খোঁজ নেয়নি, কী কারণে এরকম রহস্যময় আচরণ করছে ক্লায়েন্টরা?'

'বলছে ব্যস্ততার কারণে সম্ভব হয়নি,' জানাল ঝরনা। 'তা ছাড়া, শাখা-প্রধানের কোনও নির্দেশও পায়নি ওরা।'

'বিষয়টা নিয়ে নাহিদের সঙ্গে আলাপ করেনি কেন?' নিজের অজান্তেই একটু কঠিন হয়ে গেল রানার গলা, এজেন্টদের এরকম গাফিলতি মেনে নিতে পারছে না।

'আলাপ যে করবে, নাহিদ ভাইকে অফিসে পেতে হবে তো,' বলল ঝরনা। 'প্রায় বছরখানেক ধরে অফিসে তিনি খুব কমই আসছিলেন, এলেও বেশিক্ষণ থাকতেন না।'

এবার একটা ধাক্কা খেল রানা। 'কেন? নিয়মিত অফিস করত না কেন?'

'সেটা ওরা বলতে পারছে না,' বলল ঝরনা। 'হয়তো টিসা বলতে পারবে।'

এক সেকেণ্ড পর রানা বলল, 'ঠিক আছে, সকালে টিসার সঙ্গে কথা বলব।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল ফুটপাথের কিনারায় গাড়ি নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে রয়।

ওখান থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলে এল রানা, সরাসরি লেফটেন্যান্ট মার্লির ছোট্ট অফিসে ঢুকল।

মার্লির সঙ্গে একজন ডিটেকটিভ রয়েছে, রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। একটা চেয়ার টেনে এনে রানাকে বসতে অনুরোধ করল লেফটেন্যান্ট।

'লাশটা অফিস থেকে সরানো হয়েছে?'

'ইয়েস, মিস্টার রানা,' বিনয়ের সঙ্গে বলল লেফটেন্যান্ট। 'আপনার এজেন্টরা কাগজ-পত্র চেক করছে। তবে ওদেরকে কমিশনারের নির্দেশটা আমি জানিয়ে দিয়েছি।'

স্থির হয়ে গেল রানা। 'কমিশনারের নির্দেশ?'

মাথা নিচু করল লেফটেন্যান্ট মার্লি। 'হুমকি দিয়ে টাকা আদায়ের যে-সব অভিযোগ সানসিটি ব্রাঞ্চের বিরুদ্ধে আসছে, ওগুলোর তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অফিসটা বন্ধ থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন কমিশনার।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'হয় সকাল দশটায় আমার সঙ্গে কমিশনারের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করুন, লেফটেন্যান্ট, তা না হলে ওঁর কাছে আমার একটা মেসেজ পৌঁছে দিন।'

'দ্বিতীয়টা অনেক সহজ, স্যার।'

'কমিশনারকে বলুন, যাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়েছে আমরা ওদের সব টাকা ফেরত দিতে চাই,' বলল রানা। 'অফিস না খুললে কীভাবে সেটা সম্ভব? ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে না? যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে না সত্যি কথা বলছে কি না? জানতে হবে না কে কত টাকা পায়?'

মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট মার্লি। 'ইয়েস, স্যর, আপনার কথায় যুক্তি আছে।'

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা, 'মর্গ থেকে কোনও খবর পেয়েছেন?'

'পোস্ট মর্টেম শেষ। তবে রিপোর্টটা সকালে পাবেন, মিস্টার রানা। আপনার

এজেন্টরা লাশ নিয়ে চলে গেছে।'

'পিস্তলের ব্যালিস্টিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে?'

'সকালে পাওয়া যাবে, মিস্টার রানা,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'তবে ডাক্তারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—বলছেন, জখমটা সেলফ-ইনফ্লিক্টেড। পিস্তলে একা শুধু মিস্টার হাসানের প্রিন্ট পাওয়া গেছে। মুখের পাশে পাউডার বার্ন দেখেছেন তিনি।'

'পিস্তলে আরও গুলি ছিল?'

'না, একদম খালি পাওয়া গেছে ওটা।' মাথা নাড়ল মার্লি। তারপর গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'কমিশনার ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখছেন না, মিস্টার রানা।'

'কোন্ ব্যাপারটাকে?'

'থানায় আপনারা এটাকে মার্ডার কেস বলে মামলা করেছেন।'

'মার্ডার কেসকে মার্ডার কেস বললে ওঁর খারাপ লাগবে কেন?' জানতে চাইল রানা, বিরক্ত বোধ করছে। 'ওঁকে বলেছেন, আপনারা কোনও সুইসাইড নোট পাননি?'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মার্লি।

চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল রানা। 'ওঁকে আরও বলবেন—মুখের পাশে পাউডার বার্ন, পিস্তলে ভিক্টিমের ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকলেই সেটাকে আত্মহত্যা বলা যায় না।'

ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল লেফটেন্যান্ট মার্লি।

রাত দেড়টা। পাপিট রোডের শেষ মাথায়, ফাল্গুন ভবনের সামনে রানাকে নামিয়ে দিয়ে মার্সিডিজ নিয়ে চলে গেল রয় ফিজিও, সকাল আটটায় আবার এসে তুলে নেবে। রানা ওকে সঙ্গে করে কয়েকটা জিনিস আনতে বলে দিয়েছে।

গেট খোলাই পেল রানা, ছোট্ট বাগানের ভিতর দিয়ে এগোল। একতলায় আলো জ্বলছে দেখে কলবেলের বোতামে চাপ দিল রানা, তা না হলে নিজের চাবি দিয়েই দরজা খুলত।

কবাট খুলে ওকে দেখে ম্লান একটু হাসল মলি। 'আসুন, মাসুদ ভাই। আপনার জন্যেই জেগে আছি।'

চুল ভিজে দেখে বোঝা গেল কিছুক্ষণ আগে গোসল করেছে মলি। সাফারি সুট বদলে শাড়ি-ব্লাউজ পরেছে, হাতে একটা চিরনি। মেকআপ ছাড়াই বরং দেখতে ভাল লাগছে ওকে। গোসল করায় চেহারা থেকে ক্লান্তি দূর হলেও, নার্ভাস ভাবটুকু যায়নি।

মলির পিছু নিয়ে এসে একতলার ড্রইংরুমে, একটা সিঙ্গেল সোফায় বসল রানা। 'রিপোর্ট করো,' বলল ও।

ইঙ্গিতে রানা বসতে বললেও, একটা সোফার পাশে দাঁড়িয়ে শুরু করল মলি, 'জী, মাসুদ ভাই। একটা প্রাইভেট ক্লিনিকের ডিপ-ফ্রিজে রাখা হয়েছে নাহিদের লাশ। দাফন-কাফন এখানেই হবে ওর, তবে দেশ থেকে ওর দুই ভাই আসার

পর। এখানেই থাকে ওরা, ছুটিতে বেড়াতে গেছে দেশে। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে ফিরবে।'

'আর কিছু?'

'না, মাসুদ ভাই; শুধু—সলিসিটর সাবের ভাই বলল টিসার কাছে নীলাদি আছেন, শুনে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে আমিও ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাচ্ছে ও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওর যাওয়াটাকে সমর্থন করল রানা। 'কাল সকালে আবার আমি দেখতে যাব ওকে। গুড নাইট, মলি,' বলে সোফা ছাড়ল ও। প্যাসেজ হয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল।

পাঁচ

পরদিন সকাল ঠিক আটটায় রানাকে মার্সিডিজে তুলে নিল রয়। সোজা টিসাদের বাংলোয় পৌঁছে দিল ওকে।

টিসার সঙ্গে দীর্ঘ এক ঘণ্টা কথা বলল রানা। ওর প্রশ্নের উত্তরে টিসা যা বলল, শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ওর।

গত বছর টিসাকে কিছু না জানিয়ে শেয়ার কেনা-বেচার ব্যবসায় নামে নাহিদ। তাতে প্রায় এক লাখ ডলার লোকসান হয়েছে। সেটা উদ্ধার করবার জন্য চড়া সুদে টাকা ধার করে ক্যাসিনোয় জুয়া খেলতে শুরু করে ও। কিন্তু তাতেও ভরাডুবি হয়। সেই থেকেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল নাহিদ—ঠিক মত খেত না, ঘুমাত না, অফিস করত না।

তারপর সন্ধের দিকে বেরুতে শুরু করল নাহিদ। কিছুদিন পর টিসা লক্ষ করল আবার হাসি-খুশি হয়ে ওঠার ভান করলেও, কী নিয়ে যেন সারাক্ষণ চিন্তিত থাকে ও।

হঠাৎ একদিন ওর পকেটে প্রচুর, প্রায় ত্রিশ হাজার ডলার দেখতে পেল টিসা। জিজ্ঞেস করতে বলল, আবার শেয়ার ব্যবসা ধরেছে, ভাল আয় হচ্ছে।

তারপর টিসাকে কিছু না জানিয়ে জমি কিনে বাংলো তৈরি করিয়েছে নাহিদ, মাত্র কিছুদিন আগে নতুন বাড়িতে এনে তুলেছে ওকে। জিজ্ঞেস করতে সেই একই উত্তর দিয়েছে—শেয়ার ব্যবসায় হঠাৎ মোটা টাকা আয় হওয়ায় বাড়িটা বানিয়ে ফেলেছে।

রানার মনে প্রশ্ন জাগল: শেয়ার ব্যবসার আয়, নাকি ক্লায়েন্টদের ভয় দেখিয়ে আদায়?

কিন্তু পরস্পরবিরোধী ব্যাপারটাও ধরা পড়ল রানার চোখে: বসবাস করবার জন্যে অভিজাত এলাকায় ছবির মত সুন্দর বাড়ি বানিয়ে বউকে নিয়ে ওঠে যে লোক, জীবনের প্রতি নিশ্চয়ই তার প্রগাঢ় ভালবাসা আছে, কাজেই সে কেন অপরাধ বোধে আত্মহত্যা করতে যাবে?

টিসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে মার্সিডিজে চড়ল রানা।

ওর পিছু পিছু টিসাকে নিয়ে বেরিয়ে এল রানার বন্ধুপত্নী নীলা সাবেরও। নাহিদের লাশ দেখতে ক্লিনিকে যাচ্ছে ওরা।

পাবলিক বুদ থেকে নোরা বার্নের নম্বরে ফোন করল রানা। কেউ ধরে না। 'চলো, দেখি কী ব্যাপার,' ভারী গলায় রয়কে বলল ও। উঠে বসল গাড়িতে।

সকাল সাড়ে ন'টায় রানাকে নিয়ে সানসিটির ড্যাণ্ডি রোডে চলে এল রয় ফিজিও। সানসিটি শাখার এজেন্ট নোরা বার্ন নতুন যে দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটায় উঠেছে সেটা এই রোডেই।

'ডান দিকের সাদা বাড়িটা,' রয়কে বলল রানা। 'দরজায় থেমো না, মোড় থেকে হেঁটে ফিরে আসব আমরা।'

বাঁকটা কাছেই, ঘোরার পর মার্সিডিজ থামাল রয়।

'তুমি আমার সঙ্গে এসো,' দরজা খুলে নীচে নামার সময় বলল রানা। ওর পিছু নিয়ে হাঁটা ধরল রয়।

বাড়িটার লবিতে ঢুকে কাউকে দেখল না ওরা। এলিভেটরে চড়ে চারতলায় উঠে এসে নোরা বার্ন লেখা দরজার সামনে থামল। হকার খবরের কাগজ দিয়ে গেছে, এক বোতল দুধও দেখা যাচ্ছে দরজার পাশে। অশুভ আশঙ্কাটা অনেকক্ষণ থেকেই ভোগাচ্ছে ওকে, সেটা যেন নতুন জ্বালানি পেল।

জানে ভেতরে কেউ নেই, তারপরেও কলবেল বাজাল ও।

কেউ সাড়া দিল না।

এই সময় উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে এক তরুণী বেরিয়ে এল; যেমন লম্বা তেমনি রোগা, নরম কাপড়ের স্কার্ট আর ব্লাউজ পরে আছে, মাথায় হালকা হ্যাট। এলিভেটরের দিকে এগোবার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, 'কাকে চাইছেন, প্লিজ?'

সম্ভবত মডেলিং করে, ভাবল রানা। বলল, 'আমরা মিস নোরার কাছে এসেছি। সাড়া পাচ্ছি না—অথচ দুধ, কাগজ পড়ে রয়েছে...'

'কাল রাতে হয়তো ফেরেনি।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার পা বাড়াল মেয়েটা।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে পকেট থেকে ইস্পাতের সরু একটা কাঠি বের করে কী হোলে ঢোকাল রানা। এক মিনিটের মধ্যে খুলে গেল তালা।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলল রানা, তারপর ড্রইংরুমে ঢুকে এক পাশে সরে দাঁড়াল। ওর পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রয়।

'নোরা?' ডাকল রানা। 'তুমি আছ?'

সাড়া নেই। নাক বরাবর সামনে আরেকটা দরজা, সেটার দিকে এগোল রানা, থেমে নক করল। সাড়া নেই। আরেক বার নক করে দরজা খুলে ফেলল। পরদা টানা থাকায় ভিতরে আলো কম, তবে বুঝতে অসুবিধে হলো না এটা একটা বেডরুম।

বিছানাটা খালি। আগোছাল চাদরটা একপাশে পড়ে আছে, যেন কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে ওদিকে।

'ফ্ল্যাটে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না, বস্,' রানার পিছন থেকে বলল রয়।

'শাওয়ারে?' বলে বেডরুমের ভিতর ঢুকল রানা, তারপর আলো জ্বালল। পরমুহূর্তে একটা হার্টবিট মিস করল ও।

বেডরুমের ডানদিকে আরেকটা দরজা। ওই দরজার গায়ে, সাদা সিল্ক কর্ডের সঙ্গে, ঝুলছে নোরা বার্ন। কর্ডটা কবাটের মাথা হয়ে নেমে এসেছে, নিশ্চয়ই কবাটের উল্টোদিকে কিছু একটার সঙ্গে বাঁধা।

সাদা সিল্কের ড্রেসিং-গাউন পরে আছে নোরা, ফাঁক হয়ে থাকায় ভিতরের নীল নাইলন নাইটড্রেস দেখা যাচ্ছে। যে রূপ নিয়ে ওর গর্ব ছিল তার উপর যেন মোমের প্রলেপ দিয়ে নিষ্প্রভ করে দেওয়া হয়েছে সব, হাঁ করা মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে ফোলা জিভ। নাক থেকে চিবুক পর্যন্ত শুকনো রক্তের একটা দাগ।

দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে অকস্মাৎ দম আটকাল রয়। 'ওহ্, গড!' ফিসফিস করল। 'এ কী সর্বনাশ করেছে!'

এগিয়ে গিয়ে নোরার হাত ধরল রানা। শক্ত, হিম হয়ে আছে। 'দশ থেকে বারো ঘণ্টা আগে মারা গেছে,' বলল ও। 'ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে, রয়।'

মাথা ঝাঁকাল রয়। 'ইয়েস, বস্।'

'আমাদের দুজন লোক মারা গেল—একই রাতে,' আবার বলল রানা। 'এটাকে আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে পারি না।'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রয়।

'একটা ব্যাপার তুমি খেয়াল করেছ, রয়?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

'কী, বস্?'

'ডন ডিকোর বিরুদ্ধে অভিযানের সময় এফবিআই আর ফেডারেল পুলিশকে আমাদের তরফ থেকে গোপনে যারা সাহায্য করেছিল, এই দুজনও তাদের মধ্যে ছিল—নাহিদ আর নোরা।'

'ওহ্, গড!' রয়ের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। 'বস্, ঠিক বলেছেন আপনি! কিন্তু এলাকা থেকে মাফিয়া তো একেবারে সাফ হয়ে গেছে...'

'তা কী আর হয়, কিছু বীজ থেকেই যায় সবসময়।'

চিন্তিত দেখাল রয়কে। 'নোরা ফোন ধরছে না, এটা শুনেই এরকম কিছু একটা আশঙ্কা করছিলেন আপনি, তাই না, বস্?' মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, সেজন্যেই ইকুইপমেন্টগুলো নিয়ে আসতে বলেছি তোমাকে,' জবাব দিল রানা। 'ঠিক আছে, তুমি তোমার কাজ শুরু করো,' নির্দেশ দিল ও। 'আমিও সার্চ করছি।'

'ইয়েস, বস্।'

জ্যাকেটের বোতাম খুলে বেল্টে আটকানো একটা পাউচ থেকে ফ্ল্যাশসহ ছোট্ট, অত্যন্ত দামি একটা ক্যামেরা বের করল রয়। এই কাজেও ট্রেনিং নেওয়া আছে, জানে দরজার নব, আলোর সুইচ, জানালার ফ্রেম ইত্যাদিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে।

সার্চ শুরু করবার আগে প্রথমে কামরার চারদিকটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে রানা। প্রথমেই রিফ্রিজারেটরের মাথায় রাখা নাহিদের একটা ফটোর উপর চোখ

আটকে গেল। কাছে গিয়ে ফ্রেমটা ধরে চোখের সামনে আনল। ফটোর এক কোণে নাহিদের সইটা চিনতে পারল ও। তারিখটা ছ'মাস আগের।

শুধুই সই, আর কিছু লেখা নেই। তা না থাকলেও, কুমারী নোরার বেডরুমে বিবাহিত নাহিদের ফটো থাকাটা স্বাভাবিক কোনও ব্যাপার হতে পারে না। রানা ভাবল, একতরফা প্রেম?

আলমারি, কাবার্ড ইত্যাদির দেরাজ খুলে দেখছে রানা। হঠাৎ যা পেয়ে গেল, বিস্ময়ে থ হয়ে গেল রানা। একগাদা চিঠির একটা বাণ্ডিল। নোরাকে লেখা নাহিদের চিঠি—প্রেমপত্রই। কমপিউটার কম্পোজ, প্রিন্ট-আউট বের করে তাতে সই করেছে নাহিদ। প্রতিটি চিঠিতে ইনিয়ে-বিনিয়ে একই কথা বলা হয়েছে—আমি তোমাকে পাগলের মত ভালবাসি, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না ইত্যাদি।

চিঠিগুলো পড়ে বোঝা গেল, সম্ভাব্য ঝামেলা এড়াবার জন্য ওরা দুজন পালানোর প্ল্যান করছিল, সেজন্য প্রচুর টাকাও জমিয়েছে।

যেখান থেকে যা পেয়েছে সব আবার সেখানে রেখে দিল রানা। তারপর আবার সার্চ শুরু করল।

একটু পরেই কার্পেটে লেগে থাকা সামান্য একটু খয়েরি দাগ চোখে পড়ল। সন্দেহ হলো ওর, শুকনো রক্ত নয় তো? রয়ের কাজ শেষ হতে দাগটা দেখাল ওকে, বলল, 'এই দাগের একটু নমুনা সংগ্রহ করো। তবে সাবধান, পুলিশ যেন বুঝতে না পারে আমরা নমুনা নিয়ে গেছি।'

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রয়।

'ওদেরকে বলব না এখানে আমরা ঢুকেছি,' বলল রানা। 'শুধু রিপোর্ট করব নোরাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাতে লাভ, বস্?'

'আমি চাই পুলিশই আবিষ্কার করুক ওকে। দেখতে চাই এই কেসটাকেও ওরা আত্মহত্যা বলে চালাতে চেষ্টা করে কি না।'

আরও আধঘণ্টা পর নোরার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল ওরা।

'ফিল্ম আর কার্পেটের নমুনা মায়ামিতে, এফবিআই-এর রিসার্চ সেন্টারে পাঠাতে হবে, প্রাপক পল মার্টিন,' গাড়ি ছাড়ার পর রয়কে বলল রানা। 'মার্টিন আমার বন্ধু; ওর সঙ্গে কাল রাতে আমার কথা হয়েছে।'

একটা কুরিয়ার সার্ভিসের সামনে মার্সিডিজ থামিয়ে নেমে গেল রয়।

এই সুযোগে পাবলিক বুদ থেকে শহীদ সাবেরকে ফোন করল রানা। এজেন্সির সলিসিটরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল ও, তারপর বলল থানায় সাধারণ একটা ডায়েরি করতে হবে—কাল রাত থেকে নোরা বার্নকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপর লেফটেন্যান্ট মার্লিকে ফোন করল রানা। মার্লি জানাল, পুলিশ কমিশনারকে ওর মেসেজ পৌঁছে দিয়েছে সে। রানার কথায় বিন্দুমাত্র যুক্তি খুঁজে পাননি কমিশনার, বলেছেন, রানা এজেন্সির সানসিটি শাখা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছেন তিনি। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আর এলাকার সিনেটরও

নাকি তাই চাইছেন।

'ও,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

দুপুর বারোটা।

ক্যাটস্‌কিল শাখা, রানার চেম্বার; ওর প্রতিটি নির্দেশ খসখস করে লিখে নিচ্ছে শাখা-প্রধান মলি।

'সানসিটির সব এজেন্ট আর ইনফরমারকে এখন থেকে একঘণ্টার মধ্যে আমাদের মায়ামি সেফ হাউজে পাঠিয়ে দাও,' বলল রানা। 'আমি গ্রিন সিগনাল না দেয়া পর্যন্ত কেউ তারা বাইরে বেরুতে পারবে না।'

'মাসুদ ভাই! কেন?' লেখা থেকে মুখ তুলে জানতে চাইল মলি, প্রায় চমকে উঠেছে। 'আপনি ওদেরকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

'আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই, তবে সন্দেহ করছি কারা যেন আমাদের ক্ষতি করতে চাইছে,' বলল রানা। 'আমি আসলে ওদের নিরাপত্তার ব্যাপারেই বেশি চিন্তিত। তবে এ-ও ঠিক যে এখনও আমরা জানি না ওদের কার কী ভূমিকা, কাজেই কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছি না।'

মলির চোখ-মুখ থমথমে হয়ে উঠল।

'আমার ধারণা, এই শাখার ওপরও হামলা হতে পারে,' বলল রানা। 'আজ থেকেই তোমরা দুজন করে জোট বাঁধো—বাইরে বেরুলে পরস্পরকে কাভার দেবে। ফ্লোরিডার অন্যান্য শাখা থেকে আরও অপারেটরকে ডেকে নাও, তাদের মধ্যে স্লিপার এজেন্ট জিসান হাওয়ার্ডও যেন থাকে।'

'জী, ঠিক আছে।'

'ওকে আমি নিজে ব্রিফ করব,' বলল রানা। 'পৌঁছেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

'অতিরিক্ত এজেন্ট যাদের ডাকা হচ্ছে, রাতে তারা তোমাদের বাড়ি আর অফিস পাহারা দেবে, প্রতি টিমে দুজন করে থাকবে ওরা।'

'জী।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এবার আমি ঝরনার সঙ্গে কথা বলব।'

মলি চলে যাওয়ার এক মিনিট পরেই চেম্বারে ঢুকল ঝরনা।

'এসো, বসো,' বলল রানা। 'কাল রাতে ঘুমাতে গেলে কখন?'

'চারটের দিকে,' মলির ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটায় বসে বলল ঝরনা। 'খুব বেশি না ঘুমালেও চলে আমার।'

'আসলে চলে না।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ঘুমের অন্য কোনও বিকল্প নেই। আর আধঘণ্টা পর লাঞ্চ আওয়ার। লাঞ্চের পর বাসায় ফিরে ভাল একটা ঘুম দাও।'

'কিন্তু মাসুদ ভাই...'

'এটা আমার অর্ডার,' নির্দেশের সুরে বলল রানা। 'কানে এল তোমাকে সব সময় কাজ করতে দেখা যায়। কিছু কাজ সাইমনের ঘাড়ে চাপাও না কেন? ওকে

তো বেশিরভাগ সময় দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'কাল রাতে অবশ্য সে-ও জেগে ছিল, মাসুদ ভাই।'

'ঠিক আছে। এবার কাজের কথা। নাহিদের অফিসে কিছু পেয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল ঝরনা। 'খাতা-পত্র দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছে, মাসুদ ভাই,' বলল ও। 'গত বারো মাসে সানসিটি বেতন, অফিস খরচ ইত্যাদি বাবদ যা ব্যয় করেছে, আয় করেছে তার অনেক কম।'

'আমার কাছে তো চায়নি,' বলল রানা। 'তা হলে অতিরিক্ত টাকাটা পেয়েছে কোথায়?'

'সেটাই তো অবাক কাণ্ড। কারও বেতন বাকি নেই, যার যা প্রাপ্য ঠিকঠাক দেয়া হয়েছে। কোথাও কোনও দেনাও নেই।'

'কেস এন্ট্রি বুক চেক করেছ?'

'ওখানে আরেক রহস্য,' বলল ঝরনা। 'গত বারো মাসে সব মিলিয়ে কেস এন্ট্রি হয়েছে পাঁচশ' তিনটে, তার মধ্যে এন্ট্রি ফি দিয়ে ক্লায়েন্টের গায়েব হয়ে যাবার সংখ্যা সাড়ে তিনশ'।'

'বলো কী!' রানা ভাবল, এতগুলো লোককে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল? 'অফিসে এমন কোনও আলামত দেখেছ, কাগজ-পত্র পোড়ানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল ঝরনা। 'আমার সন্দেহ, মাসুদ ভাই, আলাদা কোনও এন্ট্রি বুক আছে—আসল ছবিটা তাতে পাওয়া যাবে। নিশ্চয়ই কেউ সরিয়ে ফেলেছে সেটা। তাতে হয়তো লেখা আছে আপাতদৃষ্টিতে গায়েব হওয়া ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে কী পরিমাণ টাকা আদায় করা হয়েছে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, কপালে চিন্তার রেখা।

দুপুর আড়াইটা। নিজের চেম্বারে বসে সানসিটি ব্রাঞ্চ থেকে আনা ফাইল-পত্রে চোখ বুলাচ্ছে রানা, নক করে ভিতরে ঢুকল সাইমন। 'আমাকে ডেকেছেন, বস?'

ফাইল বন্ধ করে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'হ্যাঁ, বসো।'

সাইমন একটা চেয়ারের মাথায় হাত রেখে দাঁড়াল, বসল না।

'রাত জাগাটা তোমার বোধহয় সহ্য হয় না,' আবার বলল রানা। 'দেখতে ভূতের মত লাগছে।'

জোর করে একটু হাসল সাইমন।

'যে-জন্যে তোমাকে ডেকেছি,' বলল রানা। 'ক্যাটস্‌কিল এজেন্সিতে মলি আর সাইমন, তোমাদের এই দুজনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কারণ আমাদের ব্যবসা সম্পর্কে তোমরা যতটুকু জানো, আর কেউ ততটা জানে না।'

রানাকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকাল সাইমন।

'আদৌ যদি কোনও হামলা হয়, তোমাদের ওপরেই আগে হবে বলে আমার ধারণা,' বলল রানা। 'কাজেই সাবধান। আমি খুশি হব তুমি যদি মলির সঙ্গে জোট বাঁধো।'

'ইয়েস, বস্, তাই করব,' খুশিমনে বলল সাইমন।

এই সময় নক করে ভিতরে ঢুকল ঝরনা। 'মাসুদ ভাই, লেফটেন্যান্ট মার্লি এসেছেন,' বলল ও। 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রানা বলল, 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও।'

'আমি তা হলে আসি, বস্,' বলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল সাইমন।

তারপরেই পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট মার্লি। প্রথমেই রানার চোখে পড়ল শান্ত গাম্ভীর্য ফুটে আছে অফিসারের চেহারার। ওর মনে হলো, লোকটা কী যেন একটা প্ল্যান নিয়ে এসেছে।

'আসুন, লেফটেন্যান্ট,' বলল রানা। 'তারপর বলুন, সব খবর ভাল তো?'

'আপনার সানগিটির এজেন্ট নোরা বার্ন,' বলল লেফটেন্যান্ট মার্লি। 'ওঁর খোঁজ পাওয়া গেছে।'

'কোথায়?'

'ওঁর ফ্ল্যাটেই,' বলে মুহূর্তের জন্য মাথাটা নিচু করল লেফটেন্যান্ট। 'মারা গেছেন।'

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'মারা গেছেন?' অবশেষে নীরবতা ভাঙল রানা। 'আত্মহত্যা?'

একদিকের কাঁধ একটু উঁচু করল লেফটেন্যান্ট। 'সে-ব্যাপারে কথা বলার জন্যেই এসেছি আমি। এটা খুনও হতে পারে।'

ছয়

আবার পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'লাশটা এখন কোথায়, লেফটেন্যান্ট?' জানতে চাইল রানা।

'মর্গে। এক ঘণ্টার মধ্যে লোক পাঠিয়ে দিলে রিলিজ করে দেবে ওরা,' জবাব দিল মার্লি।

ইন্টারকম অন করে মলি চৌধুরিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল রানা। তারপর ইঙ্গিতে মার্লিকে একটা চেয়ার দেখাল। 'বসুন, লেফটেন্যান্ট,' বলল ও। 'তারপর খুলে বলুন সব কথা।'

একটা চেয়ার টেনে বসল মার্লি। 'ঠিকানাটা কাল রাতেই সলিসিটর মিস্টার সাবেরের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। একজন সার্জেন্টকে নিয়ে আজ সকালের দিকে ওখানে যাই। ফ্ল্যাটটা ড্যাণ্ডি রোডে...'

'জানি,' বলল রানা। 'আজ সকালে আমিও ওখানে গিয়েছিলাম। কলবেল বাজিয়ে কোনও সাড়া পাইনি।'

'হ্যাঁ, ওই একই ফ্লোরের মডেল মিস সারা আপনাদের দেখেছেন,' বলল মার্লি।

'কী হয়েছে বলুন,' বেসুরো গলায় তাগাদা দিল রানা।

'বেল বাজিয়ে আমরাও সাড়া পেলাম না। অত বেলায় দরজার পাশে খবরের

কাগজ, দুধের বোতল পড়ে থাকাটা ভাল লক্ষণ মনে হলো না। দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। দেখলাম বাথরুমের দরজায় ঝুলছেন নোরা বার্ন।'

রিভলভিং চেয়ারে নড়েচড়ে বসল রানা। এক মুহূর্ত পর জিজ্ঞেস করল, 'খুন সম্পর্কে কী যেন বলছিলেন?'

'দেখে আত্মহত্যাই মনে হচ্ছে,' বলল মার্লি। 'পুলিশ সার্জেন্টের ভাষায়—টিপিকাল সুইসাইড।' হাড়সর্বস্ব নাকটা আঙুল দিয়ে কয়েকবার ঘষে লাল করে ফেলল। 'লাশটা সরিয়ে নেয়ার পর কামরাটা ভাল করে একবার চেক করি আমি। ওখানে তখন একাই ছিলাম।' হঠাৎ খাদে নেমে গেল লেফটেন্যান্টের গলা, 'মিস্টার রানা, আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি।'

'কী?'

'বিছানার কাছাকাছি কার্পেটে লালচে-খয়েরি একটা দাগ। সন্দেহ হলো, রক্তের দাগ হতে পারে। কারণ আমি যখন দরজার গা থেকে লাশটা নামাচ্ছিলাম, ওটার নাকে শুকনো রক্ত লেগে থাকতে দেখেছি।'

'তারপর?'

'কার্পেটের নমুনা সংগ্রহ করেছি, টেস্ট করে জানা গেছে—রক্তই ওটা।'

'তার মানে নোরাকে খুন করা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হলপ করে বলতে পারব না, কিন্তু তা না হলে কার্পেটে ওই রক্ত এল কোত্থেকে?'

'রক্তটা যে নোরারই, তার প্রমাণ কী?' প্রশ্ন করল রানা। 'ডিএনএ টেস্ট করতে দিয়েছেন?'

'না, তা দিইনি।' কী ভেবে যেন ইতস্তত করছে লেফটেন্যান্ট মার্লি।

'আমাকে জানানোর জন্যে ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট,' বলল রানা। 'বিষয়টা নিয়ে পরে আমরা কথা বলব। এই মুহূর্তে আমি একটা জরুরি কাজের মধ্যে আছি।'

তারপরেও মার্লি চেয়ার ছেড়ে উঠছে না দেখে বিস্মিত হলো রানা। ওর দিকে এমন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে অফিসার, ভাল লাগল না ওর।

'কী ভাবছেন, লেফটেন্যান্ট?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'ব্যাপারটা আপনার ওপর নির্ভর করে, মিস্টার রানা, তবে আমি ভেবেছিলাম এখনই এর একটা সুরাহা করতে চাইবেন আপনি। রিপোর্টটা এখনও আমি জমা দিইনি, তবে আধ ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'আপনার রিপোর্টের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, লেফটেন্যান্ট?'

'সেটা, স্যর, আপনি ঠিক করবেন,' সতর্কতার সঙ্গে কথা বলছে লেফটেন্যান্ট। 'যেখানে যখন সম্ভব আপনাদের সব সময় আমি সাহায্য করে আসছি, মিস্টার রানা।'

হঠাৎ রানার মনে হলো, মার্লির এখানে আসবার পিছনে অশুভ কোনও উদ্দেশ্য আছে। এই লোকের পকেটে খুদে মাইক্রোফোনও থাকতে পারে, ওর সব

কথা রেকর্ড করে নিচ্ছে; ও যদি বেফাঁস কিছু বলে, কিংবা বেআইনি কোনও প্রস্তাবে সাড়া দেয়, পরে সেটা কোর্টে ওর বিরুদ্ধে এভিডেন্স হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

শিরদাঁড়া সামান্য খাড়া করে বসল ও, তারপর মার্লির দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'পরিষ্কার করে কথা বলুন, লেফটেন্যান্ট।'

'স্যর, আপনি খুব ভাল করে জানেন কমিশনার একা নন, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিসহ এলাকার সিনেটরও চান না রানা এজেন্সি ফ্লোরিডায় ব্যবসা করুক। সাধারণ একটা ধারণা হলো, রানা এজেন্সির ভাল ব্যবসা মানে ওঁদের সবার বিরাট লোকসান।'

'এ-সব আমার কাছে নতুন কোনও খবর নয়, লেফটেন্যান্ট,' বলল রানা। 'আপনি আসল কথাটা বলে ফেলুন।'

'ক্লায়েন্টকে ব্ল্যাকমেইল করে কেউ যদি অপরাধ বোধে ভুগে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, সেটা কিছুটা হালকা দৃষ্টিতে দেখা যায়,' বলল মার্লি। 'আমি নই, কথাটা কমিশনার বলছেন। হালকা দৃষ্টিতে দেখছেন বলেই ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আর সিনেটরের সঙ্গে আলাপ করে শুধু সানসিটি শাখা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

'কিন্তু আমার কথা হলো, যদি ব্যাপারটা খুন এবং আত্মহত্যা হয়, মিস্টার রানা? তা হলে সেটাকে কমিশনার এবং বাকি দুজন কোন্ দৃষ্টিতে দেখবেন বিবেচনা করে দেখুন।'

'খুন এবং আত্মহত্যা?' প্রশ্ন করল রানা। 'ঠিক বুঝলাম না, লেফটেন্যান্ট।'

'ডাক্তার হামফ্রে আমাকে বলেছেন মিস্টার হাসান মারা গেছেন সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'মিস নোরার ব্যাপারে তিনি বলছেন, ওঁর মৃত্যু হয়েছে সোয়া ন'টা থেকে দশটার মধ্যে। মডেল সারা বলছেন, মিস্টার হাসানকে কাল রাত ন'টার সময় মিস নোরার ফ্ল্যাট থেকে বেরুতে দেখেছেন তিনি।

'এ-সব তথ্য পাওয়ার পর, জানা কথা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এই উপসংহারে আসবেন যে ব্যাপারটা ওঁদের দুজনের মধ্যে একটা সুইসাইড প্যাক্ট ছিল—মিস্টার হাসান প্রথমে খুন করেছেন মিস নোরাকে, তারপর নিজের অফিসে ফিরে নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করেছেন।

'এই ব্যাখ্যা তিনি কমিশনারকে শোনাবেন, শোনাবেন সিনেটরকেও, সেই সঙ্গে ওঁদেরকে দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলবেন না যে রানা এজেন্সির সানসিটি শাখা থেকে ডজন ডজন ক্লায়েন্টকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল। এরপর ওঁরা যদি সিদ্ধান্ত নেন ফ্লোরিডার সব ক'টা রানা এজেন্সি আপাতত বন্ধ করে দিয়ে তদন্ত করে দেখা দরকার আর কোথাও এরকম ব্ল্যাকমেইলিঙের ঘটনা ঘটছে কি না, তা হলে একটুও আশ্চর্য হব না আমি।'

কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকল রানা, মার্লির দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ দুটো যেন পাথরের তৈরি। 'এ-সব কথা আপনি আমাকে কেন বলছেন, লেফটেন্যান্ট?' অবশেষে জানতে চাইল ও।

একদিকের কাঁধ একটু উঁচু করল মার্লি, তার ছোট চোখ দুটো রানার উপর থেকে অন্যদিকে সরে গেল। 'মিস্টার রানা, আমি ছাড়া আর কেউ জানে না যে এটা খুন। ডাক্তার হামফ্রে বলছেন সুইসাইড, কারণ কার্পেটের দাগটা তিনি দেখেননি। ওই দাগের ব্যাপারটা জানলে নিজের সিদ্ধান্ত অবশ্যই বদলাবেন, সন্দেহ নেই। তবে তিনি বা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, দুজনের কেউই এখনও কিছু জানেন না।'

'তবে জানবেন, আপনি যদি রিপোর্টে ওটার কথা লেখেন,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল মার্লি। 'জানবেন না, আমি যদি ওটার কথা লিখতে ভুলে যাই।'

মার্লির ধবধবে সাদা, ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, 'আমি চাই রিপোর্টে ওটার কথা লিখতে আপনি ভুলবেন না, লেফটেন্যান্ট।'

'স্যর, মিস্টার রানা!' হতচকিত দেখাল মার্লিকে। 'আমি আপনার উপকার করতে চাইছি...'

'ওটা আপনার ধারণা, লেফটেন্যান্ট। কিন্তু আপনার কথায় রাজি হলে উপকার তো দূরের কথা, আমার বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'ক্ষতি হয়ে যাবে? কী ক্ষতি, মিস্টার রানা?'

'নাহিদ, নোরা দুজনেই খুন হয়েছে; ভেবে দেখেছেন, আপনার প্রস্তাবে রাজি হলে খুনিকে রেহাই পাবার সুযোগ করে দেব আমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'খুনিকে ধরতে পারবেন, এই আশায় এত বড় ঝুঁকি নেবেন, স্যর?'

'ঝুঁকি নিতে ভয় পেলে রানা এজেন্সি এত বড় হতে পারত?' বন্ধ ফাইলটা টেনে নিয়ে খুলল রানা। 'আমাকে এবার জরুরি একটা কাজে বসতে হচ্ছে, লেফটেন্যান্ট।'

চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে দাঁড়াল মার্লি। 'আমাকে ভুল বুঝবেন না, মিস্টার রানা। আমি কিন্তু সত্যি আপনার উপকার করতে এসেছিলাম।' রানার কাছ থেকে আর কোনও সাড়া না পেয়ে ঘুরে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল সে। তার আগে ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে মাইক্রোফোনটা অফ করে দিল।

সাত

সেদিনই, সন্ধ্যা ছ'টা। ক্যাটস্‌কিল শাখা।

নক করে রানার চেম্বারে উঁকি দিল ঝরনা। 'মাসুদ ভাই,' বলল ও। 'সাবের ভাই এসেছেন।'

'পাঠিয়ে দাও,' বলে হাতের ফাইলটা বন্ধ করল রানা। 'এই থামো, তোমাকে না আজ পাঁচটায় ছুটি দেয়া হয়েছে? যাও, এখনই বাড়ি চলে যাও!'

'জী, মাসুদ ভাই,' বলে দরজার কাছ থেকে সরে গেল ঝরনা।

একটু পরেই মোটাসোটা শরীর নিয়ে চেম্বারে ঢুকল তরুণ সলিসিটর শহীদ

সাবের, হাতে চকচকে একটা ব্রিফকেস।

'আয়, বোস,' বলল রানা। 'তবে বেশি সময় নিতে পারবি না, আমাকে একটু বেরুতে হবে।'

ভারী শরীরটা নিয়ে ধপাস করে চেয়ারটায় বসল সাবের। 'নাহিদের ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম,' উত্তেজনা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে রুদ্ধশ্বাসে বলল ও, 'ওর ডিপোজিট বক্সে নগদ এক লাখ ডলার পেয়েছি। ব্যবহার করা টাকা নয়, কড়কড়ে নতুন নোটের দুটো বাণ্ডিল।' ব্রিফকেস খুলে বাণ্ডিল দুটো বের করে ডেস্কের উপর রাখল।

'এত টাকা কোত্থেকে পেল নাহিদ!' মুখ শুকিয়ে গেল রানার। 'আর নতুন নোট মানেই...'

'সন্দেহজনক,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল সাবের। 'আমরা যদি ধরে নিই এই টাকা কারও কাছ থেকে ব্ল্যাকমেইল করে পাওয়া, তা হলে এ-ও ধরে নিতে হবে যে পুলিশকে দেয়ার জন্যে এগুলোর সিরিয়াল নম্বর টুকে রেখেছে ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার লোকটা।'

'অর্থাৎ এই টাকা যার কাছে পাওয়া যাবে, পুলিশ তাকেই ব্ল্যাকমেইলার কিংবা তার সহযোগী বলে অভিযুক্ত করবে,' বলল রানা, চিন্তিত।

'ডিপোজিট বক্সে আরও কী পেয়েছি শোন,' বলল সাবের। 'বিয়ের প্ল্যাটিনাম আঙটি, লস অ্যাঞ্জেলেসের দুটো এয়ার টিকিট। ব্ল্যাকমেইলিং ব্যবসা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে টিসাকে ফেলে, পাপের অংশীদার নোরাকে নিয়ে পালাতে যাচ্ছিল নাহিদ...'

'যেটা বুঝিস না সেটা নিয়ে কথা বলবি না তো!' বন্ধুকে মৃদু ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল রানা।

'মানে? আমি কিছু ভুল বলেছি?'

'শোন, আগে টাকাটার ব্যবস্থা কর,' বলল রানা। 'যদি পারিস কোথাও লুকিয়ে রাখ, তা না হলে নদীতে ফেলে দে, কিংবা পুড়িয়ে ফেল। ভাল কথা, নাহিদের ডিপোজিট বক্সের চাবি, কোড এ-সব কে দিল তোকে?'

'কাল রাতে টিসার কাছে ছিল না নীলা? তখন একটা দেরাজে দেখতে পায়,' বলল সাবের। 'একটা কাগজে মোড়ানো ছিল চাবিটা, তাতে কোডও লেখা ছিল।'

'টিসা...'

'ওকে কিছু না জানিয়েই ব্যাঙ্কে যাই আমি,' বলল সাবের। 'তবে ওর কাছ থেকে হয়েই তোর কাছে আসছি।'

'নাহিদ আর নোরার সম্পর্ক...টিসা কীভাবে রিয়্যাক্ট করল?' জানতে চাইল রানা।

'বলতে খুব কষ্ট হয়েছে আমার, যেন হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ইঁদুর মারলাম,' বলল সলিসিটর। 'প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি, তখন বাধ্য হয়ে নোরাকে লেখা নাহিদের কয়েকটা চিঠি ওকে দেখালাম। আমার চোখের সামনে মেয়েটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।'

রানার চোখ-মুখ ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত হয়ে উঠল। 'নোরাকে খুন করা হয়েছে,

শহীদ।'

চমকে উঠল সাবের। 'মানে?'

'আমার ধারণা, এই রাজ্যে রানা এজেন্সির বিরুদ্ধে খুব বড় একটা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। নোরার বেডরুমের কার্পেটে রক্তের দাগ পেয়েছি আমরা,' বলল রানা। 'এফবিআই রিসার্চ সেন্টার, মায়ামিতে পাঠানো হয়েছে ওই নমুনা। দু'একদিনের মধ্যেই রিপোর্ট পাব বলে আশা করছি। পুলিশও জানে এটা মার্ডার কেস।'

'তা হলে কি নাহিদই খুন করেছে নোরাকে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সাবের।

'এ-কথা কেন বললি?'

'কী জানি,' ভ্রূ কোঁচকাল সলিসিটর। 'আইডিয়াটা আপনাআপনি মাথায় চলে এল। আমাকে একটু ভাবতে দে: পরস্পরের প্রেমে পড়ে ওরা, সিদ্ধান্ত নেয় দূরে কোথাও পালাবে। হয়তো মেয়েটাই হঠাৎ মত পাল্টায়—নাহিদ বিবাহিত, পরে একটা অপরাধ বোধ ভোগাবে ওকে। শেষ মুহূর্তে নাহিদকে জানিয়ে দিল, যাবে না ও। শুনে খেপে গেল নাহিদ। গলা টিপে মারল নোরাকে, তারপর লাশটা দরজায় ঝোলাল, দেখে যাতে মনে হয় আত্মহত্যা। কিন্তু অফিসে ফেরার পর অপরাধ বোধ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করল।'

'বাহ্! ঝট্ করে সব মিলিয়ে ফেললি!'

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিও এভাবে মেলাবে,' ম্লান সুরে বলল সাবের। 'ব্যাড লাক, দোস্ত।'

'লেফটেন্যান্ট মার্লি বলছিল, আমি চাইলে ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দিতে পারবে সে। আসলে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা খাবার আশায় এসেছিল।'

'ওই লোকের সব আইডিয়াই একেকটা হিমালয়,' মন্তব্য করল সাবের, তারপর জানতে চাইল, 'কেসটা সম্পর্কে তোর তা হলে কী ধারণা?'

'ওরা আত্মহত্যা করেনি, পরস্পরকেও খুন করেনি,' বলল রানা, চেয়ার ছেড়ে কার্পেটের উপর পায়চারি শুরু করল। 'ওদেরকে তৃতীয় কেউ খুন করেছে।'

'কিন্তু পুলিশ বলছে...'

'ওদের ভূমিকা রহস্যময়,' সলিসিটরকে থামিয়ে দিল রানা।

'তা হলে কি বলবি, যাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল তাদের কেউ নাহিদকে খুন করেছে?' জিজ্ঞেস করল সাবের।

মাথা নাড়ল রানা। 'নাহিদ কাউকে ব্ল্যাকমেইল করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'তা হলে কি প্রেমের কারণে মেরে ফেলা হয়েছে নাহিদকে?' ধীরে ধীরে প্রসঙ্গটা তুলল সলিসিটর। 'সেক্ষেত্রে প্রথমেই সন্দেহ হয় টিসাকে।'

'বাথরুমের দরজায় নোরার লাশ তোলার জন্যে যে শক্তি দরকার, টিসার তা নেই। এ-ধরনের আয়োজন করা কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল রানা, তবে এটা যে খুব জোরালো কোনও যুক্তি নয়, তা-ও বুঝতে পারছে—নিজের

শক্তিতে না কুলালে কারও সাহায্য নিয়ে কাজটা করা যায়। কেন, ভাড়াটে খুনি দিয়েও কাউকে সরিয়ে দেওয়া যায়। 'তা ছাড়া, নাহিদ ও নোরার প্রেমের সম্পর্কটাও আমি বিশ্বাস করি না। ওটাও বানোয়াট বলে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু নোরার বাড়িতে পাওয়া নাহিদের লেখা চিঠিগুলোর তা হলে কী ব্যাখ্যা?' প্রশ্ন করল সাবের।

'হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টরা বলছেন, সইগুলো নকল।'

'কী-ই—ই?' সাবের হতভম্ব। 'কে নকল করেছে?'

'সব কি রাতারাতি জানা যায়?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তবে তদন্ত যখন শুরু করেছি, কিছুই গোপন থাকবে না।'

'কোথাকার পানি কোথায় গড়াচ্ছে, আমি তো কোনও তাল পাচ্ছি না, দোস্ত!'

ম্লান, তিক্ত একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলি? ডন ডিকোর বিরুদ্ধে যৌথ বাহিনীকে সাহায্য করেছিল নাহিদ। যে কারণে নাহিদকে খুন করা হলো, সেই একই কারণে খুন করা হয়েছে নোরাকে।'

'ইয়া, আল্লাহ!'

'আর কী খবর এনেছিস?' তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি।

'এটা খুবই আশ্চর্য একটা খবর,' বলল সলিসিটর। 'বাজারে গুজব ছড়িয়েছে মালিকানা বদলে গেলে তোদের এজেন্সির সানসিটি শাখা খুলতে অনুমতি দেবেন পুলিশ কমিশনার। শুধু তাই নয়, এরইমধ্যে আমাকে প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে।'

'কী রকম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'গুডউইল সহ সানসিটি শাখার যাবতীয় মালামাল সাত লাখ ডলার। বেচবি?'

রানার পায়চারি থামল না। 'গুজবটা আমার কানেও এসেছে,' বলল ও। 'কে কিনতে চাইছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সাবের। 'একটা এজেন্সির মাধ্যমে দেয়া হয়েছে প্রস্তাবটা: প্লাস-মাইনাস।'

'ওটার মালিক একজন লইয়ার না?' জানতে চাইল রানা।

'নিজেকে লোকটা তাই বলে। তবে আমি অন্য নামে ডাকি,' বলল সাবের। 'কী বলব তাকে?'

'বলবি আমাদের সানসিটি শাখা এক মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়ে গেছে,' জবাব দিল রানা।

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সলিসিটর। 'কে কিনল?'

'জিসান হাওয়ার্ড নামে এক তরুণ,' জানাল রানা। 'কাল তোর সঙ্গে দেখা করবে ও, দশ লাখ ডলারের চেকটা তখনই পেয়ে যাবি, বাকি সব ডিটেইলস্ সহ। মনে রাখিস—জিসানকে আমি চিনি না, জিসানও আমাকে চেনে না। ঠিক আছে?'

'তা আছে, কিন্তু আমাকে খানিকটা অন্ধকারে রাখা হচ্ছে না কি?' জিজ্ঞেস করল সাবের, বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

বন্ধুর সামনে দাঁড়াল রানা। 'নাহিদ আর নোরার খুনিকে খুঁজছি আমরা,' বলল

ও। 'আমাকে জানতে হবে, যে লোকটা সানসিটি শাখা কিনতে চাইছে, আর খুনি—দুজন একই ব্যক্তি কি না। কাজটা আমার হয়ে জিসান করবে। ওর অবশ্য আরও অনেক কাজ আছে।'

সলিসিটর চলে যাওয়ার পর চেম্বার থেকে বেরিয়ে রিসেপশনে ঢুকল রানা। ডেস্কে বসে ব্যস্ত হাতে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে কী যেন লিখছে ঝরনা।

'কী আশ্চর্য! তোমাকে না আমি এক ঘণ্টা আগে চলে যেতে বলেছি?' বলল রানা, ওর দিকে এগোচ্ছে।

'তা বলেছেন, কিন্তু ভাবলাম আপনি না যাওয়া পর্যন্ত থাকি।'

'তোমাকে ছাড়া আমরা চলি কীভাবে বলো তো?' বলল রানা। 'চেম্বার থেকে বেরিয়ে যদি দেখতাম তুমি নেই, নিজেকে আমার দু'হাত কাটা লোক বলে মনে হত।'

খুশির নীরব হাসি ছড়িয়ে পড়ল ঝরনার সারা মুখে।

'জিসানের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেন কটায়, ঝরনা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাড়ে সাতটায়, মাসুদ ভাই,' অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে না তাকিয়েই জবাব দিল ঝরনা, সব মুখস্থ করা থাকে ওর। 'হোটেল সুলতান ইন্টারন্যাশনালে।'

'যাই, মলিকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে জিসানের সঙ্গে আলাপটা সেরে আসি,' বলে মলির কামরার দিকে এগোল রানা।

'মাসুদ ভাই,' পিছন থেকে ডাকল ঝরনা। 'মলি তো অনেক আগে, সেই সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি চলে গেছে।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, একটু অবাক হয়েছে। অফিসের কাজে একটা টিমের সঙ্গে বাইরে ব্যস্ত থাকায় মলির সঙ্গে আজ জোট বাঁধতে পারেনি সাইমন। কাউকে কিছু বলেনি রানা, তবে ওর মাথায় ছিল ব্যাপারটা—জিসানের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় মলিকে বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দেবে।

'কিন্তু আমি না বলে দিয়েছি আপাতত কিছুদিন একা কেউ চলাফেরা করতে পারবে না?' রানার চোখে অসন্তোষ।

'একা নয়, মাসুদ ভাই,' বলল ঝরনা। 'রয় ফিজিও পৌঁছে দিয়ে এসেছে ওকে।'

'ও, আচ্ছা, তাই বলো,' স্বস্তি বোধ করল রানা।

হাতঘড়ি দেখল ঝরনা। 'মলি তাড়াহুড়ো করে চলে গেল তো, তাই আপনাকে বলে যেতে পারেনি...'

'হুম,' বলল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'তা তাড়াহুড়োটা কীসের?'

'ব্রিটনি স্পিয়ার্সের কনসার্ট,' হেসে ফেলে বলল ঝরনা। 'বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে একটা টিকিট যোগাড় করেছে বেচারি। ফোনে আলাপ করছিল, শুনতে পেলাম—হাতের কাজ শেষ করে সাইমনই ওকে নিয়ে যাবে, তারপর ফিরিয়েও আনবে।'

'ভেরি গুড,' বলল রানা। 'এন্টারটেইনমেন্টেরও দরকার আছে। গুড নাইট, ঝরনা।'

'নাইট, মাসুদ ভাই।'

ফাল্গুন ভবন।

শুধু নার্ভাস নয়, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে মলি। সেজেগুজে আয়নার সামনে পায়চারি করছে। মারাত্মক, অত্যন্ত জটিল একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে ওর জীবনে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পারলে আজই এর একটা বিহিত করতে হবে ওকে।

মনে মনে প্ল্যান করছে কীভাবে বাড়ি থেকে বেরুনো যায়।

সাইমন অনেক দূরে কাজ করছে, রাত ন'টার আগে কাজটা শেষও হবে না, ফোনে এ-সব কথা জানিয়ে বুদ্ধি দিয়েছে, মলি যেন নিজের চেষ্টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।

সাইমন ফোন করবার পর এক ঘণ্টা পার হতে চলেছে, অথচ বাড়ি থেকে বেরুবার কোনও উপায় করতে পারছে না মলি। কীভাবে বেরুবে ও? পাপিট রোডের শেষ মাথায় বাড়িটা, মাথা কুটে মরলেও এখানে কোনও ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না। তা পেতে হলে আধ মাইল হেঁটে মেইন রোডে পৌঁছাতে হবে। অতটা হাঁটার মত মানসিক অবস্থা নেই ওর। তা ছাড়া, সেটা বোধহয় নিরাপদও হবে না।

যত দেরি হচ্ছে ততই বেশি নার্ভাস বোধ করছে মলি।

হঠাৎ একটা আইডিয়া এল মাথায়। মায়ামি শাখার দুজন এজেন্ট কাল থেকে পাহারা দিচ্ছে বাড়িটা। মাঝে-মধ্যে ওদেরকে দেখতে পেয়েছে মলি, তবে এখনও আলাপ করেনি। ওদের একজনকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বললে কেমন হয়?

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দরজা খুলে পর্টিকোয় বেরিয়ে এল মলি। বিশ-একুশ বছরের এক শিখ তরুণকে বাগানে হাঁটতে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'রানা এজেন্সি, মায়ামি শাখা, অ্যাম আই রাইট?'

'ইয়েস, ম্যা'ম!' মাথার পাগড়িটা অ্যাডজাস্ট করে বলল তরুণ।

'আমার একটা ট্যাক্সি দরকার, লিংকন অডিটোরিয়ামে যাব, ওখানে...'

'ব্রিটনি স্পিয়ার্সের কনসার্ট!' হেসে উঠল তরুণ। 'এখনই আনছি, ম্যা'ম।'

ট্যাক্সি মেইন রোডে বেরিয়ে আসতেই ড্রাইভারকে মলি বলল, 'সিদ্ধান্ত বদলেছি—লিংকন অডিটোরিয়ামে নয়, আমি সানসিটির জন এলটন স্ট্রিটে যাব।'

'ঠিক আছে, মিস,' বলল ড্রাইভার, ঘাড় ফিরিয়ে মলিকে একবার দেখে নিয়ে নিঃশব্দে হাসল।

সেটা মলি খেয়ালই করল না। ও ভাবছে, আজ ওকে লোহার মত কঠিন হতে হবে। রানা এজেন্সির সদস্যরা আত্মার আত্মীয়র মত, একে একে মারা যাচ্ছে ওরা, এই অবস্থায় কিছুতেই চুপ করে থাকবে না ও।

হয় কিছু একটা করা হোক, তা না হলে মাসুদ ভাইকে সব কথা বলে দেবে মলি।

আধ ঘণ্টা দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে মলিকে সানসিটির এলটন স্ট্রিটে পৌঁছে দিল ড্রাইভার। ভাড়া মিটিয়ে গাড়ি থেকে নামল মলি। প্রায় নির্জন রাস্তা, ফুটপাথ

ধরে দ্রুতপায়ে হাঁটছে। জানে এটা পাঁচ নম্বর স্ট্রিট, সোজা হাঁটলে নদীর ধারে পৌঁছানো যাবে।

মাঝে-মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকটা দেখে নিচ্ছে মলি। তবে যত এগোল ততই খালি হয়ে গেল রাস্তা। কেউ ওর পিছু নেয়নি। তা সত্ত্বেও আশ্বস্ত হওয়ার জন্য কোটের পকেটে হাত ভরে পিস্তলটার স্পর্শ নিল একবার।

হঠাৎ হাঁটার গতি কমিয়ে আনল মলি, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল, ডান-বাম দু'দিকই ভাল করে দেখে নিচ্ছে। সবশেষে উল্টোদিকের উঁচু দালানটার দিকে তাকাল। কেউ ওকে লক্ষ করছে না বুঝতে পেরে স্বস্তি বোধ করল, রাস্তা পার হয়ে ঢুকে পড়ল সরু একটা গলিতে। এখানে আলো খুব কম। এই গলিটাও নদীর ধারে পৌঁছেছে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর নদীর উপর হালকা কুয়াশা ঝুলে থাকতে দেখল মলি। ওপারে একটা টাগবোট দেখা যাচ্ছে, সেটা থেকে ভেসে আসা সাইরেনের আওয়াজ নার্ভাস একটা পশুর কাতর কান্নার মত লাগল কানে। ওর নিজের অবস্থার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল! ঠিক ওরকম আওয়াজ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ওঁর।

আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে মলি। আবার ডানে-বাঁয়ে তাকাল। তারপর সরু, লম্বা একটা দালানের দোরগোড়ায় পা রাখল। হাত দিয়ে দরজা খুলল, ঢুকে পড়ল অন্ধকার লবিতে।

অন্ধকারে হাঁটার মধ্যে ইতস্তত কোনও ভাব নেই, যেন এখানে এত বেশি আসা হয়েছে যে জানে ঠিক কোথায় যেতে হবে ওকে। একটা দরজা খোলার আওয়াজ হলো।

'মলি?'

ওই গলার আওয়াজে কী জাদু আছে কে-জানে, শোনা মাত্র মলির সারা শরীর পুলকে অবশ হয়ে এল। 'হ্যাঁ।' এতক্ষণ যে কঠিন থাকার পণ করছিল, বেমালুম ভুলে গেল সে-কথা।

অন্ধকার কামরার ভিতর ঢুকল মলি। শুনতে পেল ওর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তারপর খুট করে আওয়াজের সঙ্গে আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারদিক। ঘুরল ও, হাসছে; হাত বাড়িয়ে নিজের প্রশস্ত বুকে ওকে টেনে নিয়েছে লরেন্স সাইমন।

'আজ তোমাকে কাছে না পেলে আমি পাগল হয়ে যেতাম,' বলল সাইমন। 'সারাদিন এত কাছে থাকো, অথচ মাঝখানে যেন এক গ্যালাক্সি দূরত্ব।'

সাইমনের গলাটা দু'হাতে জড়াল মলি, নিজের গালটা ওর গালে চেপে ধরল। 'একটা ভুল করে এসেছি,' ফিসফিস করল। 'মাসুদ ভাই মানা করা সত্ত্বেও একা বেরিয়েছি, সেন্ট্রিদের একজনকে দিয়ে ট্যাক্সি আনিয়ে। জিজ্ঞেস করলে কী বলব জানি না।'

'বাদ দাও। ইস্, কতদিন পর!'

'তা হলে এখনও তুমি আমাকে চুমো খাচ্ছ না কেন?'

দুজনেই হেসে উঠল, তারপর কয়েক মুহূর্ত ব্যস্ত হয়ে থাকল পরস্পরকে

আদর করতে।

দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে মলি, বলল, 'সময় কিন্তু খুব কম।' সাইমনকে ঠেলে একটু সরিয়ে দিল। 'এখন কোনও কথা নয়। একটা মিনিটও নষ্ট কোরো না।'

'তোমার মত আমিও এই সময়টার জন্যে পাগল হয়ে ছিলাম,' বলল সাইমন, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে-ও। 'তোমার কোটটা আমাকে দাও। পাশের কামরায় আগুন আছে। চলো ওখানে যাই।'

কোট খুলে সাইমনের হাতে ধরিয়ে দিল মলি, তারপর ও-ই প্রথমে ঢুকল পাশের কামরায়। ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুন আর নরম, স্প্রিং লাগানো বিছানা অভ্যর্থনা জানাল ওকে। শুধু কমলা শিখার উষ্ণ আভায় আলোকিত কামরাটা, এরকম একটা রোমান্টিক পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে ও।

'আলো জ্বেলো না, লরেন্স,' ফিসফিস করে বলল।

দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সাইমন, দেখছে মলিকে। এত দ্রুত কাপড় খোলে মলি, মুগ্ধ না হয়ে পারে না ও। এখানে একটা চেইন টানে, ওখানে একটা পিন খোলে, চোখের পলকে ওর সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে রূপ-যৌবনের বিশাল ভাণ্ডার।

'মলি, মাই ডার্লিং, আমার চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে তুমি,' কথাটা বলার সময় সাইমনের গলাটা বুজে এল।

ফায়ারপ্লেসের পাশে হাঁটু গাড়ল মলি, সাইমনের দিকে পিছন ফিরে বসেছে, আগুনের নাগাল পাওয়ার জন্য হাত বাড়াল। 'এ-কথা একা শুধু তোমার মুখে শুনতে চাই আমি, সাইমন। কারণ, বুঝতে পারি, তুমি অন্তর থেকে বলছ।'

মলির কাছে গিয়ে দাঁড়াল সাইমন, ওর পাশে হাঁটু গাড়ল; এক হাতে জড়াল ওকে, তারপর কাছে টানল। 'প্রতিটি সুযোগ অনেক দেরি করে আসছে, প্রতিবার আধ কি এক ঘণ্টার বেশি সময় পাই না, কিন্তু এই সুযোগ আর সময়গুলোর জন্যেই আমি বেঁচে আছি, মলি,' ফিসফিস করল ও। 'আমার কী অনুভূতি হয় জানো? দুনিয়াটা যেন স্থির হয়ে গেছে, বেঁচে আছি শুধু আমরা দুজন।'

মুখ তুলে সাইমনের দিকে তাকাল মলি, তারপর অকস্মাৎ ব্যগ্র হয়ে উঠে ওর গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলল ওকে।

ফায়ারপ্লেসের মাথায় রাখা ঘড়ি রাত এগারোটা বাজার সংকেত দিল। গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল, আওয়াজটা শুনে চমকে উঠল মলি। খুব নার্ভাস বোধ করছে ও।

'নড়ো না, ডার্লিং,' অন্ধকার বিছানা থেকে বলল সাইমন, এক হাতে জড়াল মলিকে। 'বারোটার আগে কনসার্ট শেষ হবে না, কাজেই...'

'কোথায় আছি, ভুলে গেছ? খেয়াল নেই, ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?' বলল মলি। 'মাসুদ ভাই হয়তো টের পাবেন আমি কখন ফিরলাম।'

প্রতিবাদ করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল সাইমন, ওর মুখে হাতচাপা দিল মলি। 'লরেন্স, এবার কাজের কথা। ব্যাপারটা যথেষ্ট সিরিয়াস হয়ে গেছে, বুঝলে। এবার এর একটা বিহিত করতে হয়।'

'কোনটার বিহিত, ডার্লিং? কী সিরিয়াস হয়ে গেছে?' সাইমন এমন ভাব করল যেন কিছু হয়নি।

আবার নিজের চিন্তায় ডুবে গেল মলি। যাকে খুশি তাকে ভালবাসা যায়, তাতে কারও কিছু বলবার থাকতে পারে না। সাইমনকে প্রচণ্ড ভালবাসে ও, সেটা সবার কাছে গোপন রাখবার কোনও ইচ্ছে কখনওই ওর ছিল না। কিন্তু যখন বুঝল ওদের ভালবাসাটা নির্ভেজাল, পরস্পরকে ছাড়া ওরা বাঁচবে না, এবার সবাইকে ব্যাপারটা জানানো যেতে পারে—ঠিক তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত কথাটা ওর কানে এল!

ফ্লোরিডা আণ্ডারওয়ার্ল্ডের অজ্ঞাতপরিচয় কোনও গডফাদার মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে সাইমনকে দিয়ে মারাত্মক, বেআইনি কিছু কাজ করিয়ে নিচ্ছে।

নিজে বেঈমান নয়, সাইমনকেও বেঈমান বলে ভাবতে পারে না মলি, তাই সরাসরি প্রশ্ন করেছে ওকে, 'কার কী কাজ করছ তুমি? কত টাকায় বিক্রি হয়ে গেলে?'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সাইমন জবাব দিয়েছে, 'কাজটা একজন গডফাদারের আস্তানা থেকে এসেছে। যতটুকু জানতে পেরেছি, তার আশ্রয়ে কেউ একজন আছে, সেই আশ্রিতকে সাহায্য করছে সে।'

'কী কাজ?'

'কিছু তালিকা তৈরি, তথ্য সংগ্রহ। অসৎ পুলিশ অফিসারদের তালিকা; এমন অপরাধ কিংবা দুর্বলতা আছে যাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করা যায়, তাদের তালিকা; গোটা ফ্লোরিডা রাজ্যে রানা এজেন্সির যত এজেন্ট আছে তাদের সবার সমস্ত তথ্য—এইসব কাজ।'

শুনে আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে মলি। জিজ্ঞেস করছে, 'নিজের মুখে এ-সব তুমি স্বীকার করছ? রানা এজেন্সির সঙ্গে এতবড় বেঈমানী তুমি করতে পারলে?'

ব্যাকুল আবেদন জানিয়েছে সাইমন, 'না, প্লিজ, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, মলি! রানা এজেন্সির সঙ্গে মোটেও আমি বেঈমানী করিনি। আমাদের কোনও এজেন্টের একটা তথ্যও দিইনি আমি ওদেরকে।'

'আর রানা এজেন্সির ক্লায়েন্টদের নাম-ঠিকানা, যাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করা যায়?'

মাথা নিচু করেছে সাইমন। 'ব্ল্যাকমেইল করা যায়, এমন কিছু লোকের তালিকা তৈরি করে দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু তারা কেউ আমাদের এজেন্সির ক্লায়েন্ট নয়। সত্যি বলছি!'

'এটা বেঈমানী নয়? তোমার ভেতর নৈতিকতা বোধ বলে কিছু নেই? কেন, সাইমন, কেন? টাকা দরকার আমাকে বলতে! অফিসকে বলতে! এমন তো নয় যে তুমি জানো না পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাসুদ ভাই। আর আমরা তো ওঁর আপনজন!'

প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হয়েছে সাইমনের। 'ভুল হয়ে গেছে! আমাকে তুমি মাফ করে দাও।'

কঠিন হতে হয়েছে মলিকে। 'আমার কাছে নয়, সাইমন, তোমাকে মাসুদ

ভাইয়ের কাছে মাফ চাইতে হবে। চলো আমার সঙ্গে, সব কথা খুলে বলো ওঁকে—মাসুদ ভাই এখন নিউ ইয়র্কে আছেন।'

মাথা নেড়েছে সাইমন, তারপর ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করেছে, 'এর মধ্যে আরও অনেক ব্যাপার আছে, মলি, সব কথা তোমাকে বোঝানো যাবে না। শুধু এটুকু বলি, আমাকে কাজ দেয়ার আগে ওরা শর্ত দিয়েছিল, কথাটা আমি কাউকে জানাতে পারব না। জানালে আমার যেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যথা লাগবে প্রথমে সেখানে আঘাত করবে, তারপর আঘাত করবে আমাকে।'

'মানে?'

'মানেটা পরিষ্কার, প্রথমে ওরা তোমার ওপর আঘাত করবে। কী করবে তা-ও জানি। তোমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিশ-বাইশজনকে দিয়ে রেপ করিয়ে মেরে ফেলবে। তারপর আমাকে কেটে ভাসিয়ে দেবে সাগরে।'

'তা হলে এই দুষ্টচক্র থেকে তুমি বেরুবে কীভাবে?'

সাইমন বলেছে, 'একবার যখন ঢুকে পড়েছি, বেরুতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে। যে কাজ দুটো করে দিয়েছি তার বাকি টাকাটা আগে পেয়ে নিই, তারপর ধীরে ধীরে সরে আসা যাবে...'

কী করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না মলি, এই অবস্থায় পরদিনই আতঙ্কিত হয়ে ওর সঙ্গে দেখা করল সাইমন, বলল, 'ফ্লোরিডা আণ্ডারওয়ার্ল্ডের সেই গডফাদার আমার মাধ্যমে তোমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছে।'

'কী প্রস্তাব?'

'আমাদের কেস হিস্ট্রি বুক কপি করে ওদের হাতে তুলে দিলে নগদ দুই মিলিয়ন ডলার দেবে ওরা।'

'এত টাকা? এক কপি কেস হিস্ট্রির জন্যে? কেন, ওটা দিয়ে কী করবে ওরা?'

সাইমন ঢোক গিলে বলেছে, 'কেস হিস্ট্রি দেখে আমাদের ক্লায়েন্টদের কার কী দুর্বলতা জেনে নেবে, তারপর তাদের ব্ল্যাকমেইল করবে। এটা বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা, মলি। দুই মিলিয়ন তো খুব কমই দিতে চাইছে ওরা।'

হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠেছে মলির চোখ-মুখ। 'জবাবে কী বলেছ তুমি?'

'এমন কিছু বলিনি যাতে ওরা খেপে যায়। বলেছি, তোমাকে রাজি করতে সময় লাগবে।'

'পরিণতি যা-ই হোক, বলে দাও আমি রাজি হইনি।'

মাথা নিচু করে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করবার পর সাইমন বলেছে, 'দুটো দিন ভাবতে দাও আমাকে।'

কিন্তু তার আর সময় পাওয়া যায়নি। পরদিনই, অর্থাৎ গতকাল খুন হয়ে গেছে রানা এজেন্সির সানসিটি শাখার দুই এজেন্ট—নাহিদ হাসান, নোরা বার্ন। জানা কথা, ক্যাটসকিল শাখার চেয়েও অনেক আগে সানসিটি শাখাকে টার্গেট করেছিল অজ্ঞাতপরিচয় গডফাদার, তারই পরিণতিতে এই হত্যাকাণ্ড।

সাইমন ওকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করায় সংবিৎ ফিরে পেল মলি। ওর হাতটাকে

থামিয়ে দিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'তুমি না বোঝার ভান করছ কেন, সাইমন? সানসিটিতে যা কিছু ঘটছে, তার জন্যে তোমার ওই গডফাদার দায়ী। এখনও যদি মাসুদ ভাইকে আমরা সব কথা খুলে না বলি...ওহ্, আল্লাহ, আমি আর ভাবতে পারছি না!' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ও, ফোঁপাচ্ছে।

একহাতে ওকে জড়াল সাইমন। 'শান্ত হও, লক্ষ্মী সোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভান করছি, কিন্তু সে তো তোমার জন্যেই, তুমি যাতে উদ্বিগ্ন না হও,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ও। 'সারাক্ষণ এটা নিয়েই তো ভাবছি।'

'কী ঠিক করলে?' কান্না থামিয়ে জানতে চাইল মলি। 'মাসুদ ভাইকে কখন সব কথা বলব আমরা?'

'ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মলি,' নরম সুরে বলল সাইমন। 'ভাল করে ভেবে দেখো, আমরা দেরি করে ফেলিনি তো? এখন বললে মাসুদ ভাইয়ের রিয়্যাকশন কী হবে চিন্তা করো। তাড়াহুড়ো করো না, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করো।'

ভয় পেয়ে গেল মলি। ওরা কি সত্যি দেরি করে ফেলেছে? আরও আগে বলতে পারলে নাহিদ, নোরা খুন হত না?

হয়তো হত না। সেক্ষেত্রে ওদেরকে দায়ী করলে খুব কি দোষ দেওয়া যাবে মাসুদ ভাইকে?

মাসুদ ভাইয়ের কোমল দিকটা সম্পর্কে জানে মলি, কঠোর দিকটা সম্পর্কে কিছু জানে না—তবে শুনেছে। শিউরে উঠল ও, বলবার পর কী শাস্তি পেতে হবে কে জানে!

প্রথমে সম্ভবত নিরাপত্তার কথা বলে ওদেরকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেবেন তিনি। পরে রানা এজেন্সি থেকেই হয়তো বিদায় করে দেবেন, প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার অপরাধে। কিংবা—যেহেতু একজন মাফিয়া গডফাদারের কাছ থেকে অন্যায় কাজের জন্য টাকা খেয়েছে সাইমন—ওকে হয়তো দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন!

হ্যাঁ, সাইমন ঠিক পথেই চিন্তা করছে। আমরা অনেক দেরি করে ফেলেছি। মাসুদ ভাইকে কিছু বলবার সময় পার হয়ে গেছে।

আতঙ্কে কেঁপে উঠল মলি। অন্ধকারে জড়িয়ে ধরল সাইমনকে।

'হ্যাঁ, তোমার ভয়টা মিথ্যে নয়,' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার সময় কানের কাছে ফিসফিস করল সাইমন, পরিষ্কার বুঝতে পারছে কী ভাবছে মলি। 'আমি যে অন্যায় করেছি, মাসুদ ভাই সেটাকে ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করতে পারেন। তুমি চাও, একজন স্নাইপার গুলি করে মেরে ফেলুক আমাকে?'

'ন্-না! ন-না!' কাতর পশুর মত গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল মলির গলা থেকে, সাইমনকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল।

'আমরা না বললে আমাদের ইনভলভমেন্ট সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারছে না,' ধীরে ধীরে বলল সাইমন, মলির মাথায় একটা চুমো খেল।

নিঃশব্দে কাঁদছে মলি। 'কিন্তু ওরা যদি আবার যোগাযোগ করে? কী বলবে তুমি?'

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাইমন। 'এখানে এদের কাছে মুখ খোলা

যাবে না, ওখানে ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না। আমরা আরও সময় চাইব, মলি। এ-ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।'

'কিন্তু ভেবে দেখেছ, কী মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছি আমরা?' বলল মলি, কান্না থেমে গেছে। 'আমরা না বললেও, অন্য কোনওভাবে জেনে ফেলতে পারেন মাসুদ ভাই। আর ওদিকে, ওই গডফাদার তোমাকে আর কোনও সময় না-ও দিতে পারে। তখন কী হবে?'

'একসঙ্গে এত কথা ভাবতে গেলে পাগল হয়ে যাব,' বলল সাইমন। 'যখন যে সমস্যার সামনে পড়ব তখন সেটা নিয়ে মাথা ঘামাব, মলি। আমার আসলে কপালটাই খারাপ, খুশির খবরে একটু যে স্বস্তি বোধ করব, তারও উপায় নেই...'

'মানে?'

'না, মানে, নাহিদ মারা যাওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশি,' বলল সাইমন। 'এখন নতুন বিপদ হয়ে দেখা দিচ্ছেন মাসুদ ভাই...'

'কী ছাইপাঁশ বকছ!' আঁতকে উঠে জানতে চাইল মলি। 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না কেন? নাহিদ মারা যাওয়ায় তুমি...কী বললে?'

'আমি খুশি। ছাইপাঁশ নয়, ঠিকই বলছি,' বলে অন্ধকারে তিক্তসুরে একটু হাসল সাইমন। 'হ্যাঁ, নাহিদ খুন হওয়ায় আমি আনন্দিত। আমার ব্যাপারটা জানত ও। ছ'মাস ধরে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল।'

'কী? ও আল্লাহ্!' বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল মলি। 'কী বলছ!' মনে মনে ভাবছে, সাইমনকে কি আমার বলা দরকার, আমাকেও ওরা ব্ল্যাকমেইল শুরু করেছে?

'যে টাকা ওদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি, তারচেয়ে বেশি নাহিদকে দিতে হয়েছে আমার,' বলল সাইমন, বিছানা থেকে নেমে বেডসাইড টেবিলের ল্যাম্পটা জ্বালল, চেয়ারের হাতল থেকে ট্রাউজার নিয়ে পরছে।

'ছ'মাস ধরে?' মলির বিস্ময় যেন দূর হওয়ার নয়। সাইমনের দিকে ফিরল ও, হাত দিয়ে বুক ঢাকল। 'কিন্তু আমাকে তো বলোনি যে এই পাপ এত আগে থেকে করছ তুমি! কতদিন ধরে করছ, সাইমন? আমাকে তুমি অন্ধকারে রেখেছ কেন?'

'তোমাকে হারাতে হবে, এই ভয়ে সব কথা জানাতে সাহস পাইনি,' স্বীকার করল সাইমন। 'ওদের কাজগুলো আট-দশ মাস ধরে করছি আমি। আর নাহিদরা নিশ্চয়ই আরও আগে থেকে করছে...'

'নাহিদরা? নাহিদের সঙ্গে আর কে?'

মাথা নাড়ল সাইমন, শোল্ডার হোলস্টার পরে পিস্তলটা ভরছে তাতে। 'তা আমি জানি না...'

'এক সেকেণ্ড,' বলল মলি। 'ব্যাপারটা আমি মেলাতে পারছি না। যে গডফাদারের আস্তানা থেকে কাজের প্রস্তাব দেয়া হয় তোমাকে, তারাই নাহিদকে দিয়ে আমাদের সানসিটির ক্লায়েন্টদের ব্ল্যাকমেইল করছিল, তাই তো?'

মাথা ঝাঁকাল সাইমন। 'নিশ্চয়ই তাই হবে। ওদেরকে দিয়ে যা করাতে পেরেছে, আমাদেরকে দিয়েও তাই করানোর চেষ্টা হচ্ছে—পার্টি একটা হবারই

তো কথা।'

'কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত না? এক হাতে তোমাকে টাকা দিচ্ছে ওরা, আরেক হাত দিয়ে সেই টাকা কেড়ে নিচ্ছে?'

'হ্যাঁ, নিচ্ছে, আমার ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করার জন্যে,' বলল সাইমন। 'আমি ওদের সব কাজ করে দিতে রাজি হচ্ছি না, তাই।'

'নাহিদ ব্ল্যাকমেইল করছিল, এ আমি বিশ্বাস করি না।' আবার কান্না পাচ্ছে মলির। 'ও নিজে?'

'ও নিজে কী?'

'তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে?'

'এরকম ক্ষেত্রে তা কি কেউ নেয়!' তিক্ত হেসে বলল সাইমন। 'অচেনা এক লোক ওর চিঠি নিয়ে এসেছিল। তাতে হুমকি দিয়ে বলা হয়, প্রতি হপ্তায় বিশ হাজার ডলার না দিলে মাসুদ ভাইকে সব বলে দেবে।'

'ওই লোক এসে টাকা নিয়ে যেত?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন দেখতে সে? বয়স কত?'

'প্রকাণ্ড কুস্তিগির। ডান জুলফির নীচ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত শুকনো ক্ষতচিহ্ন। বাম চোখের ওপর কালো পট্টি বাঁধা।'

'হাতের লেখা তুমি নাহিদের বলে চিনতে পেরেছ?'

'কমপিউটার কম্পোজ, কাগজে ছাপা; তবে সইটা চিনেছি।'

'এ-ব্যাপারে সরাসরি নাহিদের সঙ্গে তুমি কথা বলোনি কেন?' জিজ্ঞেস করল মলি। 'তোমার মনে এ-প্রশ্ন জাগেনি, ওর নাম দিয়ে এই কাজ অন্য কেউ করতে পারে?'

'চিঠিতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে,' বলল সাইমন। 'ভাষাটা ছিল এরকম—কোনও রকম ব্যক্তিগত যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে বিনা নোটিসে মাথার ওপর গজব নেমে আসবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মলি, ওর মনে পড়ছে—ওকে লেখা চিঠিতেও এই একই হুমকি দেওয়া হয়েছে। 'আরও বেশি সন্দেহ হচ্ছে, নাহিদ নয়, কাজটা অন্য কেউ করছে,' বলল মলি, মনে মনে ভাবল, এটা বুঝতে আমারও দেরি হয়ে গেছে। 'প্রমাণ চাও? নোরাকে লেখা ওর প্রেমপত্র যেগুলো পাওয়া গেছে, মাসুদ ভাই সেগুলোর প্রতিটি সই এক্সপার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছেন—সব নকল।'

'ওহ্, গড! তার মানে নাহিদ নির্দোষ!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'স্বীকার করছি, আমি একটা বোকা,' খানিক পর ধীরে ধীরে বলল সাইমন।

'লরেন্স!' বিছানার উপর উঠে বসল মলি, চিবুকের কাছে তোলা ভাঁজ করা হাঁটু দু'হাতে জড়াল। 'ওহ্, লরেন্স!' গলাটা বুজে এল ওর, ভাবছে—সব কথা ওকে আমার বলা দরকার!

'মলি? কী হয়েছে তোমার?' ঘুরে তাকাল সাইমন, মলির চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল, তাড়াতাড়ি বিছানায় ওর পাশে বসে হাত রাখল নিরাবরণ কাঁধে।

'ডার্লিং, তুমি কিছু বলতে চাইছ আমাকে।'

'হ্যাঁ।' শিউরে উঠল মলি। 'একা শুধু তোমাকে নয়, ওই একই কথা বলে আমাকেও ওরা ব্ল্যাকমেইল শুরু করেছে...'

'গড, ওহ্ গড! কবে থেকে? আমাকে তুমি জানাওনি কেন?'

'তোমাকে হারাতে হবে এই ভয়ে সিদ্ধান্ত নিই, জানাব না,' বলল মলি। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেপে রাখতে পারলাম না। মাত্র কদিন আগে চিঠিটা পাই আমি। তোমার চিঠির মতই: কমপিউটার কম্পোজ, কাগজে ছাপা; নাহিদের সই—নিশ্চয়ই নকল। মাত্র একটা, মানে প্রথম কিস্তির টাকাটা দিয়ে এসেছি...'

'দিয়ে এসেছ? কেউ নিতে আসেনি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সাইমন, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর। 'কাকে দিয়ে এসেছ?'

'কারও হাতে নয়। সানসিটি শাখার ঠিক বাইরে, দরজার পাশে একটা বাক্স আছে, জানো তো? কারও কোনও অভিযোগ থাকলে লিখে জানাবার জন্যে? টাকা ভরা এনভেলাপটা ওই বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে আসতে বলা হয়েছিল, তাই দিয়ে এসেছি।'

'কত?'

'বিশ হাজার ডলার। প্রতিমাসে চেয়েছে।'

'গড!' বিছানা ছেড়ে মেঝেতে পায়চারি শুরু করল সাইমন। একবার থামল, চেয়ারের হাতল থেকে তুলে নিয়ে মলির বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিল ওর কাপড়চোপড়।

কয়েক মুহূর্ত আর কেউ কিছু বলল না। তারপর সাইমনই নীরবতা ভাঙল। 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, মলি। তুমি সাহস দিলে বলি।'

'কী আইডিয়া?' কাপড় পরতে পরতে জিজ্ঞেস করল মলি, ওর হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে।

'কপালদোষে, বোকামি করেও, দুটো বিরাট শক্তিকে আমরা শত্রু বানিয়ে ফেলেছি,' সাবধানে কথা বলছে সাইমন। 'এদের শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমরা যদি পালিয়ে যাই, কেমন হয় সেটা?'

ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না, ভাবল মলি। 'পালিয়ে কোথায় যাব?' ঢোক গিলে জানতে চাইল।

'যেখানে আমাদের ইচ্ছে—মেক্সিকো, কানাডা, আফ্রিকার কোনও দেশে। আমার কাছে যে টাকা এখনও আছে, তা দিয়ে বাকি জীবনটা দুজনের বেশ চলে যাবে।'

রানা এজেন্সিকেও আমি কম ভালবাসি না, ভাবল মলি। 'যাদের সঙ্গে এতগুলো বছর আমরা কাজ করেছি,' ধরা গলায় বলল ও, 'এরকম গুরুতর বিপদের সময় তাদের ফেলে পালাব?'

'জানতাম এই কথাই বলবে তুমি,' মাথা নিচু করে বলল সাইমন।

'তা ছাড়া, কেন ভাবছ পালানো সম্ভব?' নার্ভাস, কাঁপা কাঁপা একটু হাসি দেখা দিল মলির ঠোঁটে। 'শুধু মাসুদ ভাই নয়, আমার ধারণা তোমার ওই গডফাদারের হাতও অনেক লম্বা।'

'হ্যাঁ, তা-ও ঠিক,' হতাশ গলায় বলল সাইমন।

কয়েক মিনিট পর গলিটার মুখে পৌঁছে প্রথমে ডানে, তারপর বামে একবার করে তাকাল মলি। আলো খুব কম, নির্জন পড়ে আছে রাস্তাটা। দ্রুত এগোল ও, হাইহিলের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

দু'মিনিট আগে বেরিয়েছে সাইমন, মোড়ে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছে মলির জন্যে।

বাদামী রঙের লাউঞ্জ সুট পরা এক তরুণ অন্ধকার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখল কোত্থেকে বেরুল মলি। তার কাঁধ দুটো যেমন চওড়া তেমনি শক্তিশালী, মাথায় চওড়া কারনিস সহ হ্যাট পরেছে। মলির দিকে তাকিয়ে ধীর, নিয়মিত একটা ছন্দে বিরতিহীন চুইংগাম চিবাচ্ছে সে। দৃষ্টিপথ থেকে মলি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ গাঢ় ছায়ার ভিতর অপেক্ষা করল লোকটা, তারপর দোরগোড়া ছেড়ে হাঁটা ধরল নদীর দিকে—পুরু ঠোঁট জোড়া থেকে মৃদু শিস বেরুচ্ছে।

আট

পরদিনই রানা এজেন্সির সানসিটি শাখার মালিকানা পেয়ে গেল স্লিপার এজেন্ট জিসান হাওয়ার্ড। পুলিশ কমিশনারের দপ্তর থেকে অফিস খোলার অনুমতি পেতেও ওর কোনও অসুবিধে হয়নি।

খুব লম্বা কাঠামো জিসানের, শরীরে প্রচণ্ড শক্তি, অথচ গায়ে মাংস খুঁজে পাওয়া ভার। ওর চেহারাটাই এমন যে লোকে দেখে ভুল বোঝে, ভাবে এর দ্বারা কারও কোনও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই, নিতান্তই বোকাসোকা একজন মানুষ।

পরিচ্ছেদেরও বেহাল অবস্থা, যেন গত পাঁচ-সাতদিন হলো এগুলো পরেই রাতে ঘুমাচ্ছে। মাথায় একটা হ্যাট আছে বটে, তবে সেটা খুলির পিছনে ঝুলে থাকে সারাক্ষণ। চুলের অবস্থাও সুবিধের নয়, যথেচ্ছ বাড়তে দেওয়া হয়েছে, অথচ কোনও রকম যত্ন নেওয়া হয় না।

রানা এজেন্সির স্লিপার এজেন্ট হওয়ার জন্য তিন বছরের একটা কোর্স কমপ্লিট করতে হয়েছে জিসানকে। সংশ্লিষ্ট মহলের লোকজন জানে, এই কোর্স কমপ্লিট করা থাকলে এভারেস্ট জয় থেকে শুরু করে সাগরের অতলে ডুব দেওয়া, মহাশূন্যে ভ্রমণ ইত্যাকার যাবতীয় কঠিন কাজ তার পক্ষে সম্ভব।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য আড়াইশো ছেলেকে ডাকা হয়েছিল, ওদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন দেশের এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সির মাধ্যমে। প্রাথমিক বাছাই পর্বে টিকেছিল বিশজন। তাদের মধ্যে এ-প্লাস রেজাল্ট করে মাত্র পাঁচজন। ফাইনাল পরীক্ষায় ওদের মধ্যে প্রথম হয়েছে জিসান। সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রমাণের পরীক্ষায়। চিফ ট্রেনার মাসুদ রানার জন্য প্রয়োজনে প্রাণ হারাতেও কুণ্ঠিত হবে না।

ব্রিফ করবার সময় জিসানকে শুধু সানসিটি শাখা খোলবার নির্দেশ দেয়নি রানা, আরও একটা দায়িত্ব চাপিয়েছে ওর কাঁধে। সেটা হলো, টিসার উপরও একটা চোখ রাখতে হবে ওকে। কারণ জানতে চাওয়ায় রানা যুক্তি দেখিয়েছে, নাহিদ ও নোরাকে যারা খুন করেছে তাদের তালিকায় টিসাও থাকতে পারে।

জিসানের কেন যেন মনে হয়েছে, এটাই একমাত্র কারণ নয়। এরচেয়ে বড় কোনও কারণও বোধহয় আছে, কিন্তু কী ভেবে কে জানে মাসুদ ভাই ওকে সেটা জানাননি।

অফিসে ঢুকে কাজ চালাবার জন্য যতটুকু দরকার পরিষ্কার আর গোছগাছ একাই করে নিয়েছে জিসান। এই মুহূর্তে ঘুরেফিরে দেখছে সব। ওর ওপর নির্দেশ আছে, ভাল করে একবার তল্লাশি চালাতে হবে। পুলিশ কিংবা রানা এজেন্সির ক্যাটস্‌আই শাখার এজেন্টদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দু'একটা ক্লু থেকেও যেতে পারে।

কাজটা শুরু করবার পর ইতিমধ্যে দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ফাইলিং কেবিনেট, দেরাজ, কাবার্ড ইত্যাদি কিছুই বাদ দিচ্ছে না।

খুব মনোযোগ দিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে জিসান। জিনিসটা দেখতে পাওয়ার সেটাই কারণ।

ফায়ারপ্লেসটা সবার শেষে দেখছে। চিমনিতে ছোট্ট একটা জিনিস আটকে রয়েছে দেখতে পেয়ে ভ্রূ কোঁচকাল। পকেট থেকে পেন্সিলের মত সরু টর্চ বের করে ওটার উপর আলো ফেলল। চিনতে পারল সহজেই, অতি ক্ষুদ্র, অথচ অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা মাইক্রোফোন। ওটার সঙ্গে জোড়া লাগানো তারটা চিমনির ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আউটার অফিসে ঢুকেছে।

আউটার অফিসে বেরিয়ে এসে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তারটা আবার দেখতে পেল, ফ্লোরবোর্ড-এর মাঝখানে যত্ন করে লুকানো, তারটার সঙ্গে ওখানে আরেকটা মাইক্রোফোন রয়েছে। আরও দুটো কামরায় ঢুকেছে ওই তার, প্রতিটি কামরায় একটা করে মাইক্রোফোন, তারপর দরজা হয়ে বেরিয়ে গেছে বাইরের প্যাসেজে।

বাথরুমে ঢুকে হাত থেকে ধুলো, ঝুল ধুয়ে ফেলল জিসান। মনটা খুশি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে মৃদু হুইসেল দিচ্ছে। ভাবল, শুরুটা দেখা যাচ্ছে ভালই। রানা এজেন্সির সানসিটি শাখায় কে কী কথা বলছে সব বাইরে কোথাও বসে শুনেছে কেউ। বাইরে মানে, সম্ভবত এই বিল্ডিঙেরই অন্য কোনও অফিস।

যে চেহারা হয়েছে, পরিষ্কার বোঝা যায় বেশ কিছুদিন আগে ফিট করা হয়েছে মাইক্রোফোনগুলো। কোনও সন্দেহ নেই যে অফিসের কারও সাহায্য ছাড়া ওগুলো ফিট করা সম্ভব নয়।

কে জানে, এখনও ওগুলো জ্যান্ত কি না। ওর সুবিধে মত সময়ে, সব অফিস যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তারটা কোথায় গেছে দেখতে হবে।

মাসুদ ভাই ওকে জানিয়েছেন, বিল্ডিঙের কেয়ারটেকার জন নিকেলকে মানুষ হিসাবে খারাপ বলে মনে হয় না, সাহায্য চাইলে পাওয়া যেতে পারে। সন্ধের পর থেকে এলিভেটর অপারেটর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করে লোকটা। এখন বরং

নীচে নেমে ওর সঙ্গে পরিচয়টা সেরে নেওয়া যাক।

অফিসে তালা লাগিয়ে এলিভেটরে চড়ে সরাসরি বেযমেন্টে নেমে এল জিসান।

জন নিকেলকে বয়লার রুমে পেল, নরম একটুকরো কাঠ দিয়ে একটা মডেল বোট তৈরি করছে, হাতে কুৎসিতদর্শন একটা পকেট-নাইফ।

লম্বা-চওড়া, মোটাসোটা মানুষ নিকেল; ওর নাকের নীচে ভারী গোঁফ জোড়াকে সামুদ্রিক আগাছার মত লাগল জিসানের। বুলেট আকৃতির মাথায় ধুলোমাখা ক্যাপ। যে ওয়েস্টকোটটা পরে আছে তাতে খাবারের দাগ দেখল জিসান; ওটায় বোতাম নেই, তার বদলে হাতঘড়ির সোনালি চেইন দিয়ে আটকানো।

সামান্য কৌতূহল নিয়ে জিসানকে দেখল নিকেল, তারপর ছোট্ট করে একবার মাথা ঝাঁকাল। 'মর্নিং,' বলল ও। 'বলুন কী করতে পারি।'

একটা চেয়ার তুলে ওর কাছাকাছি নিয়ে এল জিসান, তারপর নিজের দীর্ঘ কাঠামো সেটার উপর ভাঁজ করল। 'আমার আলসার আছে। রোজ দুপুরে ওটাকে আমি হুইস্কি ঢেলে ডুবিয়ে দিই। মুশকিল হলো, একা আমি খেতে পারি না। ভাবলাম কেয়ারটেকার সাহেব আমাকে সঙ্গ দিতে পারেন কি না। আপনি যদি এত সকালে খেতে পছন্দ না করেন, যাই, অন্য কাউকে খুঁজে বের করি।'

বোট রেখে দিয়ে হাসল নিকেল। 'একেবারে ঠিক লোকের কাছে এসে পড়েছেন। কিন্তু হুইস্কি আলসারের উপকার করে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

পকেট থেকে জনি ওয়াকার-এর ছোট একটা বোতল বের করে হাসল জিসান। 'সেটা আসলে আলসারই ভাল বলতে পারবে। গ্লাস আছে? দুটো হলে ভাল।'

শেলফ থেকে একজোড়া পেপার কাপ নামাল নিকেল। হুইস্কির গন্ধ শুঁকে বলল, 'দামি জিনিস মনে হচ্ছে, স্যর। পান করছি আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্যে।' চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল, শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছছে। 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছি কে জানে, এমন দিল-দরিয়া মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো!'

নিজের কাপে চুমুক দিল কি দিল না, নিকেলের কাপটা আবার ভরে দিল জিসান। 'আমি জিসান হাওয়ার্ড। রানা এজেন্সির সানসিটি শাখা কিনে নিয়েছি।'

বিস্মিত দেখাল নিকেলকে। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি জন নিকেল। আপনি দেখা যাচ্ছে তুখোড় মানুষ, স্যর, এত জলদি ম্যানেজ করে ফেললেন!'

'কে জানে ভুলই করলাম কি না,' বলল জিসান। 'এখন পর্যন্ত কারও ছায়াও তো দেখলাম না।'

'আগের কর্তা আত্মহত্যা করায় লোকজন ভয় পেয়েছে,' বলল নিকেল। 'কটা দিন যাক, দেখবেন প্রচুর ক্লায়েন্ট পাচ্ছেন।'

দুটো সিগারেট বের করে নিকেলকে একটা দিল জিসান। 'সত্যি বলছেন, পাব?'

'ওরা তো রোজই ত্রিশ-বত্রিশজন পাচ্ছিল, আপনি কেন পাবেন না,' বলে তৃতীয় কাপে চুমুক দিল কেয়ারটেকার, এরইমধ্যে লালচে হয়ে উঠেছে চোখ

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

দুটো। ঘাড়ের উপর মাথাটা সামান্য নড়বড় করছে।

'তা হলে দেখা যাচ্ছে ভাল ব্যবসাতেই পুঁজি লাগিয়েছি,' বলল জিসান। 'তা কেমন লোক ওঁরা, ওই ত্রিশ-বত্রিশজন যাঁরা আসতেন?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। কেউ কেউ প্রতি হপ্তায় আসতেন। দু'চারজন ছাড়া প্রত্যেককে টাকার কুমির মনে হয়েছে আমার।'

'আগের কর্তা যখন আত্মহত্যা করলেন, আপনি বিল্ডিঙে ছিলেন?' জানতে চাইল জিসান, সামনের দিকে ঝুঁকে নিকেলের পেপার কাপটা আবার ভরে দিচ্ছে।

'ছিলাম,' বলল কেয়ারটেকার। 'একটু রয়ে-সয়ে ঢালুন, বস্। আপনার হুইস্কি খুব কড়া মাল মনে হচ্ছে।'

'আরে, কী বলেন!' হেসে উঠল জিসান। 'এমন প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে এটুকু স্কচ খেতে পারবেন না, এ আমি বিশ্বাস করি না। শুনলাম ন'টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে মারা গেছেন ভদ্রলোক। ওই সময়ের আগে-পরে কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

'তিনজন সাততলা পর্যন্ত ওঠেন, তবে বলতে পারব না ওঁরা কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কেন?'

'আমার স্বভাবই প্রশ্ন করা,' বলল জিসান, হাসছে। 'পেশাটাই বোধহয় দায়ী। কারা ওঁরা, এই তিনজন?'

'দুজন পুরুষ, একটা মেয়ে,' বলল নিকেল। 'আমি নিজে ওঁদেরকে সাততলায় পৌঁছে দিয়েছি। মেয়েটাকে আগে দেখেছি, তবে লোক দুটোকে এই প্রথম।'

'সাততলায় আর কীসের অফিস?'

'একটা নিউজ এজেন্সি, তারপর আপনার অফিস, তারপর মিস ফ্লোরার অফিস।'

'কী করেন মিস ফ্লোরা?'

'ওঁকে সবাই সিলুয়েট্ আর্টিস্ট বলেন,' বলল নিকেল। 'পেপার কেটে আপনার কাঠামো বানালেন, তারপর সেটাকে খাড়া করে ফ্রেমে আটকে দিলেন। দয়া করে জানতে চাইবেন না ওখানে তিনি আর কী করেন, তবে জানি ওঁর কাছে শুধু পুরুষ মক্কেলরাই আসেন।'

জিসানের চোখে আগ্রহ ফুটছে। 'আচ্ছা? তা-ও আবার আমার পাশের দরজায়, অ্যাঁ? বেশ, বেশ। সময় করে একদিন যাওয়া যাবে, আমার কাঠামোটা যদি দেখতে রাজি হন।'

'খুবই সুন্দর তিনি,' ফিসফিস করল নিকেল।

'পুরুষ দুজন সম্পর্কে বলুন,' জানতে চাইল জিসান। 'নিউজ এজেন্সিতে, মিস্টার নাহিদের কাছে, কিংবা মিস ফ্লোরার কাছে এসে থাকতে পারেন ওঁরা, তাই তো?'

'এটা জানি যে মেয়েটা রানা এজেন্সিতেই এসেছিলেন, কারণ ওঁকে আমি আগেও দু'একবার আসতে দেখেছি,' বলল কেয়ারটেকার।

'কেমন দেখতে তিনি?' জানতে চাইল জিসান।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল নিকেল। 'আপনি অনেক কথা জানতে চাইছেন, স্যর। প্রথমদিন এসেই এত কেন আগ্রহ দেখাচ্ছেন?'

'প্রশ্ন যা করার আমি করি, কেমন? স্কচ তো পেয়েছেনই, বিনিময়ে একটু না হয় সার্ভিস দেয়ার চেষ্টা করলেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেয়ারটেকার। 'বেশ। এমন তো নয় যে আপনি আমার নার্কের চামড়া তুলে নিচ্ছেন। মাথায় একরাশ কালো চুল মেয়েটার। কোন্ দেশী বলতে পারব না—ভারতীয় হতে পারেন। কালো চুল। ভারি সুন্দর ফিগার, দেখতেও খুব ভাল—সিনেমার নায়িকা হতে পারবেন।'

'বাহ্, দারুণ বর্ণনা! কিন্তু এ-সবে কোনও কাজ হবে না,' বলল জিসান। 'এরকম মেয়ে হাজার হাজার পাওয়া যাবে। বলতে হবে কী পরেছিলেন। চেহারায় এমন কিছু আছে যা দেখামাত্র ওঁকে চেনা যাবে?'

মাথা চুলকাল কেয়ারটেকার, স্মরণে আনার চেষ্টা করছে। 'কাপড়চোপড়ে খুব স্মার্ট একটা মেয়ে। একটু হয়তো নার্ভাস। কী পরেছিল? কালো কোট, কালো স্কার্ট, কালো জুতো, কালো মোজা, কালো দস্তানা—শুধু হ্যাটটা ছিল সাদা। ও, মনে পড়েছে—ব্রেসলেট ছিল হাতে, ওটা থেকে সোনার চেইন ঝুলছিল, তাতে আবার ঝলমলে পাথর বসানো।'

খুশি মনে মাথা ঝাঁকাল জিসান। 'এই তো, ভাল সার্ভিস পাচ্ছি। ওরকম আরও এক বোতল হুইস্কি পাওনা হয়েছে আপনার। এবার পুরুষ দুজনের কথা বলুন।'

'একজনের বয়স সতের কি আঠারো, বোধহয় নিউজ এজেন্সিতে ঢুকেছে,' বলল কেয়ারটেকার। 'কাপড়চোপড় নোংরা, বগলে কাগজের একটা বাণ্ডিল ছিল। তবে দ্বিতীয় তরুণ মালদার মক্কেল।'

'কী করে বুঝলেন?' জিজ্ঞেস করল জিসান। 'বয়স কত?'

'ছাব্বিশ কি সাতাশ, তার বেশি নয়। মাথায় চকলেট রঙের হ্যাট, গায়েও খুব দামি বাদামী সুট। কোটের পকেট থেকে সিল্কের রুমাল উঁকি দিচ্ছিল। চুইংগাম চিবাচ্ছিল...হ্যাঁ, একটু বেমানান, ওটা মুখে দিয়ে লোকটা যেন নিজের মূল্য আর গুরুত্ব কমিয়ে ফেলেছে।'

'কে কখন এল বলতে হবে। কার পর কে?' প্রশ্ন করল জিসান।

'প্রথমে কালো কোট, তারপর কাগজের বাণ্ডিল, তারপর চুইংগাম,' জবাব দিল কেয়ারটেকার।

'মেয়েটা কখন আসে?'

'ন'টা বাজার কয়েক মিনিট পর,' বলল নিকেল। 'কী জানি, সাড়ে ন'টায়ও হতে পারে।'

'বাকি দুজন?'

এলিভেটর নিয়ে নীচে নেমে দেখি কাগজের বাণ্ডিল অপেক্ষা করছে,' বলল কেয়ারটেকার। 'আরও পাঁচ-দশ মিনিট পর আসে বাদামী কোট।'

'ওদের কাউকে আপনি চলে যেতে দেখেছেন?'

মাথা নাড়ল কেয়ারটেকার। 'আমি শুধু তুলে দিই, নামাই না,' বলে হেসে উঠল। ভালই নেশা হয়েছে ওর।

'তুলেই বা দেন কেন, অটোমেটিক এলিভেটর কাজ করছে না?' জানতে চাইল জিসান।

'রোজ সন্ধে সাতটায় লক করে দিই ওটা। আমি জানতে চাই ওই সময়ের পর বিল্ডিঙে কে এল।'

চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো দীর্ঘ কাঠামো, কেয়ারটেকারের হাতে বিশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিল। 'দেখি মিস ফ্লোরাকে পাই কি না, গল্প করা যাবে,' বলে বেযমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে এলিভেটরের দিকে এগোল জিসান।

নয়

এলিভেটর থেকে সাততলার লবিতে নামছে, দামী কাপড়চোপড় পরা অথচ বিধ্বস্ত চেহারার ছোটখাট এক ভদ্রলোককে দেখতে পেল জিসান—রানা এজেন্সির দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেয়ালে আটকানো বাক্সের ফাটলে একটা এনভেলাপ ঢোকাচ্ছেন।

ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলেন ভদ্রলোক, হাতের এনভেলাপটা বাক্সে না ঢুকিয়ে চট করে নিজের পিছনে লুকিয়ে ফেললেন। জিসান আন্দাজ করল, ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কম নয়। 'গুড মর্নিং,' বলল ও। 'আমাকে আপনার দরকার?'

আরেকবার চমকে উঠে এক পা পিছু হটলেন ভদ্রলোক, হাতের এনভেলাপটা তাড়াতাড়ি কোটের পকেটে ভরলেন। 'না, ধন্যবাদ। আমি কারও কাছে আসিনি...এসেছি...অন্য একটা কাজে। তবে ভাবছিলাম অফিসটা আজ বন্ধ কেন।'

'অফিস বন্ধ নয়, আপনি বসতে পারেন,' বলল জিসান, দরজার কী হোলে চাবি ঢোকাল। 'মিস্টার নাহিদের দায়-দায়িত্ব এখন থেকে আমিই পালন করব।'

'না, আমি বসতে আসিনি,' বললেন ভদ্রলোক। 'একটা কাজে এসেছিলাম, তবে সেটা পরে এসে করব,' বলে ঝট করে জিসানের দিকে পিছন ফিরলেন, হন হন করে সিঁড়ির দিকে হাঁটছেন।

ওঁকে ধরার জন্য পিছু নিতে যাবে জিসান, এই সময় মনে পড়ল অফিসে মাইক্রোফোন আছে। না, ওখানে বসে কথা বলা যাবে না। দ্রুত ঘুরে এলিভেটরের দিকে এগোল ও।

ভদ্রলোকের চেয়ে আগে নীচে নেমে রাস্তা পেরুল জিসান, তারপর রোদে দাঁড়িয়ে বিল্ডিংটার গেটে চোখ রাখল। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক, কোনও দিকে না তাকিয়ে ডাইনে হাঁটা ধরলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা কাফে দেখতে পেয়ে হঠাৎ থামলেন, এক মুহূর্ত ইতস্তত করবার পর ভিতরে ঢুকলেন তিনি।

রাস্তা পেরিয়ে ওই কাফের সামনে দিয়ে হাঁটছে জিসান, ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরটা দেখে নিল। তিন কি চারজন খদ্দের রয়েছে। একেবারে পিছনদিকের একটা টেবিলে একা বসেছেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করবার পর সুইং ডোর ঠেলে জিসানও ঢুকল ওখানে। মুখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ, তবে জিসানকে চিনতে পারলেন না। কফি ভর্তি কাপে চামচ নাড়ছেন, চোখে উদ্বেগ, ভ্রূ জোড়া কুঁচকে আছে।

ভিতরে ঢুকেই সতর্ক চোখে চারপাশটা দেখে নিল জিসান। দরজার কাছে ফেলা একটা টেবিলে বসে এক খদ্দের ক্যালকুলেটরে হিসাব কষছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছাকাছি একটা টেবিলে বসে পেপার পড়ছে আরেক লোক, অন্য কোনওদিকে খেয়াল নেই তার। কাফের মাঝামাঝি জায়গায় বসেছে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, কফির কথা ভুলে পরস্পরের হাত ধরে স্থির হয়ে বসে আছে ওরা।

সোজা এগিয়ে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের টেবিলেই বসল জিসান। মুখ তুলে আবার ওকে দেখলেন তিনি, এবার আর চোখ সরাচ্ছেন না। ওকে চিনতে পেরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। চেয়ার ছেড়ে উঠলেন খানিকটা, পরমুহূর্তে ধপাস করে বসে পড়লেন আবার। টেবিলটা ঝাঁকি খাওয়ায় কাপ থেকে খানিকটা কফি ছলকাল।

'আমি আপনার শত্রু নই, বন্ধু, কাজেই ভয় পাবেন না,' ওঁকে বলল জিসান, তারপর তরুণী ওয়েট্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কফি চাইল। 'দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, তাতে আপনার উপকার বই অপকার হবে না। ওই বাক্সটায় আপনি যে এনভেলাপটা ফেলতে যাচ্ছিলেন, তাতে টাকা আছে, তাই না?'

'দেখুন, আমার পিছু নেয়ার কোনও অধিকার আপনার নেই,' রাগের সঙ্গে বললেন ভদ্রলোক। 'মিস্টার নাহিদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার আছে। আমি চাই না আমাদের ব্যাপারে কেউ নাক গলাক।'

'স্বীকার করছি, নেই,' বলল জিসান। 'কিন্তু আপনাকে জানানো দরকার যে ব্যবসাটা আমার হাতে চলে এসেছে। মিস্টার নাহিদ এখন আর আমাদের সঙ্গে নেই।'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ। 'কিন্তু আপনাকে আমি চিনি না। আপনি যান, আপনার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই।'

'বারবার বলছি না, ওই ব্যবসার দায়-দায়িত্ব সব এখন আমার?' একটু কর্কশ সুরে বলল জিসান।

'তার মানে কি টাকাটা এখন থেকে আপনি নেবেন?'

মাথা নাড়ল জিসান। 'সব কথা খুলে বলুন আমাকে। কেউ আপনার কাছ থেকে কোনও টাকা নেবে না। বরং এতদিন যে টাকা দিয়েছেন, সব ফেরত পাবেন আপনি।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলেন ভদ্রলোক, তারপর জানতে চাইলেন, 'মিস্টার নাহিদ কোথায়?'

'আপনি খবরের কাগজ পড়েন না? টিভিও দেখেন না?' জিজ্ঞেস করল

জিসান। 'নাহিদ খুন হয়েছেন।'

শিউরে উঠলেন ভদ্রলোক। কাঁপা কাঁপা হাতে এনভেলাপটা বের করে জিসানের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন; বললেন, 'এই নিন, এতে পনেরো হাজার ডলার আছে। আমি কোনও ঝামেলায় জড়াতে চাই না, শুধু বলে দিন কিস্তির টাকা প্রতি মাসে কোথায় পৌঁছে দিতে হবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ছেন।

'বসুন!' ধমক দিল জিসান। 'শান্ত হন!' ভদ্রলোক বসতে টেবিল থেকে এনভেলাপটা তুলে নিয়ে এক লাইনের একটা লেখার উপর চোখ বুলাল ও।

মার্টিন ক্রো—১৫০০০

'আপনিই মার্টিন ক্রো?' জিজ্ঞেস করল জিসান।

মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক।

এনভেলাপ ছিঁড়ে টাকাটা বের করল জিসান। 'কী কারণে এই দান? কে নিচ্ছিল? সব কথা খুলে বলুন আমাকে। কীভাবে পড়লেন এই ফাঁদে?' টেবিলে নিজের ভিজিটিং কার্ডটা রাখল, তাতে বলা হয়েছে—ও একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। 'আবার বলছি, আমি আপনার উপকার করতে চাই।'

ঘামে চকচক করছে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখ। 'মিস্টার নাহিদ আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল। আজ এগারো মাস ওকে আমি পনেরো হাজার করে দিয়ে আসছি।'

'ব্ল্যাকমেইল করার কারণটা?' টাকার বাণ্ডিলটা ভদ্রলোকের দিকে ঠেলে দিল জিসান। 'এটা পকেটে ভরুন, প্লিজ।'

'বহু বছর আগে খুব খারাপ একটা কাজ করেছিলাম, মিস্টার নাহিদ চিঠি লিখে আমাকে ভয় দেখায়—মাসে মাসে টাকা না দিলে কথাটা আমার স্ত্রীকে বলে দেবে।' টাকাটা নিয়ে পকেটে ভরলেন ক্রো।

'কমপিউটারে কম্পোজ করা, প্রিন্টারে ছাপা চিঠি?' জিজ্ঞেস করল জিসান। 'শুধু সইটা মিস্টার নাহিদের?'

'হ্যাঁ,' বললেন মার্টিন ক্রো।

জিসানের বলতে ইচ্ছে করল—মিস্টার নাহিদ নন, ওঁর নামে অন্য কেউ আপনাকে ব্যাকমেইলিং করছিল। কিন্তু তারপরেই ভাবল, বিপদ কাটেনি বুঝতে পেরে আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন ভদ্রলোক। মাসুদ ভাই ওকে বলে দিয়েছেন, এইসব ভুক্তভোগীদের টাকা শুধু ফেরত দিলে হবে না, ওদেরকে আশ্বস্তও করতে হবে।

'আপনার মত আরও অনেক মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল। ওদের কাউকে চেনেন আপনি?'

'একটা মেয়ে...কাকা বিরাট সম্পত্তি দিয়ে গেছেন...আমাদের রোডে থাকে,' কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করে বললেন বৃদ্ধ ক্রো। 'বেশি বয়স নয়, প্রচুর মদ-গাঁজা খায়। ওকে আমি একদিন মিস্টার নাহিদের অফিস থেকে বেরুতে দেখেছি।'

'নাম-ঠিকানা বলুন।'

'আমি কিন্তু চাই না ওই মেয়ের কোনও ক্ষতি হোক। ওর বাবা আমার বন্ধু ছিলেন...আপন বলতে কেউ তো নেই, তাই মেয়েটা অসৎ লোকজনের পাল্লায়

পড়ে...'

'ওর কোনও ক্ষতি করব না। ব্যাপারটা চেক করে দেখব শুধু। আপনার মত ওকেও তো টাকা ফেরত দিতে হবে।'

'কিন্তু এটা আমার মাথায় ঢুকছে না!' অবিশ্বাসে মাথা নাড়লেন ক্রো। 'আপনারা কী কারণে টাকা ফেরত দিতে চাইছেন?'

'এর উত্তর পানির মত সোজা,' বলল জিসান। 'গুডউইলের স্বার্থে। রানা এজেন্সি শুধু আকারেই বিশাল প্রতিষ্ঠান নয়, ওদের নীতিও অনেক মহৎ।'

'কী জানি...রূপকথা শুনছি বলে মনে হচ্ছে...'

'ওই মেয়ের নাম-ঠিকানা, প্লিজ,' আবার বলল জিসান, পকেট থেকে পেন্সিল আর নোটবুক বের করল।

'ওর নাম মেরি টোপাজ। ঠিকানা—টোয়েনটিওয়ান/বি, সাউথ স্ট্রিট।'

'এবার বলুন, এই ব্যাপারটা নিয়ে রানা এজেন্সির কারও সঙ্গেই কি আপনার আলাপ হয়নি?'

মাথা নাড়লেন ক্রো। 'চিঠিতে কড়া ভাষায় নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল, কারও সঙ্গে আলাপ করলে প্রাণটা খোয়াতে হবে।'

'চিঠিটা এল কীভাবে? ডাকে?'

'না, এক লোক আমার দোকানে দিয়ে গেছে। বাড়ির সঙ্গেই আমার গ্রোসারির দোকান।'

'চেহারার বর্ণনা দিন।'

'বিরাট দেহ। বাম চোখে কালো পট্টি। মুখের ডানদিকে লম্বা, শুকনো ক্ষতচিহ্ন। চিঠিটা দেয়ার সময় বলে মুখেও বলে গেছে, নিয়মিত টাকা না পেলে আমার বংশের কাউকে তারা বাঁচিয়ে রাখবে না।'

'আপনার ঠিকানা দিন, পরে আমি যোগাযোগ করব,' বলল জিসান, ঠিকানাটা খসখস করে লিখে নিল। 'ধন্যবাদ, মিস্টার ক্রো। ভয় পাবার কোনও কারণ নেই, আমরা এমন ব্যবস্থা করছি আপনাদের কেউ যেন আর বিরক্ত না করে।'

'কিন্তু যদি ওই লোকটা আবার আসে?' জিজ্ঞেস করলেন ক্রো। 'চাইলে তাকে আমি টাকা দেব না?'

'না,' বলল জিসান। 'বসিয়ে রেখে খবর দেবেন আমাকে, তারপর যা করার আমরা করব। এটা আমি প্রমিজ করলাম।'

বৃদ্ধ ক্রো ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। 'আপনি জানেন না কী অবস্থার মধ্যে পড়েছি আমি। কিস্তির টাকা দেয়ার জন্যে স্ত্রীকে গোপন করে বাড়িটা ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছি...'

'সব তো আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে, কাজেই মনটাকে শান্ত করে বাড়ি ফিরে যান,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল জিসান, তারপর চেয়ার ছাড়ল।

কাউন্টারে বিল মিটিয়ে ফুটপাথে বেরিয়ে এল ও, ওর পিছু নিয়ে ক্রোও বেরুলেন।

বৃদ্ধ ক্রোর কাছাকাছি টেবিলে বাদামী কোট পরা যে লোকটা বসেছিল, এতক্ষণে

মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। বিরতিহীন চুইংগাম চিবানোয় চোয়াল দুটো বিশেষ একটা ছন্দে দ্রুত উঁচু-নিচু হচ্ছে। মার্টিন ক্রোর পিছু নিল তার দৃষ্টি।

কাগজটা রেখে দিয়ে কাউন্টারে চলে এল তরুণ, বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ফুটপাথে। ওখানে দাঁড়িয়ে প্রথমে ক্রো, তারপর জিসানকে দেখল—ওরা দুজন এখন পাশাপাশি হাঁটছে।

ওদের দিকে একটা চোখ রেখে রাস্তা পেরুল লোকটা, তারপর ফুটপাথ ঘেঁষে পার্ক করা চকচকে কালো একটা মার্সিডিজের দিকে এগোল।

কালো স্কার্ফে মুখ-মাথা ঢাকা এক মেয়ে, বিষণ্ণমূর্তি, বসে আছে ড্রাইভিং সিটের পাশে। গাড়িতে চড়ে স্টার্ট দিল তরুণ, অপেক্ষা করছে।

'এত দেরি করলে যে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, উচ্চারণে ক্ষীণ হলেও স্প্যানিশ টান আছে।

'দুঃখিত, সেনিওরা,' ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে বলল বাদামী কোট পরা তরুণ। 'আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে, প্লিজ, আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

'কী কাজ তাই তো বলছ না,' অভিযোগের সুরে বলল সঙ্গিনী। 'আমাকে বসিয়ে রেখে ওই কাফেতে গিয়ে বসেছিলে কেন?'

'কী কাজ?' বলল তরুণ। 'একটু পরেই দেখতে পাবে কী কাজ। এখন আমাকে বিরক্ত করো না, ডার্লিং।'

উইণ্ডস্ক্রিনের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে, চৌরাস্তায় পৌঁছে এক মুহূর্তের জন্য থামল মার্টিন ক্রো আর জিসান, পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাল, তারপর দুজন দু'দিকে হাঁটা ধরল।

হ্যাটটা চোখের কাছে নামিয়ে এনে গাড়ি ছেড়ে দিল লোকটা, বাঁক ঘুরে বৃদ্ধ ক্রোর পিছু নিল।

কালো মার্সিডিজের রিশ-পঁচিশ গজ পিছনে আরও একটা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে, এটাও কালো, বড়সড় একটা ক্যাডিলাক, গায়ে রেন্ট-আ-কার কোম্পানির নাম লেখা। এবার ওটাও স্টার্ট নিল, বাঁক নিয়ে মার্সিডিজের পিছু পিছু যাচ্ছে।

হালকা পায়ে ধীরে ধীরে হাঁটছেন ক্রো। স্বস্তি বোধ করছেন তিনি, আবার ভয়ও পাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে!

বাদামী সুট পরা লোকটা ফুটপাথ ঘেঁষে মার্সিডিজ চালাচ্ছে, তার হলুদাভ চোখের দৃষ্টি দূরের পথিক মার্টিন ক্রোর পিঠে বিঁধে আছে, চোয়াল দুটো সারাক্ষণ নড়ছে। শান্ত, মন্থর বেগে গাড়ি চালাচ্ছে সে, দ্রুতগামী যানবাহনের পথ থেকে সরে আছে একপাশে।

খানিক পরপর জানালা দিয়ে দু'পাশের দোকান-পাটের সাইনবোর্ডে চোখ বুলাচ্ছে বাদামী কোট, মানুষ যাতে এরকম ধীরগতিতে গাড়ি চালাবার ব্যাখ্যাটা পেয়ে যায়—নির্দিষ্ট একটা ঠিকানা খুঁজছে লোকটা।

রাস্তার শেষ মাথায় একটা গলি, খুব একটা চওড়া নয়, আবার সরুও নয়—তবে প্রতিবার মাত্র একটা গাড়ি চলতে পারবে। গলিটা নির্জন; দু'পাশে লম্বা, উঁচু স্টোরহাউস থাকায় দিনের বেলাতেই গাঢ় ছায়ায় ঢাকা, প্রায় অন্ধকার।

খুব কম লোকই ব্যবহার করে, মার্টিন ক্রোও সাধারণত করেন না, তবে আজ খুব ক্লান্ত লাগায় শর্টকাট হিসাবে গলিটায় ঢুকে পড়লেন।

রাস্তা পেরিয়ে ক্রো গলিটায় ঢুকতে যাচ্ছেন, বুঝতে পেরে মার্সিডিজের স্পিড একটু বাড়াল খুনি লোকটা। গলির ভেতর ঢুকে হাঁটছেন ক্রো, গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ঝট করে পিছন দিকে ঘাড় ফেরালেন। দেখলেন প্রকাণ্ড মার্সিডিজটা গলির ভিতর ঢুকছে।

এই গলিতে কোনও প্রাইভেট কার ঢোকে না। দু'পাশে এত কম জায়গা, একফুট করেও হবে কি না সন্দেহ। মার্টিন ক্রোর বুঝতে অসুবিধে হলো না, ওঁর পিছু নিয়েই ঢুকছে গাড়িটা। ভয়ে অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা হলো, কয়েক মুহূর্তের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন তিনি, একচুল নড়তে পারছেন না।

গলির মাঝখানে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন ক্রো, ইতস্তত করছেন, ডানে বাঁয়ে তাকাচ্ছেন। সামনে, প্রায় দুশ' ফুট দূরে, খিলান মত কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে—বোধহয় একটা দোরগোড়া। খিলানটা গাড়ির জন্য অপ্রশস্ত হলেও, ওঁর জন্য স্বর্গ!

ওই খিলান লক্ষ্য করে ছুটলেন ক্রো।

স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে ওঁর পিছু নিল মার্সিডিজ। ড্রাইভিং সিটে বসা খুনি হাসছে, চুইংগাম চিবাচ্ছে। খেয়াল নেই তার পিছু নিয়ে কালো একটা ক্যাডিলাক ঢুকছে গলির ভিতর।

খিলানের দিকে ছোটার সময় মার্টিন ক্রোর নীল ওভারকোট দু'পাশে পতপত করছে, হাঁপিয়ে যাওয়ায় ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ বেরুচ্ছে নাক-মুখ দিয়ে।

গ্যাস পেডালে চাপ দিয়ে মার্সিডিজের স্পিড আরও একটু বাড়াল খুনি। হাসছে সে, ভাবছে—আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তার গাড়ির নীচে পড়ে মারা যাবে ওই বুড়ো, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে ওকে রক্ষা করতে পারে। তার পাশে বসা তরুণীর চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকালেন ক্রো, প্রাণভয়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। ফুঁপিয়ে উঠলেন, পরিষ্কার বুঝতে পারছেন শেষ পঞ্চাশ ফুট পেরুতে পারবেন না, তার আগেই গাড়ির নীচে চাপা পড়বেন।

ক্রোর সারা শরীর অবশ হয়ে এল। হাল ছেড়ে দিলেন তিনি, দাঁড়িয়ে পড়লেন, দু'কোমরে হাত রেখে হাঁপাচ্ছেন।

খুনির হাসি চওড়া হলো। শিকারের উপর দিয়ে মার্সিডিজ ছুটবে, নিজের শরীরটাকে শক্ত করল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঠাস করে একটা আওয়াজ, সেই সঙ্গে মাকড়সার জাল হয়ে গেল মার্সিডিজের পিছনের কাঁচ।

চমকে উঠে রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল খুনি। পিছনে একটা ক্যাডিলাক দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল সে।

আরেকটা গুলি করল রানা, এবার সরাসরি মার্সিডিজের চাকা লক্ষ্য করে।

ফুটো হয়ে যাওয়ায় বিকট শব্দে বাতাস বেরুচ্ছে ওটা থেকে।

গুলির আওয়াজ শুনে চমকে উঠলেন বৃদ্ধ ক্রো-ও। ভাল করে তাকাতেই মার্সিডিজের পিছনে ক্যাডিলাকটাকে দেখতে পেলেন। দেখলেন ক্যাডিলাকের

ড্রাইভার জানালা দিয়ে হাত ও মাথা বের করে দিয়েছে—আবার গুলি করছে মার্সিডিজকে লক্ষ্য করে।

মার্সিডিজের দ্বিতীয় চাকা লক্ষ্য করে তৃতীয়বার গুলি করল রানা, কিন্তু লাগাতে পারল না।

প্রাণ বাঁচানোর একটা সুযোগ আছে মনে করে আবার ছুটলেন ক্রো। আওয়াজ শুনে বুঝলেন মার্সিডিজটাও ঘাড়ের কাছে চলে এসেছে। নাহ্, মৃত্যুকে এড়ানো গেল না!

ঠিক এই সময় আরেকটা গুলি করল রানা, আবার শোনা গেল বাতাস বেরুবার বিকট আওয়াজ। মার্সিডিজ পাগলামি শুরু করল, স্পিড ধরে রাখতে পারছে না খুনি। তার পাশে বসা মেয়েটার মাথা থেকে খুলে গেল স্কার্ফ, পিছন থেকে দেখে সন্দেহ হলো অবিরত চিৎকার বেরুচ্ছে ওর মুখ থেকে।

হঠাৎ কেন যেন চমকে উঠল রানা। কেন চমকেছে বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল: মেয়েটার চুল, খুলির আকৃতি ওর অতি পরিচিত কারও সঙ্গে যেন খুব মিলে যায়।

আর মাত্র কয়েক ফুট, তারপরেই খিলানটা। প্রাণপণে ছুটলেন ক্রো। তিনিও পৌঁছালেন, মার্সিডিজও সগর্জনে পাশ কাটাল ওঁকে, মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য ওঁর নাগাল পেল না। মনে মনে আশীর্বাদ করলেন ক্যাডিলাকের ড্রাইভারকে: 'যে লোক আমার প্রাণ বাঁচাল, ঈশ্বর যেন হাজারবার তাঁর প্রাণ বাঁচান।'

ওঁর সামনে ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষল ক্যাডিলাক। জানালা দিয়ে মাথা বের করে রানা বলল, 'উঠে পড়ুন, এখানে আপনি নিরাপদ নন! জলদি!'

ইতস্তত করছেন ক্রো। 'উঠব? কিন্তু...'

'পুলিশকে ব্যাপারটা রিপোর্ট করা দরকার, ওরাই আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে—উঠুন, জলদি, প্লিজ!'

সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে ক্যাডিলাকে উঠে রানার পাশে বসলেন ক্রো। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। তবে গলি থেকে ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে মার্সিডিজ, কোনদিকে গেছে বলা মুশকিল।

গলি থেকে চওড়া রাস্তায় বেরিয়ে এসে আবার মার্সিডিজকে দেখতে পেল রানা, দুশো গজ দূরে ডান দিকে বাঁক নিচ্ছে।

রানা জানে শহরের ওদিকটা, পিনো ডেল নামে পরিচিত গোটা এলাকা, কিউবান-আমেরিকান গুণ্ডাদের দখলে। মাফিয়া ডন ডিকো ভিটোরি মারা যাওয়ার পর তাদের আগের দাপট আর নেই বটে, তারপরেও সাধারণ মানুষ ভুলেও কখনও ওদিকে পা ফেলে না।

অভিবাসী কিউবান মাস্তানদের বেশ কয়েকজনকে চেনে রানা, প্রয়োজনে তাদের সাহায্যও চাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নিরীহ ও নিরস্ত্র একজন বৃদ্ধকে নিয়ে ওদিকে ওর যাওয়া উচিত হবে না।

সিদ্ধান্ত নিল পরে একসময় গিয়ে খোঁজ-খবর নেবে।

ওখান থেকে সরাসরি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলে এল রানা। লেফটেন্যান্ট মার্লিকে পাওয়া গেল না, বাইরে কোনও কাজে ব্যস্ত; কেসটা নোট করল অন্য

একজন অফিসার।

কী ঘটেছে জানালেন মার্টিন ক্রো। হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় ওঁকে গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল কালো রঙের একটা মার্সিডিজ। গাড়িটায় ড্রাইভার ছাড়াও পাশের সিটে একজন প্যাসেঞ্জার ছিল—একটা মেয়ে। এর কোনও কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। না, কারও সঙ্গে তাঁর কোনও শত্রুতা নেই।

গাড়ির নম্বরটা রানা জানাল; বলল, পিছন থেকে দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারে ও, মার্সিডিজের ড্রাইভার তার সামনের একমাত্র পথিককে মেরে ফেলতে চাইছে। সঙ্গে লাইসেন্স করা পিস্তল আছে, পিছনের কাঁচ আর চাকা লক্ষ্য করে কয়েকটা গুলি করেছে ও। দুটো চাকাই ফুটো করে দিয়েছে, কিন্তু মার্সিডিজটাকে থামাতে পারেনি, পিনো ডেলের দিকে পালিয়ে গেছে।

পালিয়ে গেলেও, সবশেষে যোগ করল রানা, পুলিশ যদি দেরি না করে ওই এলাকার গ্যারেজগুলোয় খোঁজ নেয়, মার্সিডিজটাকে ঠিকই পেয়ে যাবে। ওটার নম্বর ধরে তল্লাশি চালালে ড্রাইভারের পরিচয়ও জানা যাবে।

অফিসারকে রানা অনুরোধ করল, অন্তত কটা দিন যেন মার্টিন ক্রোকে পুলিশী হেফাজতে রাখা হয়। স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করার আগে জানতে হবে কে, কেন ওঁকে খুন করতে চাইছিল।

বৃদ্ধ ক্রোকে থানা হাজতে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এটা দেখে ওখান থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাটস্‌কিল শাখায় ফিরল রানা।

দশ

চেম্বারের মেঝেতে পায়চারি করছে রানা; হাত দুটো পিছনে এক করা, চোখে কঠিন দৃষ্টি, কপালে চিন্তা রেখা।

সন্ধ্যা পৌনে সাতটা। ঝরনা সহ অফিসে সবাই ছুটি নিয়ে চলে গেছে। জিসানকে নিয়ে একা শুধু রানা রয়েছে অফিসে। পিছনের একটা গোপন দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে জিসান।

ওর রিপোর্ট শুনেছে রানা। সানসিটি শাখার সঙ্গে, একই ফ্লোরে মিস ফ্লোরা নামে এক তরুণী থাকে, সবাই সিলুয়েট্ আর্টিস্ট বলে ওকে—কেন যেন এই তথ্যটা ইন্টারেস্টিং মনে হলো ওর।

জিসানও রানার মুখে শুনল মার্টিন ক্রো কীভাবে বেঁচে গেছে।

তবে বৃদ্ধ ক্রোকে কে মারতে যাচ্ছিল, কীভাবে তার পরিচয় জেনেছে ইত্যাদি এখনও ওকে বলেনি রানা।

'তোমার প্ল্যানটা বলো,' জানতে চাইল ও।

'কাল আমি মেরি টোপাজের সঙ্গে দেখা করব,' বলল জিসান। 'দেখি নতুন কোনও তথ্য দিতে পারে কি না।'

'ওকেও জানাবে যে সবার টাকা ফেরত দেয়া হবে,' বলল রানা। 'কার কাছ

থেকে কত টাকা নেয়া হয়েছে তা নিশ্চয়ই কোনও খাতায় কিংবা পিসিতে টোকা আছে, সেটা না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওদেরকে।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

'চোখে পট্টি, মুখে কাটা দাগ—কে লোকটা?' জানতে চাইল রানা।

'আপনি চাইলে ঠিকই আমি তাকে খুঁজে বের করব, মাসুদ ভাই।'

'হ্যাঁ, বের করো,' বলল রানা। 'তবে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে আমাদের হাতে।'

'জী, মাসুদ ভাই?'

'আমাকে তোমার কাভার দিতে হতে পারে,' বলল রানা। 'আমি একবার পিনো ডেলে যাব।'

'ওরে বাপরে!' বলল জিসান। 'বিপজ্জনক জায়গা। পালিয়ে আসা কিউবানরা ওটাকে নরক বানিয়ে রেখেছে। ওদিকে কী, মাসুদ ভাই?'

'মার্সিডিজ নিয়ে ওদিকেই পালিয়েছে লোকটা, ক্রোকে যে মারতে চাইছিল,' বলল রানা। 'সন্দেহ করছি ওকে আমরা চিনি। খুনগুলো বোধহয় সে-ই করছে, জিসান।'

জিসান অবাক। রানার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

'আমাদের এজেন্সি আর নাহিদের নামটাকে ব্যবহার করে এই যে ব্ল্যাকমেইলিং শুরু হয়েছে, এ-ও তারই ষড়যন্ত্র।'

'মাসুদ ভাই, আমাকে ব্রিফ করার সময় তো এ-সব বলেননি। হঠাৎ এ-সব তথ্য কোত্থেকে পেলেন আপনি?'

'এফবিআই রিসার্চ সেন্টার, মায়ামিতে আমার বন্ধু পল মার্টিন আছে,' বলল রানা। 'নোরা বার্নের কামরা থেকে কিছু নমুনা আর ছবি তুলে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম। আজ বিকেলে রেজাল্ট পেয়েছি। বেডরুমের কার্পেটে যে দাগ দেখা গেছে সেটা রক্তের, রক্তটা নোরারই। ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেজাল্ট...ওটা আরও ইন্টারেস্টিং।'

অপেক্ষা করছে জিসান।

'বেডরুমের বহু জায়গায় নোরা ছাড়াও অন্য একজনের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। পুরুষের হাতের ছাপ, হাতে ছ'টা করে আঙুল।'

'এর তাৎপর্য!'

'আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, যে-কারণে নাহিদ খুন হয়েছে,' পায়চারি করতে করতে বলল রানা, 'সেই একই কারণে খুন হয়েছে নোরাও। বছর দেড়েক আগে মাফিয়া ডন ডিকো ভিটোরির বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার সময় যৌথবাহিনীকে গোপনে সাহায্য করেছিল ওরা দু'জনই।'

মাথা ঝাঁকাল জিসান। 'সে তো আপনারই নেতৃত্বে, তাই না?'

রানার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হিম হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'হ্যাঁ, তা বলতে পার। সেজন্যেই আমি, আমার লোকজন, রানা এজেন্সি—সবই ওদের টার্গেট। ফ্লোরিডা রাজ্যে আমাদের কোনও অস্তিত্বই রাখতে চাইছে না ওরা।'

'কারা ওরা? আমি তো জানি সঙ্গী-স্যাঙাতসহ ঝাড়-বংশে ডন ডিকোকে

নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল যৌথবাহিনী।'

'তা দিয়েছিল, তবে ঠিক ঝাড়-বংশে নয়,' বলল রানা। 'ওদের একজন পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। তখন তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ছিল না, যৌথবাহিনী তাই তাকে আর খোঁজেওনি। তার নাম ইকো ভিটোরি, নাম করা আর্ট কালেক্টর। বাপের সাম্রাজ্য উদ্ধার করার জন্যে ফিরে এসেছে, আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছে।'

'নাম শুনে মনে হচ্ছে ডিকো ভিটোরির ছেলে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওর হাতে ছ'টা করে আঙুল।'

কপালে চিন্তার রেখা, জিসান জানতে চাইল, 'একা নয় ও, একা কেউ এভাবে আমাদের সঙ্গে লাগতে আসবে না...'

'আসেওনি,' বলল রানা। 'ডন ডিকো না থাকায় যাদের আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে, যারা লোভী ও দুর্নীতিবাজ, সেইসব পুলিশ অফিসার সাহায্য করছে তার ছেলে ইকোকে। চারপাশে ক্ষমতাশালী শত্রু, এখন থেকে প্রতিটি পা খুব সাবধানে ফেলতে হবে আমাদের।'

'ইকো এত টাকা পাচ্ছে কোথায়, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল জিসান। 'হাতে নগদ কিছু না পেলে পুলিশ কাউকে সাহায্য করে বলে তো মনে হয় না।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'ওর বাপ ডিকোর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ফ্লোরিডার আরেক ডন, ফিউগো হার্পি; সে-ই হয়তো বিপদের সময় বন্ধুর ছেলেকে পুঁজি ধার দিয়ে সাহায্য করছে।'

'হার্পির দিকেও তা হলে আমাদের একটা চোখ রাখতে হয়, মাসুদ ভাই,' বলল জিসান।

'তার দরকার হবে না,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা আমি আঁচ করতে পেরে এফবিআইকে বলেছি হার্পিকে ওরা যেন একটু ব্যস্ত রাখে। নিজেকে নিয়ে এখন খুব হয়রান থাকবে সে, ইকোর কথা ভাবার সময় পাবে না।'

'এফবিআইকে ইকোর এই ব্যাপারটা আমরা জানাচ্ছি না কেন, মাসুদ ভাই?' প্রশ্ন করল জিসান।

'সরাসরি আমাদের গায়ে হাত দিয়েছে ইকো। খুন করেছে আমাদের।' মাথা নাড়ল রানা। 'সেজন্যেই ব্যাপারটাকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছি। আমরা নিজেরা শাস্তি দেব তাকে। চোখের বদলে চোখ, জিসান, দাঁতের বদলে দাঁত। তবে তার মানে এই নয় যে এফবিআইকে আমরা অন্ধকারে রাখছি।'

'রাইট। ব্যাখ্যার জন্যে ধন্যবাদ, মাসুদ ভাই।'

'ইউ আর ওয়েলকাম।'

'তবে সবগুলো খুন যে ইকো নিজের হাতে করছে, তা নাও হতে পারে,' বলল রানা। 'চোখে পট্টি বাঁধা ওই লোকটাকে ধরা দরকার। নাহিদকে হয়তো সে-ই গুলি করেছে।'

'ওদিকটা আমি চেক করেছি, মাসুদ ভাই,' বলল জিসান। 'নাহিদ ভাই মারা যাবার কিছুক্ষণ আগে তিনজন সাততলায় উঠেছিল—একটা মেয়ে, দুজন পুরুষ। কেয়ারটেকার বলছে, ওর ধারণা একা শুধু মেয়েটাই রানা এজেন্সিতে গিয়েছিল।

এ-কথা বলার কারণ, আগেও কয়েকবার মেয়েটিকে এজেন্সির অফিসে ঢুকতে দেখেছে সে।'

'আর পুরুষ দুজন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওরা দুজন গিয়েছিল নিউজ এজেন্সিতে। কম বয়েসী ছেলেটা পিয়ন, পত্রিকা অফিস থেকে এসেছিল। দ্বিতীয় লোকটা এসেছিল বিজ্ঞাপনের রেট জানতে।'

'ওরকম অসময়ে?' রানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'সে হয়তো প্রথমে নিউজ এজেন্সিতে গেছে, অ্যালিবাই তৈরি রাখার জন্যে, তারপর আমাদের অফিসে ঢুকে গুলি করেছে নাহিদকে।'

'খুব দামি কাপড়চোপড়, মাসুদ ভাই; বাদামী হ্যাট, বাদামী সুট...'

'মার্সিডিজের ড্রাইভার!' জিসানকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল রানা। 'ইকো! ধীরে ধীরে একটা ছবি পাওয়া যাচ্ছে, জিসান। ওয়েল ডান।'

'মাসুদ ভাই, আপনি লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে,' মাথাটা নিচু করল জিসান, জানে মার্টিন ক্রোর নিরাপত্তার দিকটা ওরই দেখা উচিত ছিল। চেয়ার ছাড়ল ও, বলল, 'আমি তা হলে এখন আসি, মাসুদ ভাই?'

'এক মিনিট,' বলল রানা। 'ইকোর সঙ্গে মার্সিডিজে একটা মেয়ে ছিল, স্কার্ফ দিয়ে মুখ-মাথা ঢাকা। স্কার্ফটা খুলে যাওয়ায় চুল আর মাথা আমার বেশ চেনা চেনা লেগেছে। হতে পারে ওকে জিম্মি করার জন্যে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ইকো। তুমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখো, কেমন?'

'আপনি কার কথা বলছেন, মাসুদ ভাই?' বিস্মিত দেখাল জিসানকে।

'টিসা।'

চমকে উঠলেও, সেটা জিসানের চেহারায় প্রকাশ পেল না। 'একটা ফোন করে এখনই জেনে নেয়া যায়...'

'আমি টিসার ল্যাণ্ডফোনে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ধরছে না কেউ,' ওকে বাধা দিয়ে বলল রানা। 'হয়তো বাইরে কোথাও গেছে।'

'ওর মোবাইলে করি?'

রানাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'কপালে পিস্তল ধরা থাকলে টিসা কি সত্যি কথা বলবে?' তুমি ওর বাড়িতে কাউকে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। কী রিপোর্ট পাও জানাবে আমাকে।'

'জী, মাসুদ ভাই,' বলল জিসান, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'এখন আমি তা হলে আসি?'

'ওই মেয়েটার কথা আর কিছু বললে না যে, যে নাহিদের কাছে গিয়েছিল?' পায়চারি না থামিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেয়ারটেকার নিকেল বলল, খুব সুন্দর দেখতে, সিনেমার নায়িকা হতে পারবে। মাথায় কালো চুল, সম্ভবত ভারতীয়। কালো ড্রেস—শুধু হ্যাটটা সাদা। ব্রেসলেট ছিল হাতে, ওটা থেকে সোনার চেইন ঝুলছিল।'

'তাতে কি পাথর বসানো ছিল? ওই চেইনে?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, তাই তো বলল কেয়ারটেকার।'

'কী আশ্চর্য!' বিড়বিড় করছে রানা, পায়চারি থেমে গেছে।

'ওকেও আপনি চেনেন নাকি, মাসুদ ভাই?'

'কী জানি। চিনতেও পারি। তোমাকে আমি জানাব, জিসান। মেরি টোপাজের সঙ্গে কথা বলার পর কাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'জী, ঠিক আছে। আমি এখন সানসিটি শাখায় যাব। দেখি মাইক্রোফোনের তারটা কোথায় গেছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পারলে আপনাকে আমি ফোন করব।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'মাঝরাতেও আমাকে তুমি ফোনে পাবে। বাইরে থেকে লক করে যেয়ো দরজায়।'

'জী।' এক সেকেণ্ড ইতস্তত করবার পর জিসান জানতে চাইল, 'মাসুদ ভাই, পিনো ডেলে ঠিক কখন যাচ্ছি আমরা?'

'ওদিকে আমার পুরনো কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে, সবাই তারা কিউবান-আমেরিকান। আগেই অ্যালার্ট করা হয়েছে, খোঁজ-খবর নিচ্ছে ওরা,' বলল রানা। 'এজেন্সির কয়েকজনকেও এলাকাটা রেকি করতে পাঠিয়েছি। কে কী রিপোর্ট পাঠায় তার ওপর নির্ভর করবে কখন আমরা যাব।'

'জী, মাসুদ ভাই!' বিপদের গন্ধ পেয়ে জিসানের শিরায়-উপশিরায় রক্তপ্রবাহ বেড়ে গেল।

'পরিস্থিতি ভাল হলে এখনই আমাকে ডাকবে ওরা,' বলল রানা। 'সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে তোমার আর যাওয়া হবে না। আবার প্ল্যানটা বাতিলও করা হতে পারে।'

জিসান বিদায় নিয়ে চলে যেতে অফিস বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। রেন্ট-আ-কার কোম্পানিকে ক্যাডিলাকটা ফেরত দিয়ে এসেছে ও। সাদা মার্সিডিজ নিয়ে ওর জন্য ফুটপাথের কিনারায় অপেক্ষা করছে ফিজিও রয়।

'ফাল্গুন ভবনে চলো, তারপর তোমার ছুটি,' গাড়ির পাশে এসে বলল রানা।

'ইয়েস, বস,' বলে হাতের কাগজটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল রয়। 'আজকের লেটেস্ট এডিশন, পড়বেন?'

'ধন্যবাদ,' কাগজটা নিয়ে গাড়ির ব্যাকসিটে উঠল রানা, হাত বাড়িয়ে রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালল।

ট্রাফিক জ্যামের ভিতর দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রয়, খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে রানা। হঠাৎ ছোট্ট একটা খবরে চোখ আটকে গেল। সেটা পড়তে গিয়ে দম আটকে এল ওর। বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই আবার পড়তে হলো।

'তোমার মোবাইলে একটা নতুন সিম আছে, তাই না, রয়?' জিজ্ঞেস করল রানা, জবাবের অপেক্ষায় না থেকে বলল, 'দাও ওটা।'

মোবাইল ফোনটা নিয়ে জিসানের নম্বরে ডায়াল করল ও।

'হ্যালো?' জানতে চাইল জিসান।

'তুমি কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'এই মাত্র অফিসে ফিরলাম,' বলল জিসান, এত তাড়াতাড়ি রানার গলা পেয়ে হতচকিত।

'মার্টিন ক্রো,' বলল রানা। 'কাগজে লিখেছে চারটে দশে খুন হয়েছে

ভদ্রলোক।'

'না...' রিয়্যাক্ট করল জিসান, '...কী করে!'

'পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে, রাস্তা পার হওয়ার সময়। একটা গাড়ি ওকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।'

'তা কী করে হয়, মাসুদ ভাই? মিস্টার ক্রোর না পুলিশী হেফাজতে থাকার কথা?' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না জিসান।

'পুলিশ হেডকোয়ার্টারের অফিসে বসিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে, বিকেল চারটে পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি কোন কারাগারে পাঠানো হবে। চারটের পর কাউকে কিছু না বলে ওখান থেকে বেরিয়ে আসে সে, সম্ভবত ওপারের একটা রেস্তোরাঁয় কফি খেতে যাচ্ছিল।'

'বোঝাই যাচ্ছে, এটা পুলিশের বক্তব্য। আপনি বিশ্বাস করেন?'

'না,' বলল রানা। 'সুযোগটা পুলিশই তৈরি করে দিয়েছে, ইকো ভিটোরি যাতে মিস্টার ক্রোকে খুন করতে পারে।'

'আমরা এখন কী করব, মাসুদ ভাই?'

'চোখ-কান খোলা রেখে সতর্ক থাকব,' বলল রানা। 'হামলা হলে আমরা যাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় না পড়ি। আরেকটা কথা, জিসান।'

'জী, মাসুদ ভাই?'

'মেরি টোপাজও এখন আর নিজের বাড়িতে নিরাপদ নয়,' বলল রানা। 'ইকো জানে ক্রো ওর কথাও বলেছে তোমাকে।'

'জী, আমি...'

'ওকে নিয়ে ক্যাটসকিলে, আমাদের দু'নম্বর সেফ হাউজে চলে যাও। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ওখানে আসছি আমি।'

'জী, ঠিক আছে।'

দশ মিনিট পর ফাল্গুন ভবনের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা, দোতলার সিঁড়ির দিকে না গিয়ে প্যাসেজ হয়ে চলে এল মলির ড্রইংরুমে।

'মলি!' ডাকল ও। আলো জ্বলছে, অথচ মলিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কেউ সাড়াও দিল না।

আরও দু'বার ডাকল রানা, সাড়া না পেয়ে উঁকি দিল বেডরুমে, এক সেকেন্ড ইতস্তত করে ভিতরে ঢুকল। চোখ বুলিয়ে চারপাশটা দেখল, তারপর ওয়ার্ড্রোবের দিকে এগোল।

ওটা খুলে ভিতরে তাকাল রানা। প্রচুর ফ্রক, সুট, সালোয়ার-কামিজ ঝুলছে; তার মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ল কালো স্কার্ট, কালো কোট, কালো দস্তানা—ওগুলোর উপরে একটা সাদা হ্যাট।

ওয়ার্ড্রোব বন্ধ করে ড্রইংরুমে ফিরে এসে আগুনের কাছাকাছি বসল রানা। চেহারা শান্ত, ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে।

আরও প্রায় পনেরো মিনিট পর মলির ফেরার আওয়াজ পেল।

'ওহ্, মাসুদ ভাই, আপনি!' ড্রইংরুমের দরজা খুলে রানাকে বসে থাকতে

দেখেই নার্ভাস হয়ে পড়ল মলি। 'অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন বুঝি?'

'না, এই তো কয়েক মিনিট,' নরম সুরে বলল রানা। 'আগে কাপড়চোপড় ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে নাও, তারপর কথা হবে।'

'না, মাসুদ ভাই, আপনাকে বসিয়ে রেখে কোথাও আমি যাচ্ছি না,' তাড়াতাড়ি বলল মলি, এগিয়ে গিয়ে রানার মুখোমুখি সোফাটায় বসল। 'বলুন, সব খবর ভাল তো?'

'কোথায় গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কার সঙ্গে?'

রানার গলা শান্ত হলে কী হবে, প্রশ্নের ধরন খেয়াল করে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল মলি। 'পার্ক স্ট্রিটের মার্ডার কেসটটার কিছু লেগ ওঅর্ক বাকি ছিল,' সত্যি কথাই বলছে, অথচ গলাটা কেঁপে গেল, 'ওটা সেরে এলাম। সাইমন ছিল সঙ্গে, ও-ই তো পৌঁছে দিয়ে গেল।'

'গুড,' বলল রানা। 'এখন আমাদের কোনও রকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না। তা তোমার আর সব খবর ভাল তো, মলি?'

'জী, মাসুদ ভাই, সব ভাল... একটু ক্লান্ত, এই আর কী!' সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মলি। 'বসুন, দুজনের জন্যেই কফি বানাই।'

'জানোই তো,' বলল রানা, 'আমারটায় চিনি খুব কম।'

দশ মিনিট পর নিজের কাপে চুমুক দিল রানা, কাপের কিনারা দিয়ে তাকিয়ে আছে মলির দিকে, ও-ও চুমুক দিচ্ছে কফির কাপে। 'মলি,' খুব নিচু গলায় বলল ও, 'নাহিদ যেদিন মারা গেল।' আর কিছু না বলে চুপ করে থাকল।

'জী, মাসুদ ভাই?' রানার দিকে একটু ঝুঁকল মলি। 'নাহিদ যেদিন মারা গেল...সেদিন কী?'

'ওই রাতে তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে কেন?' এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করল রানা। মলিকে আড়ষ্ট হয়ে যেতে দেখল ও, চোখ বড় বড় করে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। এজেন্সির একজন শাখা-প্রধানের চোখে নগ্ন আতঙ্ক দেখে মনে মনে ভারি অবাক হচ্ছে।

'শোনো, মলি,' বলল রানা, 'কাউকে তুমি ভয় পেয়ো না। এমনকী আমাকেও না। আমি জানি তুমি ওখানে গেছ। আমাকে শুধু জানতে হবে কেন গেছ। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তোমাকে ভয় পেতে হবে।'

'না; তা কেন ভয় পাব,' খসখসে গলায় বলল মলি, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। কতটুকু জানেন মাসুদ ভাই? প্রশ্ন করল নিজেকে। আতঙ্কে শরীরের সব শিরা-উপশিরা বরফ হয়ে যাচ্ছে। সাইমন সম্পর্কে জানেন কি? জানলে কতটুকু? 'আপনি আমাকে চমকে দিয়েছেন, মাসুদ ভাই।' নার্ভাস, কাঁপা কাঁপা একটু হাসি ফুটল মুখে। 'আমার ধারণা ছিল না ব্যাপারটা আর কেউ জানে।'

রানা হাসল না। 'আর কেউ জানে না, একা শুধু আমি জানি। তোমাকেও কি ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল?'

মুহূর্তের জন্য মলির মনে হলো, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ও। বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। এত অসুস্থ যে বমি পাচ্ছে।

'ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি নাহিদের নামে সানসিটি শাখার ক্লায়েন্টদের ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, ব্যাপারটা জেনে ফেলায় খুন করা হয়েছে নাহিদকে। খুনের রাতে তোমাকে সাততলায় উঠতে দেখা গেছে। যে বর্ণনা পেয়েছি তার সঙ্গে তোমার ড্রেস মিলে যায়। তার মানে কি তোমার কাছ থেকেও মাসে মাসে টাকা নিচ্ছিল ওরা?'

এগারো

ছুটে মেইন রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাত তুলে একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামাল জিসান। 'টোয়েনটিওয়ান/বি, সাউথ স্ট্রিট,' বলে হ্যাঁচকা টানে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল। 'তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে।'

'ঠিক আছে, স্যর, এক্ষুনি দিচ্ছি পৌঁছে,' বলল ড্রাইভার, তারপর এত দ্রুত ক্লাচ ছাড়ল যে ঝাঁকি খেয়ে গাড়ির মেঝেতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো জিসানের।

'একটুর জন্যে ঘাড়টা ভাঙল না,' সিধে হওয়ার সময় বলল জিসান।

'আপনিই তো বললেন তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে!' জবাব দিল ড্রাইভার।

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা পরপারে নয়।'

পরবর্তী দশ মিনিট হৃৎপিণ্ডটা যেন মুখে নিয়ে বসে থাকল জিসান, তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে চাওয়ায় নিজের মুণ্ডুপাত করছে।

১০ নম্বর ওয়ার্ডে মানুষের এত ভিড় যে ফুটপাথে জায়গা না পেয়ে বহু লোককে রাস্তায় নেমে আসতে হয়েছে। কিছু হকার দোকান-পাটও সাজিয়ে বসেছে।

বাধ্য হয়ে গাড়ির স্পিড কমাতে হলো ড্রাইভারকে। 'আপনার যদি খুব বেশি তাড়া থাকে,' হঠাৎ করে জিসানকে বলল লোকটা, 'সামনেই একটা গলি আছে, পায়ে হেঁটে শর্টকাট ধরুন, কয়েক মিনিটের মধ্যে সাউথ স্ট্রিটে পৌঁছে যাবেন।'

'হাঁটতে চাইলে ট্যাক্সি ভাড়া করব কেন?' বলল জিসান, মনে পড়ল মাসুদ ভাই ওকে বলেছেন মার্টিন ক্রোকে ওখানেই খুন করা হয়েছে। 'সাবধানে চালাও, কাউকে চাপা দিয়ো না।'

'দিতে পারলে খুশিই হতাম,' গজগজ করে বলল ড্রাইভার, খানিক পরপর হর্ন বাজাচ্ছে।

জিসান ভাবছে, অচেনা একটা মেয়েকে সঙ্গে করে কোথাও নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। মেয়েটা ভাববে, ওকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে। পুলিশ! পুলিশ! বলে চিৎকার করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সিটের কিনারায় সরে এল জিসান। 'আর কতদূর?'

'এই তো, সামনেই।'

'ঠিক আছে, মোড়ে থামাও।' ট্যাক্সি থামতে ভাড়া মেটাল জিসান, ভাল

বকশিশও দিল ॥

"আপনি চান অপেক্ষা করি? ফেরার সময় এদিকে তো কোনও ট্যাক্সি পাবেন না ॥"

"থাকো তা হলে," বলল জিসান। 'তবে আমার খানিকটা দেরি হতে পারে। আধ ঘন্টার মধ্যে না ফিরলে চলে যেয়ো।"

"ঠিক আছে," বলল ড্রাইভার। 'এই ফাঁকে মুখে কিছু দিয়ে আসি।'

সাউথ স্ট্রিটে সুন্দর সব আধুনিক দালান যেমন আছে, তেমনি মান্ধাতা আমলের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনও আছে।

অসুন্দর প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে মরচে ধরা ফায়ার এস্কেপ, ব্যালকনি ঝুলে থাকতে দেখল জিসান। ফুটপাথের কিনারায় উপচে পড়ছে আবর্জনা ভর্তি ক্যান। স্ট্রিট লাইট বেশিরভাগই জ্বলছে না। কয়েক ফুট পরপর দোরগোড়ায় কিংবা রেইলিঙে ভর দিয়ে আড্ডা মারছে উঠতি বয়সের ছেলে-ছোকরার দল, পরিবেশে বিপজ্জনক একটা ভাব এনে দিয়েছে ওরা।

তারপরা শুরু হলো আধুনিক দালান-কোঠা। তিনটে বাড়ির পরেই মার্টিন ক্রোর বড়সড় মুদি দোকানের সাইনবোর্ড দেখতে পেল জিসান। আরও আট-দশটা বাড়িকে পাশ কাটিয়ে এল ও।

টোয়েনটিওয়ান/বি দালানটা ছয়তলা। ওটার সামনে মাত্র দাঁড়িয়েছে, এই সময় অন্ধকার থেকে অলৌকিক ছায়ার মত পাশে চলে এল একটা গাড়ি, ওর কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"এই যে, তুমি!" কর্কশ ডাক শুনতে পেল জিসান।

এক লোক গাড়ি থেকে ওর উদ্দেশে হাতছানি দিচ্ছে। 'জানো টোয়েনটিওয়ান/বি, কোনদিকে হতে পারে?'

গাড়িটার দিকে এগোল জিসান। ড্রাইভিং হুইলের পিছনের লোকটা অন্ধকারে বসে আছে, তবে জিসানকে দেখবার জন্য জানালার দিকে ঝুঁকে থাকায় স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো পড়েছে মুখে ॥

দেখামাত্র লোকটাকে চিনতে পারল জিসান। মুখের ডানদিকে লম্বা, শুকনো ক্ষতচিহ্ন ॥ বাম চোখে কালো পট্টি। এই লোকই মার্টিন ক্রোর কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল ॥

বিমূঢ় হয়ে পড়ল জিসান, তবে যে-কোনও পরিস্থিতি চেহারাটা কীভাবে স্বাভাবিক রাখতে হয় তা খুব ভালই জানা আছে ওর।

"টোয়েনটিওয়ান/বি? ঠিক জানি না, তবে রাস্তার ওই মাথায় হবার কথা। এই বাড়িটার নম্বর দুশো একুশ ॥"

চোখে পট্টি বাঁধা লোকটা ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল, তারপর গিয়ার এনগেজ করে ছেড়ে দিল গাড়ি ॥ ওকে পাশ কাটানোর সময় ভিতরে আরেক লোককে বসে থাকতে দেখল জিসান। একটু খাটো, মোটাসোটা। ব্যাকসিটে হেলান দিয়ে রয়েছে, হ্যাটের কিনারা দিয়ে চোখ প্রায় ঢাকা।

জিসানের মন বলছে মেরি টোপাজকে খুন করবার জন্য একুশ নম্বর বাড়িটা খুঁজছে তারা ॥ মার্টিন ক্রোকে চুপ করিয়ে এবার মেয়েটার মুখ বন্ধ করতে এসেছে।

পিস্তল নিয়ে বেরোয়নি বলে নিজেকে তিরস্কার করল জিসান। দ্রুত ঘুরে সাদা মার্বেল পাথরের কয়েকটা ধাপ টপকাল। তিনদিক খোলা চওড়া চাতালে চেয়ার-টেবিল ফেলা রয়েছে, সকাল-বিকাল এখানে বসে গল্প-গুজব করে লোকজন, উপরে ছাদও আছে। চাতাল পার হয়ে সদর দরজার সামনে পৌঁছে গেল ও। দরজার পাশেই একটা কার্ড ডেস্ক, প্রতিটি র‍্যাকে লেখা এ. বি. সি. ডি. ই., প্রতিটি হরফের সঙ্গে একজন করে ভাড়াটের নাম দেওয়া আছে।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে জিসান দেখল ল্যাণ্ডলেডি মেরি টোপাজের অ্যাপার্টমেন্টটা টপ ফ্লোরে। একটু পিছু হটে রাস্তার শেষ মাথার দিকে তাকাল ও। প্রায় দুশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়িটা, চোখে পট্টি বাঁধা লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সদর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল জিসান। লবিটা বেশ বড়। সরাসরি সামনে এলিভেটর দেখা যাচ্ছে।

ছুটে গিয়ে এলিভেটরে চড়ল জিসান। চাপ দিল এ. লেখা বোতামে।

সামান্য ঘামছে জিসান। ও জানে, একচোখো লোক আর তার সঙ্গী তিন মিনিটের মধ্যে এই দালানের সামনে পৌঁছে যাবে। টপ ফ্লোরে উঠতে আরও তিন মিনিট লাগবে তাদের। ওই সময়ের মধ্যে মেয়েটাকে ঘর থেকে বের করে এনে এলিভেটরে তুলতে হবে, নামিয়ে আনতে হবে নীচে।

জিসান প্রার্থনা করছে, সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় লোকগুলো যেন টের না পায় যে এলিভেটর নীচে নামছে। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করতে যাচ্ছে ও, তার উপর মেয়েটা যদি সহযোগিতা না করে...

আর ভাবতে পারছে না।

টপ ফ্লোরে পৌঁছাতে দেড় মিনিট লাগল ওর। মৃদু ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এলিভেটর। বেরুল রানা, দরজাটা খোলা রেখে সামনে তাকাল। ওদিকে একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজা; গায়ে কড়া, কলবেল দুটোই আছে। দরজার নীচে আলোর সরু রেখা চোখে পড়ল।

কলবেলের বোতামটা টিপে রাখল জিসান, শুনতে পাচ্ছে বিরতিহীন বেল বাজছে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ভিতরে কোথাও। অপেক্ষা করছে ও, একটু দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে, সামান্য বিরতি দিয়ে শোনার চেষ্টা করল সিঁড়িতে পায়ের কোনও আওয়াজ হয় কি না।

অপেক্ষাই সার: অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সাড়া দিচ্ছে না কেউ।

কলবেলের বোতাম ছেড়ে দিয়ে কড়া ধরে খুব জোরে চারবার নাড়া দিল জিসান, সিঁড়ির শাফট বেয়ে নেমে গিয়ে গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল আওয়াজটা।

তারপরেও সাড়া নেই দেখে জিসান ভাবল, মেয়েটা সম্ভবত আলো জ্বেলে রেখেই বাইরে চলে গেছে। দরজার সামনে থেকে সরে এসে সিঁড়িটাকে ঘিরে রাখা রেইলিঙের কাছে চলে গেল ও, তারপর উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল। অনেক নীচে লবি দেখতে পাচ্ছে। তারপর, একটু ঝুঁকতে, নীচের সিঁড়ি থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে আসতে শুনল। শব্দটা একদম কাছ থেকে আসছে বলে মনে হলো ওর।

'অ্যাই, কী হয়েছে?' ওর পিছন থেকে প্রশ্ন হলো।

লাফ দিয়ে ঘুরল জিসান, ওর নার্ভ ব্যানজো-র তারের মত ঝনঝন করছে।

জিসান দেখল খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে একটা মেয়ে। মাথায় একরাশ সোনালি চুল, সুগঠিত কাঁধের উপর স্তূপ হয়ে আছে। নাইলনের কালো পা'জামা কাঁচের মত স্বচ্ছ। তেইশ কি চব্বিশ বছর বয়স হবে, নীল চোখ দুটো বড় বড়, নাকটা ডগার কাছে উঁচু, সুগঠিত চোয়াল। মেয়েটার একহারা ফিগার, যৌবনের খাঁজ-ভাঁজগুলো জিসানের মাথার সব চুল যেন খাড়া করে দিল।

বারো

মাসুদ ভাই কি শুধু এটুকু জানেন, নাকি কিছুই ওঁর কাছে গোপন নেই? নিজেকে প্রশ্ন করল মলি, অনুভব করল হাতের তালু ঘামে ভিজে যাচ্ছে, শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেছে ঠোঁট।

'হ্যাঁ, আমার কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে ওরা,' বলল ও, মাথাটা হন্যে হয়ে ব্ল্যাকমেইল করবার একটা কারণ খুঁজছে, শুনে রানা যাতে বিশ্বাস করে।

'হোয়াট?' রানার কণ্ঠস্বর কর্কশ। 'রানা এজেন্সির একজন শাখা-প্রধানকে মানুষ ব্ল্যাকমেইল করছে, আর আমি সেটা জানি না!'

'আপনাকে আমি বলতে পারিনি,' মাথা নিচু করল মলি। 'সে খুব লজ্জার কথা।'

'কে তোমার লজ্জার কথা শুনতে চায়? কই, এখনও তো আমি শুনতে চাইছি না। সবার জীবনেই গোপন করার মত কিছু থাকতে পারে। কিন্তু আমার এজেন্সির কোনও এজেন্টকে ব্ল্যাকমেইল করা হলে সেটা তো অবশ্যই আমাকে জানতে হবে।'

মলি অবশ হয়ে গেল, ভয় হলো এখনই ঢলে পড়বে। মাসুদ ভাই জানেন না! স্বস্তি বোধটা এত প্রবল, ওর কাঁদতে ইচ্ছে করছে। 'মাত্র কয়েক দিন আগে চিঠিটা পাই আমি—নাহিদের সই করা। ওই দিন রাতে ওখানে আমি প্রথম কিস্তির টাকা দিতে গিয়েছিলাম।'

'কীভাবে পেলে চিঠি?'

'এক লোক দিয়ে গেছে।'

'কে সে? দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাম চোখে কালো পট্টি, ডান গালে কাটা দাগ...'

'কত?' জানতে চাইল রানা।

'বিশ হাজার ডলার।'

'কাকে দিলে?' রানার দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী হয়ে উঠল। 'অফিসে ঢুকে তুমি দেখলে নাহিদ বেঁচে আছে তখনও?'

মাথা নাড়ল মলি। 'অফিসে আমি ঢুকিনি। চিঠিতে নির্দেশ দেয়া

ছিল—দরজার বাইরে রাখা বাক্সে টাকাভর্তি এনভেলাপ ঢুকিয়ে দিয়ে আসতে হবে, তাই দিয়ে চলে এসেছি।'

'এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!' সোফা ছেড়ে পায়চারি শুরু করল রানা। 'কাদেরকে দিয়ে আমি এজেন্সি চালাচ্ছি? একদল মেরুদণ্ডহীন মানুষকে দিয়ে? একজন ব্ল্যাকমেইলারের কাছে হেরে যাও তোমরা?'

'আপনাকে না জানিয়ে অন্যায় যা করার করে ফেলেছি,' বলল মলি। 'কিন্তু এখন আমি কথাটা বলতে চাই।'

মলি উপলব্ধি করছে, কিছু একটা বানিয়ে বলতে হবে ওকে। তা না হলে ওকে নিয়ে সন্দেহে ভুগবেন মাসুদ ভাই। ওর উপর নজর রাখার ব্যবস্থাও করতে পারেন।

বারো কি তেরো বছর আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল, তখন মলি পড়াশোনা করছে বস্টনে। সিদ্ধান্ত নিল, বিশ্বাসযোগ্য আর কিছু যখন পাওয়া যাচ্ছে না, ওর রুমমেট শার্লটের অভিজ্ঞতা ধার করবে।

'তুমি বরং ব্ল্যাকমেইলার সম্পর্কে কী জানো বলো।' পায়চারি শুরু করে বলল রানা। 'কিংবা আমি কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'এখন আর কোনও সাহায্য দরকার নেই আমার, মাসুদ ভাই,' বলল মলি। 'ব্যাপারটা আমার অতীত নিয়ে। তখন বস্টনে থাকি। মাত্র ষোলো কি সতেরো বছর বয়স। দেশ থেকে টাকা আসতে দেরি হওয়ায় খুব অভাব যাচ্ছে। সানশাইন সুপারমার্কেটে ঘুরছি, হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম—ফ্যাশন শো-র জন্যে মেয়ে বাছাই করা হবে, নির্বাচিত হলে হপ্তায় পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে একশো ডলার। ভাবলাম ভাগ্যটা পরীক্ষা করে দেখি, টিকে গেলে বাবাকে আর কষ্ট করে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হবে না। কিন্তু তারপরেই মনটা খারাপ হয়ে গেল... কোথাও যাবার মত ভাল ড্রেসই তো নেই আমার।

'চারদিকে দামি দামি ড্রেস ঝুলে থাকতে দেখে লোভ হলো খুব। কেউ কোথাও নেই, হ্যাঙ্গার থেকে তাড়াতাড়ি একটা ড্রেস নামিয়ে স্কার্টের ভিতর লুকিয়ে ফেললাম। কিন্তু তখন জানি না গোপন ক্যামেরায় ধরা পড়ে গেছি। পুলিশ ডাকল ওরা। এক হপ্তা জেল খাটতে হলো আমাকে।'

পায়চারি থামিয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'আমাকে এ-সব না শোনালেও পারতে তুমি, মলি। কিন্তু এরকম সামান্য কারণে ওরা তোমাকে ব্যাকমেইল করছিল?' কপালে চিন্তার রেখা।

'চিঠিতে আমাকে হুমকি দিয়েছে, আপনাকে তো বলে দেবেই, ব্যাপারটা টিভি আর পত্রিকাতেও ছাপাবে। প্রশ্ন তোলা হবে: যার বিরুদ্ধে শপ লিফটিং-এর অভিযোগ আছে তাকে প্রাইভেট আই হবার লাইসেন্স দেয়াটা কি ঠিক হয়েছে? মান-সম্মান, চাকরি, সামাজিক মর্যাদা...এ-সব হারাতে হবে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়ি আমি...'

রানার চোখে কঠিন দৃষ্টি। 'আর কেউ জানে?'

মাথা নাড়ল মলি।

'ঠিক আছে, আর কাউকে জানাবার দরকার নেই,' বলল রানা, পায়চারি

থামিয়ে মলির সামনে থামল। 'মলি, তুমি যখন সাততলায় উঠলে, কিছু বুঝতে পেরেছিলে—নাহিদ বেঁচে ছিল কি না?'

'ঠিক বলতে পারব না,' মাথা নিচু করে বলল মলি। 'তবে দরজা খোলা ছিল, ভেতরে আলো জ্বলছিল।'

'কোনও রকম আওয়াজ পাওনি?'

'না,' বলল মলি। 'আওয়াজ হলেও শুনতে পাবার কথা নয়। নিউজ এজেন্সির লোকজন ভলিউম বাড়িয়ে কী একটা খেলা দেখছিল টিভিতে।'

রানার মনে পড়ল এই একই কথা ওকে বলেছে লেফটেন্যান্ট মার্লি উইলিয়ামও। 'আমাকে তোমার আর কিছু বলার নেই তো, মলি? ভেবেচিন্তে, বুঝেশুনে জবাব দাও। পরে কিন্তু সময় না-ও পেতে পারো।'

কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা নাড়ল মলি।

'ঠিক আছে। আমাকে আবার একটু বেরুতে হচ্ছে, ফিরতে দেরি হবে,' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রানা।

রানা চলে যেতে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলল মলি, ভাবছে— মাসুদ ভাইয়ের ফিরতে দেরি হওয়া মানে মাঝরাত। হঠাৎ পাওয়া সুযোগটা হাতছাড়া করি কেন!

সাইমন ওর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য খুব জেদাজেদি করছিল, কিন্তু রাত করে বাড়ি ফেরাটা বসের চোখে দৃষ্টিকটু লাগবে ভেবে ওর আবদার রক্ষা করতে পারেনি মলি। এখন যখন একটা সুযোগ পাওয়া গেছে...

ফোনে সাইমনকে বলল, 'হ্যালো, লেডিকিলার! তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ।'

'কী সারপ্রাইজ, ডার্লিং?' দম আটকে জানতে চাইল সাইমন।

'তুমি জেগে থাকো, আমি আসছি,' কলকলিয়ে হেসে উঠে বলল মলি। 'পৌঁছাতে খানিক দেরি হতে পারে।'

'ক্যাটস্‌কিলে চলো,' সাদা মার্সিডিজে ওঠার সময় রয়কে বলল রানা। 'দু'নম্বর সেফ হাউজে।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রয়।

দুটো বাঁক ঘোরার পর রানা বলল, 'সামনে থামো, পাবলিক বুদের পাশে।'

গাড়ি থামতে নীচে নামল রানা, চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে ফোন বুদে ঢুকে ডায়াল করল 'অনুসন্ধান'-এ।

সংযোগ পাওয়ার পর বলল, 'পুলিশ ক্যাপটেন ক্রিস্টোফার ম্যাকআর্থারকে চাইছি—বস্টন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে পোস্টিং।'

'ইয়েস, স্যর!' বলল মেয়েটা।

রিসিভার নামিয়ে রেখে বুদ থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে পায়চারি করছে রানা। এক মিনিট পর বেল বাজল। বুদে ঢুকে রিসিভার তুলল ও। 'আচ্ছা, আচ্ছা, এই না হলে বন্ধুত্ব—এতদিন পর খোঁজ নিচ্ছ, তা-ও আবার ভায়া অনুসন্ধান! কেমন আছ, দোস্ত?'

'আরে বাবা, সঙ্গে ফোনবুকটা নেই,' বলল রানা। 'ভাল আছি। তুমি কেমন?'

'চমৎকার!'

'বউ-বাচ্চা?'

'চমৎকার।'

'শোনো, আমার একটা ইনফরমেশন দরকার।'

'বলে ফেলো।'

'বারো-তেরো বছর আগে মলি চৌধুরি নামে একটা মেয়ে সানশাইন সুপারমার্কেটে শপ-লিফটিং করতে গিয়ে ধরা পড়ে। এক হপ্তা জেল খাটতে হয়। তুমি কি ব্যাপারটা চেক করতে পারবে?'

'বোধহয় পারব,' বলল ক্যাপটেন ম্যাকআর্থার। 'মিনিট তিনেক সময় দাও আমাকে।'

'ঠিক আছে।'

তিন মিনিটও লাগল না, লাইনে ফিরে এল ম্যাকআর্থার। 'ওই নামে কেউ অ্যারেস্ট হয়নি,' বলল ও। 'ওর নামে কোনও কেসও হয়নি।'

রানার চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠল। 'সানশাইন সুপারমার্কেটে ড্রেস চুরি করার কোনও ঘটনাই ঘটেনি ওই সময়?'

'দেখছি,' বলে আবার লাইন থেকে সরে গেল ক্যাপটেন ম্যাকআর্থার। এবার আগের চেয়ে দেরি করে ফিরল, বলল, 'শপ-লিফটিং-এর অপরাধে শার্লট বেকহ্যাম নামে এক মেয়ের সাতদিন জেল হয়েছিল।'

শার্লট নামটা মনে আছে রানার, কবে যেন মলির মুখে শুনেছে, বস্টনে থাকার সময় ওর রুমমেট ছিল।

'ওই কেসের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল মলি চৌধুরি,' বলল ম্যাকআর্থার। 'তবে ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনা হয়নি।'

'ধন্যবাদ, দোস্ত। পরে কথা হবে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

গাড়িতে ফিরে আসবার সময় ভ্রূ জোড়া কুঁচকে রাখল রানা। ড্রেস চুরির কথাটা শোনার সময়ই ওর সন্দেহ হয়, মলি বানানো গল্প শোনাচ্ছে। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার, বিপজ্জনক কোনও খেলা খেলছে মলি।

কিন্তু কী সেটা?

তেরো

ক্যাটস্‌কিল, দু'নম্বর সেফ হাউস।

এখানে আসার পর তিন মিনিটও পার হয়নি, রানার পকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। ডিসপ্লের নম্বর দেখেই বোঝা গেল কে ফোন করেছে—বিখ্যাত এক রেস্তোরাঁ চেইন-এর মালিক, ওর কিউবান-আমেরিকান বন্ধু, ফার্নান্দো মরিয়েগা।

'কী খবর, ফার্নান্দো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ইকো ভিটোরির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, রানা,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল মরিয়েগা। 'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যানুয়েল জারাগোজাকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে সে—তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কথা যা বলার সামনাসামনি বসে বলবে। এখন তুমি রাজি হলেই হয়।'

রানার প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো, একজন খুনির সঙ্গে আবার কথা কী! সেটাই বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মরিয়েগা আবার বলল, 'ইকো বলছে, সে কনফেস করতে চায়। একটা আপস ফর্মুলা নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবে। জানিয়েছে বাপের পথ অনুসরণ করার কোনও ইচ্ছে তার নেই; সে বৈধ ব্যবসা করে টাকা কামাতে চায়। জারাগোজা তার কথা বিশ্বাস করছে।'

মরিয়েগার বন্ধু ম্যানুয়েল জারাগোজার সঙ্গে পরিচয় নেই রানার, তবে জানে লোকটা মাল্টি-বিলিওনেয়ার, একাধিক তেলখনি ছাড়াও সমুদ্রগামী জাহাজের বিরাট বহর আছে ভদ্রলোকের।

'কিন্তু সে খুনি, আমার এজেন্সির লোকজনকে মেরেছে,' বলল রানা। 'তার সঙ্গে কী করে আপস হয়? তোমাকে তো বলেছি, নোরা বার্নের বেডরুমে ইকোর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে।'

'ওটার, এবং তোমার অন্যান্য সব প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ইকো নাকি দিতে পারবে,' বলল মরিয়েগা। 'তোমার সঙ্গে বসার খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছে ছোকরা। বারবার বলছে, মাসুদ রানার কাছে আমি কনফেস করব।'

দু'তিন সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'কোথায়?'

'তোমাকে নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছে ইকো, বলছে: মাসুদ রানার মত স্বনামধন্য একজন মহৎপ্রাণ মানুষ বাড়িতে এসে কালেকশনগুলো দেখে গেলে তার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।'

রানার চেহারা কঠিন হয়ে উঠল, ভাবল, বিনয়ের আড়ালে শয়তানটা কী মতলব এঁটেছে কে জানে! 'নিরাপত্তার ব্যাপারটা কী হবে?' জানতে চাইল ও।

'তোমরা দুজন ছাড়া বাড়ির ভেতর বা বাইরে কেউ থাকবে না,' বলল মরিয়েগা।

'নিজের বাড়িতে কোথায় কী আছে সব জানে ইকো,' বলল রানা। 'আমি কিছুই জানি না।'

'তার বাড়ি তল্লাশি করা হয়েছে—কোনও অস্ত্র, লুকানো মাইক্রোফোন, এক্সপ্লোসিভ, রেডিয়েশন কিছুই পাওয়া যায়নি,' বলল মরিয়েগা। 'সে জানিয়েছে তুমি সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যেতে চাইলে তার কোনও আপত্তি নেই। তা ছাড়া, এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে দুজনের কারুরই আসলে ভয় পাবার কিছু নেই।'

'কী সেই ব্যবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'আমি আর ম্যানুয়েল যেহেতু নেগোশিয়েট করছি, তোমাদের দুজনের নিরাপত্তার গ্যারাণ্টিও আমরাই দেব।'

'সেটা কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'ইকোর সশস্ত্র লোকজন আমার দুই নিরস্ত্র পুত্রসন্তানকে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে জিম্মি করে রাখবে। ইকোর কিছু হলে ওদেরকে খুন করবে তারা। ঠিক

একইভাবে ম্যানুয়েলের দুই ছেলেকে পাহারা দিয়ে রাখবে তোমার সশস্ত্র এজেন্টরা, তোমার কিছু হলে ম্যানুয়েলের দুই ছেলের লাশ পড়ে থাকবে ওখানে।'

'আমরা কে কেমন আছি, ওরা কীভাবে জানবে?' প্রশ্ন করল রানা।

'দশ মিনিট পরপর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হবে তোমাদের সঙ্গে। সাড়া না পেলে আরও দশ মিনিট একটানা চেষ্টা করা হবে। একুশ মিনিটের মাথায় শুরু হবে জিম্মি হত্যা।'

'তুমি ভাবতে পারলে তোমার ছেলেদের জীবন বাজি রেখে এরকম একটা জুয়া খেলতে রাজি হব আমি?' বেসুরো গলায় প্রতিবাদ জানাল রানা। 'এটা কী ধরনের পাগলামি...'

হেসে উঠল মরিয়েগা। 'পাগলামি যদি হয়েও থাকে, সেটা আমার নয়, আমার ওই দুই ছেলের—পারলে ওদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করো।'

'মানে?'

'মায়ামি বিচের একটা রেস্তোরাঁ থেকে খাবার চুরি করার অপরাধে গণধোলাই খেয়ে মরতে বসেছিল ওদের বাপ, এই গল্পটা ওরা শুনেছে,' শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল মরিয়েগা। 'এক বিদেশী নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করে বাপকে, হাসপাতালে চিকিৎসা করায়, তারপর কিছু করে খাওয়ার জন্যে নগদ দু'হাজার ডলার দান করে।

'বাকিটা জাদুকেও হার মানায়। ওই দু'হাজার টাকা দশ বছরে কীভাবে যেন দুশ' কোটি ডলার হয়ে গেছে। এসব শুনে সেই বিদেশীর জন্যে ছেলেরা যদি কিছু করতে চায়, মানা করি কীভাবে?'

শুধু শুধু সময় নষ্ট জেনে রানা তর্ক করছে না, প্রশ্ন করল, 'কখন?'

'এখনই। তোমার এজেন্টরা ম্যানুয়েলের দুই ছেলেকে মায়ামির একটা সেফ হাউজে নিয়ে গেছে, ইকোর লোকজনও আমার ছেলে দুটোকে নিয়ে হোটেলে উঠেছে,' বলল মরিয়েগা। 'তোমাকে পিনো ডেলে নিয়ে আসার জন্যে এরইমধ্যে আমি একটা মার্সিডিজ পাঠিয়েছি... তুমি কোথায় আছ ড্রাইভার জানে না, অপেক্ষা করবে ক্যাটস্‌কিল শাখার সামনে।'

'কাছাকাছি আছি, ওখানে পৌঁছাতে মাত্র পাঁচ মিনিট লাগবে আমার,' বলল রানা।

'গুড।' হাসল মরিয়েগা। 'ড্রাইভারকে সব বলা আছে। ইকো তার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। গুডলাক, মাই ফ্রেণ্ড।'

'গুড লাক,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা, তারপর পিনো ডেলে ওর এজেন্সির যে-সব এজেন্ট কাজ করছে তাদের লিডার ফিদা মাশরাফিকে ফোন করল।

দু'মিনিট কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেল, বন্ধু ফার্নান্দো মরিয়েগা ওকে যেমন বলেছে ঠিক সেভাবেই সব আয়োজন করা হয়েছে, কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জন, অস্পষ্টতা কিংবা ত্রুটি নেই। সন্তুষ্টচিত্তে সেফ হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা।

পিনো ডেল।

বাঁক নিয়ে অভিজাত এলাকায় ঢুকল ক্রিম কালারের মার্সিডিজ। এদিকে শুধু সমাজের প্রতিষ্ঠিত আর ধনী মানুষজনের বসবাস। আলোকিত একটা গেটের সামনে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল, গেট খুলে আবার হুইলের পিছনে এসে বসল।

গাড়িপথের একপাশে কেয়ারি করা ফুলবাগান, অন্য পাশে প্রশস্ত লন। বড়সড় একটা সুইমিং পুলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিক দেবতাদের মূর্তি, স্পটলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত: প্রতিটি মূর্তির কাছাকাছি একটা করে ফোয়ারা।

গাড়ি-বারান্দায় চারটে দামি গাড়ি রয়েছে, তবে রানা খেয়াল করল ওগুলোর মধ্যে কালো মার্সিডিজটা নেই। সাদা টাইলসের সিঁড়ি। উপরে উঠছে রানা, কয়েকটা ধাপ নীচে নেমে ওকে অভ্যর্থনা জানাল ইকো ভিটোরি।

নতুন একটা বাদামী সুট পরেছে ইকো, তবে রঙটা আরও গাঢ়। চকলেট রঙের হ্যাট। পেশল হাতটা বাড়িয়ে দিল সে, এই মুহূর্তে চুইংগাম চিবাচ্ছে না। 'মিস্টার মাসুদ রানা?'

হাতটা দেখতে না পাওয়ার ভান করে আরও দু'ধাপ উঠল রানা, পর্টিকোর আলোয় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইকোর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। এরকম চোখ আগে কখনও দেখেনি ও: স্বচ্ছ হলুদাভ। পাতা দুটো বিশাল, মণি একজোড়া হলুদ বোতামের মত নির্লিপ্ত।

'ইকো ভিটোরি?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'অধমের কুঁড়েতে পায়ের ধুলো দিয়েছ, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, মিস্টার রানা,' বলল ইকো, রানার সঙ্গে পা ফেলে ধাপগুলোর মাথায় উঠে যাচ্ছে। খোলা সদর দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে নড করল। 'প্লিজ, ভেতরে ঢোকো।'

সোনালি ঝাড়বাতির সাদা আলোয় ঝলমল করছে অলঙ্কৃত লবি, অনেকগুলো ফ্লাওয়ার ভাস থেকে ভেসে আসছে তাজা গোলাপের সুবাস। সদর দরজা বন্ধ করে ঘুরল ইকো, নাক বরাবর এগিয়ে মেহগনি কাঠের আরেকটা দরজা খুলল: 'প্লিজ, মিস্টার রানা।' বোতাম টিপল, দরজার ভিতর আলো জ্বলে উঠল।

চৌকাঠ টপকে ঢুকল রানা। ওকে চমকে দেওয়া সহজ কথা নয়, অথচ কামরাটা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো, চোখ ঘুরিয়ে চারদিক দেখছে, চেহারায় বিস্ময়।

কামরা নয়, যেন একটা ইনডোর স্টেডিয়াম। রানার সামনে যতদূর চোখ যায় পালিশ করা কাঠের চকচকে মেঝের বিস্তৃতি খালি পড়ে আছে। বহুদূরে সিলিং থেকে নেমে এসেছে কালো ভেলভেট, জানালার পরদা ওগুলো।

তিনদিকের দেয়ালে কাঁচ, কাঁচের ভিতর শেলফ, প্রতিটি শেলফে দুর্লভ আর্টিফ্যাক্ট সাজানো।

এত বড় মেঝেতে ফার্নিচার বলতে একটা সাদা সেটি, দুটো লাউঞ্জ চেয়ার। জানালার পাশে একটা কুলঙ্গিতে রয়েছে গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। বেশ বড় ফায়ার-প্লেস, আগুনটা গনগনে; দু'পাশে একটা করে ছ'ফুট উঁচু কালো মোমবাতি, খুদে ইলেকট্রিক ল্যাম্প থেকে শিখা বেরুচ্ছে।

কামরার একধারে মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর লাইফ-সাইজ ভাস্কর্য, বিখ্যাত

পিয়েটা-র রেপ্লিকা। ওটাই ওঁর প্রথম মাস্টারপিস। আসলটা আছে রোমের সেইন্ট পিটার্স-এ। বিষয় হলো: কুমারী মাতা মেরির হাতে যিশুর লাশ।

'ভারি সুন্দর একটা স্কাল্পচার,' বিড়বিড় করল রানা।

'কপি করা, তবে কোনও খুঁত নেই।' পকেট থেকে চুইংগাম বের করে কাগজের আবরণ খুলে মুখে পুরল ইকো, আয়েশ করে চিবাচ্ছে। 'আমার ধারণা, তুমি আর্ট বোঝো, শিল্পের ভাল একজন সমঝদার। তবে বিশ্বাস করো, মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর এই শিল্পকর্মের বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করব, সে ধৃষ্টতা সত্যি আমার নেই।'

রানার ইচ্ছে হলো নিচু মানের চ্যালেঞ্জটা অগ্রাহ্য করে। তারপর ভাবল, জবাব পেয়ে শয়তানটা যদি সাবধান হয়, তাও মন্দ নয়। 'মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো শুধু এটাতেই নিজের নাম খোদাই করেছেন,' বলল ও। 'ভাল করে দেখলে ধরা পড়ে—ভার্জিন মেরির বুকের ওপর যে ফিতে আছে, সেখানে খোদাই করা। তবে, ইকো, আমি তোমার সঙ্গে শিল্প নিয়ে আলাপ করতে আসিনি।'

'আমি তোমার খুঁটিনাটি সম্পর্কে জ্ঞানের প্রশংসা করি, এবং তোমাকে সম্মান জানাই,' কুর্নিশ করবার ভঙ্গিতে মাথাটা একবার নুইয়ে বলল ইকো, অভব্যের মত সারাক্ষণ চোয়াল নাড়ছে। 'এসো, আগে বসো,' রানাকে একটা চেয়ার দেখাল ইকো। রানা বসবার পর দ্বিতীয় চেয়ারটায় বসল নিজে। 'বলো কী দেব? পাশের কামরায় সব রকম ড্রিঙ্ক পাওয়া যাবে। আছে ক্যাভিয়ার, পিৎজা, দুর্লভ বাদাম...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'কিছু লাগবে না।'

'এবার তা হলে বলো, ঠিক কী নিয়ে আলাপ করতে এসেছ?' জিজ্ঞেস করল ইকো।

'এই মাসের সতেরো তারিখে, রাত সাড়ে ন'টার পর, নিউজ ক্যালেন্টিং এজেন্সিতে গিয়েছিলে তুমি?'

চুইংগাম চিবানোয় একটু বিরতি দিয়ে ইকো বলল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কেন জানতে চাইছ?'

'ন'টা পঁয়তাল্লিশের দিকে?'

'হ্যাঁ।'

'প্রায় ওই সময় ওখানে সানসিটি শাখার প্রধান নাহিদ হাসান খুন হয়,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, খুনটা তুমি করেছ।'

'তোমার ধারণা নির্ভুল,' রানাকে রীতিমত চমকে দিয়ে, চুইংগাম চিবাতে চিবাতে দিব্যি খোশমেজাজে কথাটা বলল ইকো। 'আগেই তো জানিয়েছি, আমি কনফেস করতে চাই। হ্যাঁ, মিস্টার হাসানকে আমি খুন করেছি।'

'কেন?' নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখছে রানা।

'ওর ক্লায়েন্টদের ব্ল্যাকমেইল করছি আমরা, এটা জেনে ফেলে সে; বুঝতে পারি তোমাকে বলে দেবে,' বলল ইকো। 'তবে জেনে না ফেললেও ওকে আমার খুন করতে হত, হয়তো আরও কিছুদিন পরে।'

'কেন?' জানতে চাইল রানা।

ইকোর হলুদ চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। 'যৌথবাহিনী ড্যাডিকে খুন

করেছে, কেড়ে নিয়েছে আমাদের সাম্রাজ্য—ওদেরকে সাহায্য করেছে ওই নাহিদ।'

'এ তথ্য তোমার জানার কথা নয়।'

'পুলিশ জানে না?' বলে মুচকি হাসল ইকো।

'যৌথবাহিনীকে আমিও সাহায্য করেছি,' কঠিন সুরে কথাটা বলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা।

শ্রাগ করল ইকো। 'তোমাকেও সরিয়ে দেয়া হবে, যদি না আমরা দুজন কোনও আপস রফায় পৌঁছাতে পারি।'

'ব্ল্যাকমেইল সম্পর্কে নাহিদ কিছু জানত না,' বলল রানা, 'অথচ টাকা চেয়ে লেখা চিঠিগুলোয় ওর সই থাকে কীভাবে?'

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' হাসল ইকো। 'ওর সই নকল করেছি আমরা।'

'আর নোরাকে লেখা প্রেমপত্রে ওর যে সই আছে...'

রানাকে শেষ করতে না দিয়ে সহাস্যে ইকো বলল, 'ওগুলোও নকল। নাহিদ নোরাকে কখনও কিছু লেখেনি।'

'ব্যাঙ্কের ডিপোজিট বক্সে একলাখ ডলার রেখেছে, জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেছে, নাহিদ এত টাকা পেল কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'ওগুলোও আমাদের কীর্তি,' স্বীকার করল ইকো। 'ওর নামে আমরাই ব্যাঙ্কের ডিপোজিট বক্সে টাকা রাখি, ওর নামে জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে দিই।'

'কেন?'

'পুলিশ যাতে সহজেই বুঝতে পারে নাহিদই সানসিটি শাখার ক্লায়েন্টদের ব্ল্যাকমেইল করছে—জ্ঞাত আয়ের চেয়ে কয়েকশ' গুণ বেশি কামাচ্ছে।'

'এই ব্ল্যাকমেইলিং র‍্যাকেটে তোমার সঙ্গে আর কে আছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল ইকো। 'এ-প্রসঙ্গে পরে কথা বলব আমরা।'

তবে এই ষড়যন্ত্রে কে তার সহযোগী, এখন তা রানা পরিষ্কার আন্দাজ করতে পারছে। 'নোরাকে খুন করলে কেন?' জানতে চাইল রানা।

আবার কাঁধ ঝাঁকাল ইকো। 'সে-ও নাহিদের মত সাহায্য করেছিল যৌথবাহিনীকে।'

'আগের ফ্ল্যাট ছেড়ে হঠাৎ নতুন ফ্ল্যাটে কেন উঠে গেল নোরা?'

'আমাকে একদিন দেখে ফেলল সে,' হাসিমুখে বলল ইকো। 'দেখেই বুঝতে পারল প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসেছে ডন ডিকোর ছেলে। কী করা উচিত, বুদ্ধি চাইল এক বন্ধুর কাছে। বন্ধু ওকে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যেতে বলল, কাউকে ঠিকানা জানাতে নিষেধ করল। বেচারি নোরা জানত না যার কাছে বুদ্ধি চেয়েছে সে-ই আমার পার্টনার।'

'মেয়েটার পরিচয়?' জানতে চাইল রানা।

হেসে উঠল ইকো, বলল, 'কী করে জানলে সে একটা মেয়ে?'

'তা না হলে কী মার্টিন ক্রোকে খুন করার সময় তাকে তুমি পাশের সিটে

বসিয়ে রাখতে?'

'হুম,' বলে চুপ করে থাকল ইকো, যেন বোঝাতে চাইল রানার ধারণা মিথ্যে নয়।

'তবে জানা কথা তাকেও তুমি বাঁচিয়ে রাখবে না, কী বলো?'

'সত্যি কথা বলতে কী, সেটা এখনই আমি বলতে পারছি না।' হাসছে ইকো।

'সেক্ষেত্রে, হোক তোমার পার্টনার, আমাদের আরও একজনকে খুন করার অপরাধ করবে তুমি; এবং তার শাস্তিও তোমাকে পেতে হবে।'

'আন্দাজে একটা করে ঢিল ছুঁড়ছ, সেটা লেগেও যাচ্ছে, বাহ্!' নিঃশব্দে তালি দিল ইকো। 'তবে শাস্তি না কী যেন বললে?'

'নিরীহ ক্লায়েন্টদের খুন করছ কেন?' প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটাই কারণ, রানা এজেন্সির গুডউইল ধ্বংস করা,' বলল ইকো। 'যে প্রতিষ্ঠান নিজের ক্লায়েন্টকে ব্ল্যাকমেইল করে, তাদেরকে খুন করে—পুলিশ আর মিডিয়া তাদের সম্পর্কে কী রায় দেবে জানা কথা।'

এই সময় রানার পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ফিদা মাশরাফির গলা চিনতে পেরে ও শুধু বলল, 'সব ঠিক আছে।'

এক মিনিট পর ইকোর ফোনটাও বাজল। সে বলল, 'কোনও সমস্যা নেই।'

'যা জানার ছিল তা আমার জানা হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'আমাকে বলা হয়েছে, তোমার নাকি একটা আপস ফর্মুলা আছে, কিন্তু সেটা এখন আর শোনার আগ্রহ নেই আমার।'

চুইংগাম চিবানো বন্ধ হয়ে গেল ইকো ভিটোরির। 'আগ্রহ নেই?' যেন খুব অবাক হয়েছে। 'কেন?'

রানা বলল, 'কনফেস করবে শুনে আমি ভেবেছিলাম নিজের অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইবে তুমি, আমাদের নির্ধারিত অঙ্কে ক্ষতিপূরণ দেবে, তারপর চব্বিশঘণ্টার মধ্যে ফ্লোরিডা রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তুমি আসলে নিজের দম্ভ দেখানোর জন্যে আমাকে ডেকেছ।'

'তোমার পর্যবেক্ষণ নির্ভুল,' বলল ইকো, চোখে-মুখে শান্ত গাম্ভীর্য। 'খুনের কথা গর্বের সঙ্গে স্বীকার করছি আমি। এ থেকে আমার সততার একটা দিক সম্পর্কে তুমি অবহিত হলে।'

'তুমি ইডিয়টের মত কথা বলছ।'

'ইজরায়েলিরা যেমন হাজার বছর আগে ছেড়ে যাওয়া জন্মভূমি ফেরত পাবার জন্যে ফিলিস্তিনিদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের জমি দখল করে নিয়েছে,' বলল ইকো, রানার কথায় কান দিচ্ছে না, 'আমিও তেমনি দেড় বছর পর ফ্লোরিডা থেকে রানা এজেন্সির সব শাখা উৎখাত করে প্রতিশোধ নিতে এসেছি, এসেছি নিজেদের সাম্রাজ্য ফিরে পেতে। এটাই আমার আপস রফার ফর্মুলা, মিস্টার রানা। নিজের ভাল চাও তো ব্যবসা গুটিয়ে ফ্লোরিডা থেকে কেটে পড়ো। বিনিময়ে কী চাও বলো, আমি ক্ষতিপূরণ করতে রাজি আছি—যদি তা যুক্তিসঙ্গত হয়। প্রতি শাখার জন্যে তিন কি চার মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত দিতে রাজি আছি...'

'তুমি প্রলাপ বকছ,' বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা।

'এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে?' হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল ইকো। 'কিন্তু আমি তোমাকে কিছু অফার করতে চাই যে?'

কথা না বলে ইকোর দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল রানা।

'সেটা হলো, আমি কিছু ইনফরমেশন বিক্রি করব,' বলল ইকো। 'যদি তুমি কিনতে চাও আর কী।'

অপেক্ষা করছে রানা।

'তুমি তো জানোই, তোমার অপারেটদের মধ্যে অনেককেই আমি দলে ভিড়িয়েছি—কাউকে সরাসরি, কাউকে তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে। খানিক আগে তুমি তাদের পরিচয় জানতে চাইছিলে।'

এখনও কিছু বলছে না রানা।

'খুব কম খরচে ওদের নামের একটা তালিকা পেতে পার তুমি,' বলল ইকো। 'নগদ মাত্র দুই মিলিয়ন ডলারে।'

'ওই তালিকা আমার দরকার নেই,' বলল রানা। 'আমি তোমার বেঈমানীর কথা ভাবছি—তোমাকে যারা সাহায্য করল এভাবে তাদের মুখোশ খুলে দেবে?'

'আমি আমার নিজের মুখোশ খুলছি না? কনফেস করছি না?' হাসছে ইকো। 'তুমি যদি ওদের একটা ব্যবস্থা না করো...'

'আমার আগ্রহ নেই,' বলল রানা।

শ্রাগ করল ইকো, কিছু বলল না।

'আমাকে পথ দেখাতে হবে না, নিজেই চিনে নিতে পারব,' বলল রানা। 'যাবার আগে একটা কথা।'

'হ্যাঁ, বলো, তোমার অমৃতবচন না শুনে কী পারি!' নতুন একটা চুইংগাম বের করে কাগজ ছাড়াল ইকো।

'চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিলাম,' বলল রানা। 'এই বাড়ি থেকে একশ' মাইল পরিধির মধ্যে কোথাও যেন তোমাকে দেখা না যায়।'

'আচ্ছা?' তীব্র বিদ্রূপাত্মক সুরে বলল ইকো। 'আমাকে তুমি পালাতে বলছ, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা এমন অটল, যেন পাথরের একটা মূর্তি।

হেসে উঠল ইকো। 'কিন্তু আমি তো পালাবার জন্যে এখানে আসিনি, মিস্টার রানা।'

'জানি। আমার হাতে মরতে এসেছ,' বলে ইকোর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল রানা।

চোদ্দো

'অ্যাই, কী হয়েছে?' আবার প্রশ্ন করল মেয়েটা, হেলান দিল দরজার চৌকাঠে,

ভাবটা এমন যেন নিজের নগ্নতা সম্পর্কে ওর কোনও ধারণাই নেই। 'আগুনটা বাড়িতে লেগেছে, নাকি একা শুধু তোমার গায়ে, হ্যাণ্ডসাম?'

পায়ের আওয়াজ এখন আরও কাছে, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। পাঁচতলায় উঠছে লোক দুজন। ব্যাখ্যা করবার সময় নেই। এই পোশাকে কোনও মেয়েকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা যায় না, তবে মাথা থেকে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলল জিসান। লোক দুজন ওদের দেখে ফেলার আগেই মেয়েটাকে নিয়ে এলিভেটরে ঢুকে পড়তে হবে। জানে, সময় পাবে পাঁচ কি ছয় সেকেণ্ড।

'তোমাকে সাহায্য করছি,' বলে মেয়েটার হাত ধরে টান দিল জিসান।

কিন্তু দরজার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরল মেয়েটা, হাঁটু বাধাল দরজার ভিতরের দেয়ালে, টানা-হ্যাঁচড়া করেও এতটুকু নড়ানো যাচ্ছে না। 'কী ভেবেছ আমাকে তুমি, হ্যাঁ?' প্রশ্নটা করে হি-হি করে হাসল।

এই সময় প্রায় চমকে উঠে উপলব্ধি করল জিসান, নেশা করে মাতাল হয়ে আছে মেয়েটা। কী নেশা করেছে বলা মুশকিল; গাঁজা, মদ, আফিম ছাড়াও অচেনা সব গন্ধ এসে লাগছে নাকে।

জিসানের বিস্ময়ের সুযোগ নিয়ে হ্যাঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত করল টোপাজ। 'ধীরে, হ্যাণ্ডসাম, ধীরে,' বলল ও, টলে উঠল একবার। 'ভুলে গেছ, এটা একুশ শতক?'

'ফর গড'স সেক, কী বলছি শোনো!' হিসহিস করে উঠল জিসান। 'দুজন লোক তোমার ক্ষতি করতে আসছে! বাঁচার একটাই উপায়, আমার সঙ্গে পালানো!'

'আরও দুজন? ওদের সবাইকে আসতে দাও! ওদের সঙ্গে তুমিও এসো। জমজমাট একটা পার্টি হয়ে যাক!'

হাত বাড়িয়ে আবার টোপাজকে ধরতে গেল জিসান, কিন্তু লাফ দিয়ে ওর নাগালের বাইরে সরে গেল মেয়েটা, চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর।

ঘুরে বলল, 'কী হলো, তুমি প্রথম সুযোগ নিতে চাও না? তা হলে এসো!'

মুখ বেয়ে ঘামের ধারা নেমে আসছে, দরজার দিকে পা বাড়াল জিসান।

'এই যে, তুমি, শোনো!'

ডাকটা শোনার জন্য কান খাড়া করে রেখেছিল জিসান। চোখের কোণ দিয়ে দেখল দাগী লোকটা সিঁড়ির মাথায় উঠে এল। তার পিছনে আরেক লোকের আভাস পেল—অত লম্বা নয়, তবে স্বাস্থ্য খুব ভাল।

অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর ঢুকে পড়ল জিসান। দড়াম করে বন্ধ করল কবাট, তারপর লক করে দিল। নীচে-উপরে একটা করে দুটো বোল্ট দরজায়, দুটোই লাগিয়ে দিল।

'ভুল করছ, হে! তোমাকে একা আমি কোনও সময় দেব না,' বলল টোপাজ। 'আমি আমুদে মেয়ে, হইচই পছন্দ করি...দরজা খুলে ওদেরকেও ডাকো!'

'চুপ!' ধমকে উঠল জিসান। 'বোকার মত কথা বলছ তুমি! ওরা তোমাকে...'

'কাকে তুমি বোকা বলছ, অ্যাঁ?' তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'আমার

পথ থেকে সরে যাও!'

'কী বলছি শুনবে না...?'

'ঠিক আছে, আমিই ওদের ভেতরে ডাকছি!' ওকে পাশ কাটিয়ে এগোল মেয়েটা, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলার আগেই দরজার উপরের বোল্ট খুলে ফেলল।

এই সময় খুব জোরে নক হলো দরজায়।

'আমাকে খামচাবে না!' চেঁচিয়ে উঠে জিসানের কাছ থেকে সরে গেল মেয়েটা।

'লোক দুজন তোমাকে খুন করতে এসেছে, বুঝতে পারছ না?' খেঁকিয়ে উঠল জিসান, দরজার দিকে এগোতে বাধা দিল টোপাজকে। ওর কাঁধ ধরে বার কয়েক ঝাঁকাল। 'ওরাই তো তোমার কাছ থেকে...' চোখে থাপ্পড় খেয়ে গুঙিয়ে উঠল ও, মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেছে।

এই সুযোগে দরজার নীচের বোল্টও খুলে ফেলল টোপাজ, এবার হাত বাড়াচ্ছে কী হোলে ঢোকানো চাবির দিকে। চোখ থেকে হাত নামিয়ে ওকে ধরল জিসান, টান দিয়ে সরিয়ে এনে একটা আর্মচেয়ারে বসিয়ে দিল।

পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে দরজার কাছে ফিরে গেল জিসান, আবার লাগিয়ে দিল বোল্ট দুটো—অনুভব করল কপাটে কী যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত করল, সম্ভবত কারও ভারী কাঁধ।

দরজাটা ঝাঁকি খেলেও, ভেঙে পড়ল না। তবে ওই ধকল বেশিক্ষণ সইতেও পারবে না।

চেয়ার থেকে উঠে মারমুখো হয়ে জিসানের দিকে ছুটে এল টোপাজ, ওর বুকে অবিরাম কিল-ঘুসি মারল। কবজি দুটো ধরে নিজের বুকের উপর টেনে আনল জিসান, বলল, 'ওরাই তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে, বোকা মেয়ে!'

বললে কী হবে, নেশা করায় টোপাজের মাথায় কিছু ঢুকছে না। জিসানের হাঁটুর নীচে লাথি মারল ও, হাতের কিনারা চালাল থুতনির তলা লক্ষ্য করে।

দু'হাত দিয়ে ধরে শূন্যে তুলল ওকে জিসান, আরেক দরজার দিকে ছুটে গেল। বেরুল একটা প্যাসেজে। দু'পাশে অন্ধকার কয়েকটা কামরা, কোনওটার সামনেই থামল না ও। প্যাসেজের শেষ মাথায় আলোকিত দরজা দেখা যাচ্ছে।

ওই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল জিসান। বেশ বড়সড়, সাজানো গোছানো একটা কামরা, সম্ভবত গেস্টরুম হবে। বিছানাটা জানালার নীচে। দেয়ালের একদিকে ভারী ওয়ার্ড্রোব, উল্টোদিকে ড্রেসিং টেবিল। মেয়েটাকে বিছানায় নামাল ও, ছুটে গিয়ে বন্ধ করল দরজা, চাবি ঘোরাল, কী হোল থেকে বের করে নিল ওটা।

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে মেঝেতে নামল মেয়েটা, আবার ছুটে যাচ্ছে জিসানের দিকে, চোখ দুটো থেকে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে।

কুঁজো হলো জিসান, দু'হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে আবার মেয়েটাকে শূন্যে তুলল, খাটের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিছানার উপর আছড়ে ফেলল—এত জোরে, ধরে না রাখলে ফুটবলের মত ড্রপ খেয়ে পড়ে যেত মেঝেতে।

দম ফুরিয়ে যাওয়ায় হাঁপাচ্ছে মেয়েটা, নড়াচড়ার শক্তি নেই, এই ফাঁকে

ওয়ার্ড্রোবটা টেনে দরজার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জিসান। এত ভারী, প্রতিবারের চেষ্টায় এক ইঞ্চির বেশি নড়ানো যাচ্ছে না। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে ও।

'কোন্ সাহসে আমার ফার্নিচারে তুমি হাত দিয়েছ!' বিছানা থেকে বলল টোপাজ। 'থামো বলছি!'

ওর কথায় জিসান কান দিচ্ছে না। ওয়ার্ড্রোবে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলছে, দরজা গায়ে ওটাকে নিয়ে যেতে এই শীতে ঘাম ছুটে গেল ওর। কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার সময় পাওয়া গেল না, প্যাসেজ থেকে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ভেসে এল।

জিসান ভাবল, দরজা ভেঙে ফ্ল্যাটের ভিতর ঢুকতে পারলেও, গেস্টরুমের দরজা ভাঙা সহজ হবে না। ওয়ার্ড্রোব খুলে একটা দামি ফার কোট বের করে ছুঁড়ে দিল মেয়েটার দিকে। 'জলদি, এটা পরে নাও!'

'আমার বাড়ি থেকে বেরোও তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, কোটটা ছুঁড়ে দিল মেঝেতে।

ওকে ধরে মেঝেতে দাঁড় করাল জিসান। একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'চড়িয়ে সবগুলো দাঁত ফেলে দিতে পারি, তা জানো? ওরা তোমাকে করতে এসেছে, এই সহজ কথাটা মাথায় ঢুকছে না? তাড়াতাড়ি পরে নাও তোমাকে আমি সেফ হাউজে নিয়ে যাচ্ছি।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! হিংস্র বাঘিনীর মত জিসানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টোপাজ, লম্বা নখগুলো ওর চোখে ঢোকাতে চেষ্টা করছে।

এবার সত্যি খেপে গেল জিসান। দরজার বাইরে পৌঁছে গেছে সাক্ষাৎ যম, এখন প্রতিটি সেকেণ্ড অমূল্য। কিছু বোঝার আগেই দড়াম করে টোপাজের চোয়ালে একটা ঘুসি মারল ও।

কোটরের ভিতর উল্টে গেল টোপাজের চোখ, ভাঁজ হলো দুই হাঁটু, পড়ল ওর বাড়ানো বাহুর মধ্যে। অজ্ঞান দেহটাকে বিছানায় শুইয়ে ফার কোট পরাল জিসান, তারপর ছুটে গিয়ে জানালার কবাট খুলল। ফায়ার এস্কেপ প্ল্যাটফর্ম মাত্র কয়েক ফুট নীচে, দেখতে পেয়ে বিরাট স্বস্তি বোধ করল ও।

'শালা বানচোতটা জানালা দিয়ে পালাচ্ছে,' দাগী লোকটার কণ্ঠস্বর চিনে পারল জিসান। 'আমি নীচে যাচ্ছি, তুমি দরজাটা ভাঙতে পার কি না দেখো

এতটুকু ইতস্তত না করে নিজের কাজ করে যাচ্ছে জিসান। জানে নামতে ওই লোকেরও কম সময় লাগবে না। তারপর তাকে দালানটার পিছনে পৌঁছাতে হবে। কঠিন প্রতিযোগিতা, তবে এই ফাঁদে আটকে থাকার চেয়ে ভাল

টোপাজকে পাঁজাকোলা করে ধরল জিসান, জানালা দিয়ে বের প্ল্যাটফর্মে নামাল, তারপর নিজেও বেরিয়ে এল—ঠিক এই সময় পিছন ভেসে এল দরজায় চিড় ধরার শব্দ।

ফায়ার এস্কেপের নীচে অন্ধকার গলি। কিছু নড়ছে না। উঁচু পাঁচিলের মাথা আরও গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে, ওটা ছাড়া কিছু দেখাও যাচ্ছে টোপাজকে কাঁধে তুলে নিয়ে লোহার ধাপ বেয়ে সাবধানে নামতে শুরু করল জিসান।

মেয়েটা হালকা নয়, জিসানের পা কাঁপছে। তবে কোনও বিপদ ছাড়াই

কাঁধের বোঝা নিয়ে নীচে নেমে এল ও।

ডানে-বাঁয়ে তাকাল। কোনও দিকে আলো নেই। ডান দিকে এগোল। মাত্র কয়েক ফুট গেছে, পিছনে শব্দ হতে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল জিসান।

বেশ কিছুটা দূরে একটা দরজা খুলে গেছে, সেটার ভিতর থেকে খানিকটা আলো এসে পড়েছে গলিতে। সেই আলোয় নিঃশব্দে বেরিয়ে এল লম্বা-চওড়া এক লোক। আকৃতিটা দেখেই দাগী, একচোখো লোকটাকে চিনতে পারল জিসান।

আবার ঘুরে নিজের পথে এগোল ও, কোনও শব্দ করছে না।

দাগী লোকটা কান পাতল, ডানে-বাঁয়ে তাকাল, আন্দাজ করবার চেষ্টা করছে কোন্‌দিকে গেছে জিসান।

সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, খুব সাবধানে এগোচ্ছে জিসান, লোকটাকে এদিকে রওনা হতে দেখামাত্র খিঁচে দৌড় দেবে।

হঠাৎ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই, ধাক্কা খেল একটা দেয়ালে। ঝাঁকি লাগায় কাঁধ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করল টোপাজ। কোনও রকমে তাল সামলে প্লাস্টার-না-করা ইঁটের গাঁথুনির উপর হাত বুলাল জিসান।

সর্বনাশ, এটা একটা কানাগলি! গলির উল্টোদিকে চলে এসে ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে!

খালি কাঁধটা দেয়ালে ঠেকিয়ে হাঁপাচ্ছে জিসান। ফেলে আসা অন্ধকার গলি বরাবর তাকাল, বুকের ভিতরটা ধক ধক করছে। খোলা দরজা থেকে বেরিয়ে আসা আলোটা দেখছে। ওই আলোয় দাঁড়িয়ে এদিকে তাকাল দাগী লোকটা, তারপর ওর দিকে হাঁটতে শুরু করল, হাতে পিস্তল।

যানবাহনের আওয়াজ শুনে জিসান বুঝল মেইন রোড এখান থেকে বেশি দূরে নয়, আন্দাজ করল বামদিকে হাঁটা ধরলে এতক্ষণে সাউথ স্ট্রিটে পৌঁছে যেত, তারপর মেইন রোডে উঠতে দু'মিনিটের বেশি লাগত না।

টোপাজকে ধীরে ধীরে কাঁধ থেকে গলির মেঝেতে নামাল, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে রেখে লোকটার দিকে নিঃশব্দ পায়ে এগোল। জানে, লোকটা ওকে দেখতে পাচ্ছে না। ও যে এদিকে এসেছে, এটাও তার ধারণা মাত্র।

মেয়েটাকে প্রায় বিশ গজ পিছনে ফেলে এসে বাম দিকের পাঁচিল ঘেঁষে থামল জিসান। কিছু সন্দেহ না করলেও, সাবধানে এগোচ্ছে লোকটা।

আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে, তার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ পাচ্ছে জিসান, সুগন্ধি তেলের বিচ্ছিরি ঝাঁঝ পাচ্ছে নাকে। ঝুলে থাকা ছায়াটা এক কি দেড় ফুট দূর দিয়ে পাশ কাটাচ্ছে, ওকে দেখতে পাচ্ছে না, জানে না তার জন্য ফাঁদ পাতা আছে।

অকস্মাৎ ছায়াটার চওড়া পিঠ লক্ষ্য করে লাফ দিল জিসান। হোঁচট খেল লোকটা, গুঙিয়ে ওঠার আওয়াজ বেরুল গলা থেকে, আঙুলে ঢিল পড়ায় খসে পড়ল পিস্তল।

হাতের ভাঁজে তার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে জিসান, জানে দু'তিন মিনিট এভাবে ঝুলে থাকতে পারলে জ্ঞান হারাবে দানবটা।

কিন্তু এ যেন উন্মত্ত বিড়ালকে ধরে রাখার চেষ্টা। দেয়ালে ধাক্কা খেল লোকটা... একবার, দু'বার... পিঠে ঝুলে থাকা জিসানকে থেঁতলাচ্ছে। জিসানের মনে হলো ওর পাঁজরের সব হাড় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, ফুসফুসে বাতাস বলতে কিছু নেই। তারপরেও শত্রুর পিঠ ছেড়ে নামছে না, বরং গলায় চাপ আরও বাড়াচ্ছে।

দম আটকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠল লোকটা, কাঁধের উপর দিয়ে হাত তুলে জিসানের চোখে আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করল। বিপদ টের পেয়ে মুখটা আরেক কাঁধে গুঁজল জিসান, শরীরটাকে সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে প্রতিপক্ষকে হাঁটু গাড়তে বাধ্য করল।

গলির মেঝেতে পা রাখতে পারায় গলা পেঁচানো হাতে অতিরিক্ত জোর পেল জিসান, চাপ আরও বাড়াল।

হঠাৎ করেই অসাড় হয়ে গেল লোকটা, নেতিয়ে পড়ল একপাশে। আরও একমিনিট পর গলা ছেড়ে সিধে হলো জিসান, পালস পরীক্ষা করল। নেই। গলি বরাবর তাকিয়ে ভাবল মোটা লোকটাও এদিকে আসবে কি না।

গলির মেঝে হাতড়ে পিস্তলটা খুঁজে নিল, তারপর দ্রুতপায়ে মেয়েটার দিকে এগোল। ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে আলোকিত দোরগোড়ার দিকে হাঁটছে। ওর একটা হাত মেয়েটার হাঁটুর পিছনে, অপর হাতে পিস্তল।

খোলা দরজার ভিতরে খালি প্যাসেজ। সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে জিসান। অন্ধকার গলি থেকে ফাঁকা আরেকটা গলিতে বেরিয়ে এল। বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে ভাবছে সাউথ স্ট্রিটে ঢোকার পর কেউ যদি এই অবস্থায় দেখে ওকে, কী ভাববে? কিংবা যদি পুলিশের সামনে পড়ে যায়?

সাউথ স্ট্রিটকে পাশ কাটিয়ে এল জিসান। মেইন রোডের মুখে এসে টোপাজকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসাল। এবার একটা ট্যাক্সি পেলেই হয়। তা পেতে হলে কিছুটা এগিয়ে মেইন রোডে দাঁড়াতে হবে। সেদিকে এগোবে, এই সময় ওর ট্রাউজারে টান পড়ল। 'অ্যাই, হ্যাণ্ডসাম, আমাকে একা ফেলে পালাচ্ছ কেন? তোমার সঙ্গে এই কথা ছিল আমার?'

'আহ্, ট্রাউজার ছাড়ো!' বলল জিসান, কাঁধ ধরে দাঁড় করাল টোপাজকে। 'এসো, একটু এগোলেই ট্যাক্সি পাব।'

পনেরো

রাত ন'টা।

ক্যাটস্‌কিলের দু'নম্বর সেফ হাউজে পৌঁছে রানা দেখল এজেন্সির একজন ডাক্তার ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে টোপাজকে, বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে সারাক্ষণ মেয়েটার উপর নজর রাখছে নার্স।

বেডরুমের বাইরে ওর অপেক্ষায় পায়চারি করছে জিসান।

ওকে নিয়ে সিটিং রুমে বসল রানা।

মাত্র দু'কথায় রিপোর্ট শেষ করল জিসান: 'দাগী লোকটা সম্ভবত মারা গেছে মাসুদ ভাই। তবে তার সঙ্গী ছাড়া আমাকে কেউ দেখেনি।'

পিনো ডেলে ইকো ভিটোরির সঙ্গে কী কথা হয়েছে সংক্ষেপে জিসানকে জানাল রানা, তারপর বলল, 'ওখান থেকে এখানে আসার পথে টিসার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ইকোর সঙ্গে কথা বলে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে—ওর পার্টনার হিসেবে কাজ করছে টিসা। কিন্তু পাইনি ওকে। খালি বাড়ি পাহারা দিচ্ছে তোমার গার্ডরা। কীভাবে যেন ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেছে—সেটা গতকালও হতে পারে। ওর মোবাইল বন্ধ।'

'পুলিশকে রিপোর্ট করা উচিত না, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল জিসান।

'লেফটেন্যান্ট মার্লিকে জানিয়েছি,' বলল রানা। 'টহল পুলিশের সবগুলো ইউনিটকে অ্যালার্ট করেছে সে।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। 'আমি ভয় পাচ্ছি, টিসাকে খুন করেছে ইকো। এখনও যদি না-ও করে থাকে, এবার করবে।'

'এই জন্যে যে টিসাকে তার আর প্রয়োজন নেই?' জানতে চাইল জিসান।

'হ্যাঁ।'

'রানা এজেন্সির সঙ্গে এতবড় বেঈমানী টিসা করল কেন, মাসুদ ভাই?' মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে জিসান। 'তা ছাড়া, যাকে এত ভালবেসে বিয়ে করেছিল তাকেই বা কীভাবে খুন হতে দিল?'

'এর উত্তর আমারও জানা নেই, জিসান,' বলল রানা। 'ইকো হয়তো ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। কিংবা হয়তো টাকার লোভ সামলাতে পারেনি।'

'পুলিশ জানে, ইকোর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?'

'আমি না বললেও জানে ওরা, অন্তত কমিশনার তো জানেই,' বলল রানা।

'চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে কাজ হবে?' জিজ্ঞেস করল জিসান।

মাথা নাড়ল রানা। 'না। তবে এখন থেকে ইকোর প্রতিটি নড়াচড়া মনিটর করব আমরা। তুমি আজ সারারাত ওর বাড়ির ওপর নজর রাখো। যদি দেখো বেরুচ্ছে, জানাবে আমাকে। ফোন করে মাশরাফিকে ডেকে নিয়ো।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

একটা ফোন পেয়ে খুশি হয়ে উঠল ইকো ভিটোরি। এরকম একটা খবরের জন্যই অপেক্ষা করছিল সে।

যোগাযোগ কেটে দিয়ে নিজেও একটা ফোন করল। তারপর বাইরে বেরুবার জন্য স্লিপিং গাউন পাল্টে সুট পরল। জানে বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তাই সুটের উপর একটা রেইনকোট চাপাল, হেড-গিয়ার দিয়ে ঢেকে নিল মাথাটা, তাতে মুখেরও অনেকটা ঢাকা পড়ল।

কাপড় পাল্টানোর পর আর কোনও জানালার সামনে ভুলেও যাচ্ছে না ইকো; কেউ যদি ওর ওপর নজর রাখে সে জানুক এখনও স্লিপিং গাউনই পরে আছে সে।

অভিজাত এলাকা, বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াবার কোনও জায়গা না পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে এলাকার পানির ট্যাঙ্কের মাথায় উঠে পড়েছে জিসান, চোখে নাইট গ্লাস এঁটে ইকো ভিটোরির বিশাল বাগানবাড়ির উপর নজর রাখছে।

ওর পজিশনটা উঁচু জায়গায় হওয়ায় বাড়িটার গাড়ি-বারান্দা, সদর দরজা, ছাদ, পিছনের খোলা মাঠ, অলোকিত কয়েকটা জানালা, মাঝে-মধ্যে জানালার ভিতর স্লিপিং গাউন পরা ইকোর হাঁটাচলা—সবই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে জিসান। শুধু দূরত্ব খুব বেশি হওয়ায় ইকোর মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

রাত ঠিক সাড়ে ন'টায় গেট দিয়ে বাগানবাড়িতে একটা পাজেরো জিপ ঢুকল। গাড়ি-বারান্দায় থামল ওটা, নীচে নামল দীর্ঘদেহী এক তরুণ, বগলের তলায় কাগজে মোড়া একটা জিনিস—আকৃতি দেখে জিসানের মনে হলো, কোনও পেইন্টিং হতে পারে।

সদর দরজা খোলাই ছিল, ভিতরে ঢুকে আগন্তুক নিজেই ওটা বন্ধ করে দিল। হাতঘড়ির উপর চোখ রেখেছে জিসান, দেখল বাড়ির ভিতর মাত্র তিন মিনিট থাকল লোকটা, দরজা খুলে আবার বেরিয়ে এসে পাজেরোয় চড়ে চলে গেল।

জিসানের জানা হলো না তিন মিনিট আগে যে লোক বাড়িতে ঢুকেছিল সে বেরোয়নি, বেরিয়েছে হুবহু তার মত কাপড়চোপড় পরা অন্য লোক—ইকো ভিটোরি।

একটু পর দোতলার জানালার ভিতর স্লিপিং গাউন পরা এক লোককে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দেখল, এত দূর থেকে তাকে ওর ইকো বলে মনে না হওয়ার কোনও কারণ নেই।

বালিশ থেকে মাথা তুলে বেডসাইড টেবিলের দিকে তাকাল মলি, চোখে ঘুম ঘুম ভাব, দেখল ছোট্ট টেবিল ক্লকে রাত সাড়ে দশটা বাজে।

'সময় শেষ? এক্ষুনি?' জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল লরেন্স সাইমন, কাছে টানল মলিকে। প্রেম করবার পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কয়েক মিনিটের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা।

'না। আরও আধঘণ্টা থাকা যায়।' দীর্ঘশ্বাস চাপল মলি। 'আমার তো তোমাকে ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে করে না।' সাইমনের নগ্ন বুকে হাত বুলাচ্ছে। 'সময় কীভাবে যে ফুরিয়ে যায়!'

'কত প্রস্তাবই তো দিলাম, তুমি একটাতেও রাজি হচ্ছ না,' একটু অভিমানের সুরে বলল সাইমন। 'আজ আরেকটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। শুনবে?'

'কেন শুনব না, ডার্লিং। শুধু মাসুদ ভাই আঘাত পাবেন এমন কিছু আমাকে তুমি করতে বোলো না,' বলল মলি। 'অনেক কথাই ওঁকে আমরা জানাইনি, সেজন্যে অপরাধ বোধে দগ্ধ হচ্ছি—আল্লার কিরে বলছি, কখন না সব গড়গড় করে বলে ফেলি।'

'বসকে আঘাত লাগে, এমন কিছু আমিও করতে চাই না,' বলল সাইমন। 'কিন্তু নিজের জন্যে কিছু অর্জন করার অধিকার আমাদের সবারই আছে, তাই না?'

'আমার ডার্লিং কী অর্জন করতে চায় গো?' আদুরে গলায় বলল মলি, একটা চুমো খেল সাইমনকে।

'আচ্ছা, কেমন হয় আমরা দুজন যদি একটা গোয়েন্দা অফিস খুলি?' বলল সাইমন। 'আমাদের যে অভিজ্ঞতা, ক্লায়েন্ট পেতে কোনও সমস্যা হবে না। স্বাধীন

ব্যবসার মজাই আলাদা।'

'ওরকম চিন্তা আমার মাথায় যে আসেনি, তা নয়,' ধীরে ধীরে বলল মলি। 'কিন্তু গুডউইল তৈরি করতে না পারলে এই ব্যবসা চলবে না...'

'কী হলো, থামলে কেন?' জিজ্ঞেস করল সাইমন, চিৎ হয়ে মলির দিকে তাকাল।

'কী...ওটা?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল মলি, সাইমনের কানে ঠোঁট ঠেকে আছে।

'কোথায়?'

'কী যেন শুনেছি,' বলল মলি, বিছানার উপর উঠে বসল।

ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে, তার আভায় সাইমন দেখল ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মলির চেহারা। 'কী?' ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে, সে-ও উঠে বসল বিছানায়।

'পাশের কামরায় কে যেন আছে,' ফিসফিস করল মলি।

'তা সম্ভব নয়,' বলল সাইমন, কিন্তু মুখে যা-ই বলুক, হঠাৎ করে অসুস্থ বোধ করছে। 'দরজায় তালা দেয়া। ও তোমার কল্পনা।'

'না। কেউ আছে ওখানে,' বলল মলি, একটা পা মেঝেতে নামিয়ে চেয়ারে স্তূপ করা কাপড়চোপড়ের তলায় হাত গলিয়ে দিল—যেখানে পিস্তলটা রেখেছে।

ওটা খুঁজে পেতে মলির দেরি হচ্ছে দেখে নার্ভাস হয়ে পড়ল সাইমন, ঝট করে নিজের বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে হাতড়াচ্ছে।

হাতে কিছু না ঠেকায় আতঙ্কিত বোধ করল সাইমন। 'পিস্তলটা নেই!' বিকৃত গলায় বলল ও। বিছানা থেকে ঝুঁকে চেয়ারে খুলে রাখা স্লিপিং গাউনের দিকে হাত বাড়াল।

'আমারটাও পাচ্ছি না,' ফিসফিস করল মলি, কাঁপুনি উঠে গেছে শরীরে।

'কিন্তু... আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো?' ফিসফিস করল সাইমন। 'কারও ভেতরে ঢোকা অসম্ভব...' পরমুহূর্তে দুই কামরার মাঝখানের দরজায় একটা দীর্ঘদেহী ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল ও।

দরজার চৌকাঠের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইকো ভিটোরি। এক চুল নড়ছে না, কিছু বলছে না, শুধু পালা করে দেখছে দুজনকে।

শীত করছে সাইমনের।

'ওহ্, লরেন্স!' বলে ওর একটা বাহু আঁকড়ে ধরল মলি।

সাইমন কিছু বলছে না। কথা বলবার শক্তি নেই ওর। বোকার মত শুধু তাকিয়ে থাকল চৌকাঠের উপর দাঁড়ানো ছায়ামূর্তির দিকে।

ঘরে ঢুকল ইকো। ভূতের মত হাঁটছে। ডান হাতে পিস্তল। রেইনকোট থেকে এখনও দু'এক ফোঁটা পানি ঝরছে। চকচকে লাগছে ভেজা মুখ। থেমে নেই, অবিরত উঁচু-নিচু হচ্ছে চোয়াল দুটো। আগুনের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে হলুদাভ চোখে।

পিস্তলটা ওদের দিকে তাক করে কর্কশ সুরে বলল ইকো, 'ভুলেও কেউ নড়বে না!' খালি হাতটা পিছনে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করল দরজা।

মলি ভাবল, যাক, মাসুদ ভাই নন! হঠাৎ এত বেশি স্বস্তি পেল, মনে হলো

অসুস্থ হয়ে পড়বে। বিছানার চাদরটা বুকের কাছে ধরে রেখেছে।

বস্ নন, এটা উপলব্ধি করে সাইমনও স্বস্তি বোধ করছে; ভাবছে, কে এই লোক? ইকোর হয়ে যে মাফিয়া ডন ওকে কাজ দিয়েছিল, তার প্রতিনিধি? নাকি ইকো নিজে? 'কে তুমি? কী চাও?' সাধারণ কোনও চোর কিংবা ডাকাত নয় তো? 'ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' চোখ স্থির হয়ে আছে পিস্তলটার উপর।

ফায়ার প্লেসের দিকে হেঁটে গেল ইকো, পাশে রাখা একটা আর্মচেয়ারে বসল। তার শান্ত-স্বাভাবিক আচরণ আতঙ্কিত করে তুলছে মলিকে।

'ওখানেই বসে থাকো দুজন,' বলল ইকো, পায়ের উপর পা তুলল। পিস্তলটা ওদের দুজনের মাঝখানে তাক করা। 'বোকার মত কিছু করে বসতে যেয়ো না। তা হলে খুন করতে বাধ্য হব আমি।'

'কে...কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সাইমন, বুঝতে পারছে লোকটা সাধারণ চোর-ডাকাত নয়—তাদের গায়ে এত দামি কাপড়চোপড় থাকবে না।

'আমার নাম ইকো ভিটোরি,' নরম সুরে বলল ইকো। 'আশা করি নামেই পরিচয় পেয়ে গেলে।' পালা করে দুজনের দিকে তাকাচ্ছে। 'তোমরা আমাকে চেনো না, তবে আমি দুজনকেই চিনি। হ্যালো, মলি। শুধু শুধু এত ঝুঁকি নেয়া কি উচিত হয়েছে তোমার? বিশেষ করে তোমাকে যখন ব্ল্যাকমেইল করছি আমরা?'

'ও, আচ্ছা, এটা তা হলে সেই পুরানো ব্যাপার, ব্ল্যাকমেইল,' বলল সাইমন। 'কত?'

খুক খুক করে একটু হাসল ইকো। 'দুঃখিত, এবার টাকার কোনও ভূমিকা নেই, মিস্টার সাইমন। একটা ফাঁদ তৈরির কাজে লাগাচ্ছি দুজনকে।'

মলির শিউরে ওঠা অনুভব করল সাইমন। একটু ঘুরে ওর হাতটা ধরল। 'তোমার কথা বুঝলাম না,' ইকোকে বলল ও।

'তোমাদের এজেন্সি, ফ্লোরিডার সবগুলো শাখা, কিনে নেব আমি; কিন্তু বেচতে রাজি হচ্ছে না মাসুদ রানা। ওকে বাধ্য করার জন্যে এই আয়োজন,' বলল ইকো।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল সাইমন, চেয়ারের দিকে হাত বাড়িয়ে স্লিপিং গাউনটা ধরতে গেল। 'কী আয়োজন?'

'নড়বে না!' হঠাৎ গর্জে উঠল ইকো। 'ছাড়ো ওটা।'

'আমাদের কিছু পরতে দাও।' স্থির হয়ে গিয়ে বলল সাইমন, তাকিয়ে আছে পিস্তলের দিকে।

'আরে গাধা,' হেসে উঠে বলল ইকো, 'আমি চাই তোমাদের ঠিক এই অবস্থায় দেখবে রানা। মিডিয়া থেকে সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যানও ডাকব। এত সব আয়োজনের একটাই কারণ, রানাকে নরম করা। শেষ একবার চেষ্টা করে দেখি ফ্লোরিডা থেকে ওকে ভাগাতে পারি কি না।'

বিছানা ছেড়ে দাঁড়াতে গেল সাইমন, কিন্তু পিস্তল ধরা ইকোর হাত শক্ত হয়ে উঠছে দেখে বসে পড়ল আবার। 'বসকে তুমি এখানে পাচ্ছ কোথায়?'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ইকো। 'মলি ফোন করে আসতে বলবে ওকে।' দেয়ালে

ঝোলানো ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে মলির দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'ওকে তুমি কী বলবে, সেটা তোমার ব্যাপার, আমি কিছু শিখিয়ে দিচ্ছি না। তবে, রানা যদি না আসে, তা সে যে-কোনও কারণেই হোক, তোমাকে দায়ী করব আমি। শাস্তি দেব দুজনকেই, খুলিতে একটা করে গুলি করে। মনে রেখো, আমি মিথ্যে হুমকি দিই না।'

শরীরটা পিছনদিকে একটু কাত করল মলি। 'না, অসম্ভব...' উদ্বেগে, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে ও; কথাটা শেষ করতে পারল না।

'মানে?' জানতে চাইল ইকো। 'রানাকে তুমি ফোন করতে চাও না?'

'না!'

'জোর নেই, ফোন করা না করা তোমার ইচ্ছে,' বলল ইকো। 'তবে না করলে মরতে হবে। সাইমন, সরে বসো; তা না হলে রক্তের ছিটে লাগবে গায়ে।' পিছিয়ে এসে মলির কপাল বরাবর পিস্তল উঁচু করল সে।

'মলি, যা বলছে করো!' চেঁচিয়ে উঠল সাইমন। 'বস্ এলে একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই...'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল মলি। 'আমরা অন্যায় করেছি, এখন তার মূল্য দিতে হচ্ছে। মরতে হয় মরব, মাসুদ ভাইকে আমি কোনও অবস্থাতেই এই বিপদে টেনে আনব না!'

'আরে, বিপদ কোথায় দেখলে?' বলল সাইমন। 'বসের সঙ্গে একটা বিজনেস ডিল করতে চাইছে ইকো। বস্ রাজি হচ্ছেন না, তাই একটু প্রেশার ক্রিয়েট...'

'তুমি কি ওর দলে? তা না হলে ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলছ কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মলি। 'আমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করছি না। নিশ্চয়ই খারাপ কোনও মতলব আছে...'

'না, আমার কোনও খারাপ মতলব নেই,' অমায়িক হেসে বলল ইকো। 'তবে কেউ কথা না শুনলে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।'

'প্লিজ, মলি, বসকে তুমি ফোনটা করো!' কাতর সুরে অনুরোধ করল সাইমন, তারপর মলির কানে ফিসফিস করল, 'ইকো একা, আমরা তিনজন হব...'

'এই, সাবধান, ষড়যন্ত্র কোরো না,' হেসে উঠে বলল ইকো, এক পা এগিয়ে রিসিভারটা আবার বাড়িয়ে ধরল মলির দিকে। 'নাও, ধরো।'

মলি এক চুল নড়ল না।

'প্লিজ, মলি, প্লিজ!' মলির হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে সাইমন।

'তুমি ভেবেচিন্তে বলছ?' সাইমনের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল মলি। 'সত্যি বিশ্বাস করো, মাসুদ ভাইকে বিপদে ফেলা হবে না?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইকোর বাড়ানো হাত থেকে রিসিভারটা নিল মলি। রানার নতুন নম্বর ওর মুখস্থ, ডায়াল করল ধীরে ধীরে।

ডিসপ্লেতে সাইমনের নম্বর চিনতে পেরে অপরপ্রান্ত থেকে রানা জানতে চাইল, 'হ্যালো, সাইমন? কী ব্যাপার, এত রাতে?'

'মাসুদ ভাই,' এদিক থেকে বলল মলি। 'সাইমন নয়, আমি মলি। এখনই

আপনি চলে আসুন। ওর ফ্ল্যাটে.... সাইমন... খুন হয়েছে।'

'হোয়াট?'

জবাবে আর কিছু বলতে পারল না মলি, হু-হু করে কেঁদে ফেলল।

'শান্ত হও, এখনই আমি আসছি...' যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

মলির হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ল, তারের সঙ্গে ঝুলছে। সাবধানে এগিয়ে গিয়ে ইকো সেটা ক্রেডলে তুলে রাখল।

সাইমন বিমূঢ় হয়ে জানতে চাইল, 'কী আশ্চর্য, মলি, বস্‌কে তুমি ও-কথা বললে কেন—সাইমন খুন হয়েছে?'

দু'হাতে মুখ ঢাকল মলি, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমিও জানি না কেন! হয়তো সত্যি কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। লরেন্স, আমাদের খুন করবে ও!'

ঠিক এই সময় দেয়ালের গায়ে টেলিফোনটা বেজে উঠল। মলি আর সাইমন চমকে উঠলেও, ইকো সম্পূর্ণ শান্ত, চুইংগাম চিবাতে চিবাতে বলল, 'আমার ফোন।'

ষোলো

মলি আর সাইমন নিঃশব্দে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলল ইকো। 'ইয়েস?' তাকিয়ে আছে সাইমনের দিকে, চোয়াল দুটো ধীরে ধীরে নড়ছে। 'ফাইন,' বলল সে। 'এদিকটা আমি দেখব।' রিসিভার ক্রেডলে ঝুলিয়ে পিছু হটল, তারপর একটা চেয়ারে বসল। 'রানা রওনা হয়ে গেছে। মিনিট বিশেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

'আমি এর কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না, ইকো!' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে শুরু করল সাইমন। 'ফ্লোরিডার যে গডফাদারের আশ্রয়ে তুমি আছ সে আমাকে দিয়ে তোমার অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছে, এখনও আমি সব টাকা পাইনি, অথচ তুমি এখানে...'

'তার কথা বাদ দাও,' হেসে উঠে বলল ইকো। 'তার নিজের গায়েই এত ঘা যে মলম কোথায় লাগাবে বুঝে পাচ্ছে না।'

'ঠিক আছে,' বলল সাইমন, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। 'কত টাকা চাও বলো...'

'না, এটা টাকার ব্যাপার নয়।'

'মাসুদ রানাকে তুমি চেনো না? ওঁর সঙ্গে লেগে তুমি পারবে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল মলি। 'ওর কানেকশন সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে?'

'আছে,' বলে হাসল ইকো। 'কিন্তু এবার ইকো ভিটোরি নামে এক মহা হারামির পাল্লায় পড়েছে সে। ওর কোনও বাপই এবার ওকে বাঁচাতে পারবে না।' ডান হাতের ওয়ালথার পিস্তলটা উঁচু করে দেখাল সে, তারপর ব্যারেল আর বাঁট সিল্ক রুমাল দিয়ে মুছতে শুরু করল। 'এটা রানার পিস্তল, ওর ক্যাটস্‌কিল

অফিসের চেম্বার থেকে চুরি করেছি। ও যখন শহরে থাকে না তখন চেম্বারের ভেতর লকারে পড়ে থাকে এটা। যাই হোক, কী হতে যাচ্ছে বলি। খুন করার অপরাধে অ্যারেস্ট করা হবে রানাকে। একজোড়া খুনের জন্যে।'

কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল সাইমন। 'কী বললে?'

'ব্যাপারটা পরিষ্কার, তাই না? ওর গাড়ির আওয়াজ পেলে, তোমাদের দুজনকেই আমি গুলি করব। কে প্রমাণ করবে খুন দুটো রানা করেনি?'

মলির কণ্ঠনালীতে নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার শব্দ হলো।

'ও ভয় দেখাচ্ছে, ডার্লিং,' বলল সাইমন। 'এরকম বোকামি কেউ করতে পারে না।'

ইকোর দিকে তাকিয়ে আছে মলি। হলুদাভ, নির্লিপ্ত চোখ দুটো আরও নার্ভাস করে তুলছে ওকে। তবে এরকম চরম সংকটেও দ্রুত চিন্তা করতে পারছে ও, বলল, 'মোটিভ ছাড়া এরকম খুন হয় না। জোড়া খুনের পেছনে মাসুদ ভাইয়ের মোটিভ থাকতে হবে না?'

'টাকা খেয়ে ইকোর হয়ে কাজ করছে সাইমন, তুমি ওকে সাহায্য করছ,' বলল ইকো। 'কোনও ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির বস্ এত বড় বেঈমানী সহ্য করবে? তোমাদেরকে খুন করার জন্যে এরচেয়ে বড় মোটিভ লাগে?'

'আমি টাকা খেয়েছি বা রানা এজেন্সির কোনও ক্ষতি করেছি, এর কোনও প্রমাণ কোথাও নেই...'

হাসল ইকো। 'এই কামরার এমন জায়গায় খুদে মাইক্রোফোন লুকানো আছে, খুঁজে পাওনি তুমি,' বলল সে। 'তোমার আর মলির আলাপ ক্যাসেটে রেকর্ড হয়ে গেছে। পুলিশের কাছে ওটা পৌঁছে দেয়া হবে।'

'এত সহজে কাউকে খুনি বলে প্রমাণ করা যায় না,' বলল সাইমন। 'বস্‌কে ফাঁসানো...'

'এখানে, তোমাদের রক্তের মধ্যে, নিজের পিস্তল দেখে আঁতকে উঠবে না রানা?' জিজ্ঞেস করল ইকো, হাসছে। 'ওটা ধরে পরীক্ষা করবে না ও? ওর হাতের ছাপ পড়বে না ওটায়? জুতোয় রক্তের দাগ থাকবে না? তা ছাড়া, আমাকে এত বোকা ভাবছ কেন! এত আয়োজন করেছি, ভেবেছ রানার ফটো তোলার ব্যবস্থা করিনি? তোমাদের লাশ ফেলে ও যখন পালাবে, অন্তত তিন জায়গা থেকে ওর ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরাম্যানদের বসিয়ে রেখেছি।'

'লরেন্স, ও সত্যি খুন করবে,' শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বলল মলি।

'হ্যাঁ, সত্যি করব,' নরম সুরে বলল ইকো। 'দুজন অনেক মজা করেছ, নিজেদের পেশার সঙ্গে বেঈমানীও করেছ, এখন তার মাসুল দাও।'

'কিন্তু তুমিও পার পাবে না!' হিসহিস করে বলল সাইমন। 'ধরা পড়ে যাবে।'

হেসে উঠল ইকো। 'জানালার নীচেই নদী। আমি খুব ভাল সাঁতারু। রাতের অন্ধকারে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।' হাতে ভাল করে রুমালটা জড়িয়ে নিয়ে, সেই হাতেই পিস্তলটা ধরল সে।

'খুন করা তোমার নেশা, তুমি একজন সিরিয়াল খুনি,' বলল সাইমন, এতক্ষণে বিশ্বাস করছে ইকো সত্যি কথাই বলছে, মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না।

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল ইকো।

'ঠিক আছে, মলিকে তুমি চলে যেতে দাও,' আবেদনের সুরে বলল সাইমন। 'ঈশ্বরের দোহাই, ওকে তুমি রেহাই দাও। একটা খুনই যথেষ্ট।'

'দুঃখিত,' বিদ্রূপের সুরে বলল ইকো, 'তোমার আর্জি মঞ্জুর করা গেল না। তোমাকে গুলি করার পর কীভাবে ওকে জীবিত চলে যেতে দিই, বলো? ও তো আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে।'

'না, দেবে না,' বলল সাইমন। 'আল্লাহর নামে শপথ করবে ও।'

'সরি,' বলল ইকো। 'জোড়া খুনের মধ্যে দারুণ থ্রিল আর ড্রামা আছে। তা ছাড়া, একা শুধু তোমাকে খুন করলে রানা পার পেয়ে যেতে পারে, কিন্তু মলির খুনটাকে জুরিরা অত্যন্ত সিরিয়াসলি নেবে।' একটু পিছিয়ে গিয়ে চেয়ারটায় আবার বসল ইকো। 'তোমরা আর এই পৃথিবীতে বেশিক্ষণ নেই। সৃষ্টিকর্তার নাম-টাম নিতে চাও না? আমার উপস্থিতি উপেক্ষা করো...না হয় কানে তুলো দিয়ে রাখছি।'

সাইমন উপলব্ধি করছে, খুন করে মজা পায় এমন এক উন্মাদের পাল্লায় পড়েছে ওরা। প্রাণভিক্ষা চেয়ে লাভ নেই। ইকোর মনোযোগ যদি অন্যদিকে ফেরানো যায়, তারপর চেষ্টা করবে কাছাকাছি পৌঁছানোর। হাতের পিস্তলটা কেড়ে নিতে পারলে, নিজেদের বাঁচানোর একটা উপায় হয়।

দুজনের মাঝখানে দূরত্বটা বিবেচনা করছে সাইমন। বিছানার পাশে, ইকোর কাছ থেকে দূরে বসে থাকায় ওর পজিশনটা সুবিধের নয়। আট কি নয় ফুট অনেক দূরত্ব।

'প্ল্যানটা বাতিল করো, আমাদের দুজনের কাছে জমানো টাকা আছে, সব নিয়ে যাও,' ইকোকে বলল মলি। 'কাল সকালেই দু'লাখ ডলার দিতে পারব। সময় পেলে আরও বেশি যোগাড় করা যাবে।'

মাথা নাড়ল ইকো। 'বৃথা চেষ্টা করছ,' বলল সে। 'টাকা নয়, আমি দুটো জিনিস চাইছি—প্রতিশোধ আর রানা এজেন্সির ব্যবসা।' হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাচ্ছে সে, এই সুযোগে একটা হাত নিজের পিছনে নিয়ে গিয়ে বালিশের নাগাল পাওয়ার জন্য বিছানা হাতড়াচ্ছে সাইমন।

নড়াচড়াটা মলির চোখে ধরা পড়ে গেল, ওর ঝুলে পড়া মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে। বুঝতে পারছে কিছু একটা করতে যাচ্ছে সাইমন।

'আ-আমি বোধহয় জ্ঞান হারাচ্ছি,' হাঁপানোর শব্দ করে বলল মলি, চোখ বুজল, এমন ভঙ্গিতে হাত বাড়াল যেন তাল সামলাবার চেষ্টা করছে, তারপর নাইট টেবিলে ধাক্কা মারল। সশব্দে মেঝেতে উল্টে পড়ল সেটা।

ইকোর দৃষ্টি সাইমনের উপর থেকে ছুটে গেল উল্টে পড়া টেবিলের দিকে। বালিশটা ছুঁড়ল সাইমন, তারপর নিজেও লাফ দিল।

ইকোর বুকে লাগল বালিশ, আড়ালে পড়ে গেল তার হাতের পিস্তল।

রক্ত-শূন্য চেহারা, চোখ অপলক, সাইমন লাফ দিয়েছে সামনে—শরীরটাকে উড়িয়ে নয় ফুট দূরত্ব পেরুবার চেষ্টা।

ঝাপটা দিয়ে সামনে থেকে বালিশ সরাল ইকো, চেয়ার ছেড়ে অর্ধেকটা উঁচু

হয়েছে সে। সাইমন দেখল, গুলি হওয়ার আগে ইকোর নাগাল পাওয়া যাবে না, তারপরেও এগোচ্ছে সে; বুকের ভিতরে দ্রিম দ্রিম ড্রামের বাড়ি পড়ছে।

গুলির প্রচণ্ড শব্দে ঝনঝন করে কেঁপে উঠল জানালা।

হাঁটুর ঠিক নীচে লেগেছে বুলেট, শূন্য থেকে মেঝেতে খসে পড়ল সাইমন। ওর হাত দুটো ইকোর রেইনকোটের বেল্ট ধরে ফেলেছে। তাকে নিজের দিকে টানছে ও।

পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে সাইমনের কপালে বাড়ি মারল ইকো, তারপর লাথি মেরে সামনে থেকে সরিয়ে দিল। এতটুকু বিচলিত নয় সে, ঝট করে মলির দিকে তাকানোর সময়ও একই ছন্দে চোয়াল দুটো নড়ছে।

ট্রেনিং ভুলে বিছানার উপর স্থির হয়ে আছে মলি। চাদরটা খসে পড়েছে গা থেকে, বুক ঢেকে রেখেছে হাত দিয়ে, চেহারায় আতঙ্কের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে ঘৃণা। ইকোর চোখে মার্বেল পাথরের মূর্তির মত লাগছে ওকে।

গড়িয়ে সরে গেল সাইমন, ওর পা বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ক্রল করে ইকোর দিকে এগোল ও, খেঁকানোর ভঙ্গিতে দাঁত ছেড়ে পিছনে চলে এসেছে ঠোঁট।

পিছু হটল ইকো, হাসছে। 'ব্যাটা গাধা!' মৃদু গলায় বলল সে। 'মরার আগে বীরত্ব দেখাতে চায়!'

এগিয়ে যাচ্ছে সাইমন। ভেঙে চুরমার হওয়া হাঁটুর ব্যথা ইকোর রক্ত দেখবার জন্য উন্মাদ করে তুলেছে ওকে। এই মুহূর্তে ভয় বলে কিছু নেই ওর। এখন শুধু হাতের নাগালে ইকোকে পেতে চায়।

ওয়ালথার তুলল ইকো, সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল। অসহায় শিকার মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

মুখ তুলে তাকাল সাইমন, পিস্তলের ছোট্ট কালো ফুটোটা দেখছে—ওর দিকে তাক করা, ব্যারেল বরাবর কুঁচকে আছে হলুদাভ চোখ।

বন্য পশুর মত চিৎকার শুরু করল মলি। 'না! না! ওকে মেরো না!'

গুলির শব্দে আবার কেঁপে উঠল জানালা। দু'চোখের ঠিক মাঝখানটা ফুটো হয়ে গেল, ধাক্কাটা সাইমনকে ছুঁড়ে দিল পিছনদিকে; কাত হয়ে ঢলে পড়ল ও। হাতের আঙুল আপনাআপনি বারবার খুলছে, বন্ধ হচ্ছে; পেশি লাফাচ্ছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ।

'একটু আগে হয়ে গেল,' বলল ইকো, ভ্রূ জোড়া কুঁচকে রেখেছে। 'কী আর করা।'

চিবুকের কাছে ভাঁজ করা হাঁটু, এখনও বিছানায় বসে রয়েছে মলি। একটু পর পর কেঁপে উঠছে শরীরটা। ইকো খুঁটিয়ে দেখছে ওর চামড়ার নীচে কীভাবে লাফালাফি করছে পেশি। কল্পনার চোখে বাতাসের মৃদু ঝাপটায় এলোমেলো নদীর সারফেস দেখতে পেল সে।

একটা গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনে হাসল ইকো। 'রানা,' বলল সে, দ্রুত হেঁটে গেল জানালার দিকে। পরদা সরিয়ে খুলল ওটা, উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। নীচেই নদী বয়ে চলেছে, বেশ খানিকটা দূরে একটা টাগ বোটের আলো দেখতে পেল, শুনতে পেল করুণ সুরে ওটার সাইরেন বাজছে।

'যাও, মলি, নিয়ে এসো ওকে,' নরম সুরে বলল ইকো, হাত তুলে দরজাটা দেখাল। 'তোমার বস্‌কে ভেতরে ডেকে নাও।'

মলি নড়ল না। চোখের দৃষ্টি সাইমনের লাশকে ছেড়ে ইকোর দিকে উঠল। ওর চোখে কোনও ভাষা নেই, বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সাইমন মারা গেছে, এটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না।

'নিয়ে এসো ওকে, যাও,' আবার বলল ইকো।

বেশ জোরে নক হলো সদর দরজায়।

'ওই পৌঁছে গেছে। যাও, মলি। রানা হয়তো তোমাকে বাঁচাতে পারবে। ভেবে দেখো—কত সাহস ওর, কত বুদ্ধি!'

একচুল নড়ছে না মলি, একই ভঙ্গিতে বসে আছে বিছানায়। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।

'মলি!' সদর দরজা থেকে রানার গলা ভেসে এল। 'তুমি আছ, মলি?'

আওয়াজটার দিকে ফিরল মলি। চোখের পাতা একটু নড়ে উঠল, প্রাণ ফিরে আসছে দৃষ্টিতে।

অটল দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ করছে ইকো, হাতের ওয়ালথার খানিকটা উঁচু করা, ট্রিগারে আঙুল।

'মলি, তুমি আছ নাকি?'

'হ্যাঁ,' হঠাৎ বলল মলি। 'ওহ্, মাসুদ ভাই! বাঁচান! আপনি আমাকে বাঁচান!' লাফ দিয়ে খাট থেকে নীচে নামল, অন্ধের মত দরজার দিকে ছুটল, টান দিয়ে খুলে ফেলল কবাট।

নড়ল না ইকো। দাঁত দিয়ে খুব জোরে পিষল মুখের চুইংগাম।

অন্ধকার সিটিং রুমে ঢুকে হোঁচট খেল মলি, একটা চেয়ারে পা বেধে যাওয়ায় সটান দড়াম করে পড়ে গেল।

'কী হচ্ছে ভেতরে?' কঠিন গলায় বলল রানা, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে; এক হাতে পিস্তল, আরেক হাত দিয়ে কবাটের হাতল মোচড়াল। 'দরজা খোলো!'

যেন একটা ছায়া নড়ছে, দুই কামরার মাঝখানের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ইকো। বোতাম টিপে আলো জ্বালল, দেখল পড়িমরি করে এইমাত্র সিধে হলো মলি। কামরার মেঝে পার হয়ে সদর দরজার দিকে এগোচ্ছে ও।

'মাসুদ ভাই!' আতঙ্কে চিৎকার করছে মলি। 'আমাকে খুন করবে ও। বাঁচান!'

ছুটে এসে কাঁধ দিয়ে সদর দরজায় আঘাত করল রানা, ফ্রেমটা গুঙিয়ে উঠল।

মলির হাতে তালায় ঢোকানো চাবিটা ধরছে, ওয়ালথার তুলল ইকো। পিস্তলটা সে তাক করেছে ওর দুই কাঁধের ঠিক মাঝখানে।

ইকো যে গুলি করতে যাচ্ছে, কীভাবে যেন বুঝতে পারল মলি, ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল।

ওর আতঙ্কিত চিৎকার আর গুলির আওয়াজ এক হয়ে মিশে গেল। কালচে-নীল একটা গর্ত তৈরি হলো মলির শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে। ধাক্কাটা কবাটের উপর ছুঁড়ে দিল ওকে, হাঁটু দুটো নিজে থেকেই ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে।

আবার ওকে গুলি করল ইকো। বুলেটটা মলির ডান নিতম্বের একটু উপরে লাগল। ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা, বাড়ানো হাত দরজার গায়ে আঁচড় কাটছে। হাঁটু দুটোয় আর কোনও শক্তি নেই, হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল ও।

সম্পূর্ণ শান্ত ইকো; হাতের পিস্তল মলির কাছাকাছি ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরল, দ্রুত পায়ে বেডরুমে ফিরে গিয়ে জানালার দিকে এগোল।

জানালার গোবরাটে দুই পা তুলে বসেছে ইকো, শুনতে পেল সদর দরজা ভেঙে পড়ছে। এখনও সম্পূর্ণ শান্ত সে, সময় নিয়ে জানালার পর্দাটা বাইরে থেকে টেনে ঠিকঠাক করল, কাঁচ তুলল, তারপর এতটুকু ইতস্তত না করে ডাইভ দিল অন্ধকার নদীতে।

সতেরো

টেলিভিশন বন্ধ করবার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিল ঝরনা। কোনও অনুষ্ঠানই ভাল লাগছে না ওর।

শেড লাগানো ল্যাম্পটা জ্বেলে ঝুঁকল, উসকে দিচ্ছে ফায়ার প্লেসের আগুন। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা একঘেয়ে শব্দ করছে। অস্থিরতার সঙ্গে চোখ তুলে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা বেজে সাতাশ মিনিট।

একটু আঁটসাঁট হাউজকোট পরেছে বলে ওটার গায়ে ওর ফিগার ফুটে আছে; লম্বা, সুগঠিত পায়ে হিল লাগানো স্লিপার। টিভি খোলার আগে শ্যাম্পু করা চুল কাঁধের উপর স্তূপ হয়ে আছে, একটা ফ্রেমে বেঁধে রেখেছে সুশ্রী মুখটাকে।

'মাসুদ ভাই, ঠিক কী চাইছ তুমি?' আপনমনে বিড়বিড় করল ঝরনা, ঘরের মেঝেতে পায়চারী শুরু করল।

আগামী শনিবার ওকে ডিনার খাওয়াবার কথা বলে রীতিমত চমকে দিয়েছে রানা। যে মানুষটাকে গুরুজন, আদর্শপুরুষ হিসাবে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে, যাঁর জন্য প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া যায়, তাঁর কাছ থেকে এরকম অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণ পাওয়ার পর একটা অস্থিরতায় ভুগছে ও।

কারণ একটাই, রানার সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া ওর পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। অন্য কাউকে ভালবাসে, ব্যাপারটা তা নয়। সেই শুরু থেকে মর্যাদার এমন উঁচু আসনে বসিয়ে রেখেছে রানাকে, এত বেশি মহৎ আর পবিত্র বলে মনে করে, নিজের প্রেমিক হিসাবে কল্পনাই করতে পারে না ওকে—তা যেন গর্হিত কোনও অপরাধ। ভাবল—সাইকেল চালাই, মডেলিং করি, সুইমিং কস্টিউম পরে সাঁতরাই, নিয়মিত জিমে যাই, তারপরেও আমি একটু সেকেলে! একটু না, অনেকটাই!

'কিছু করার নেই,' আবার বিড়বিড় করল ঝরনা, 'আমার মানসিক গড়নটাই এরকম।' অফিসের কিছু কাজ বাড়িতে এনে রেখেছে, ভাবল মনটা স্থির করবার

জন্য ওগুলো নিয়ে বসে।

দেরাজ থেকে ফাইলটা বের করল, একটা চেয়ার টেনে এনে বসল আগুনের ধারে। কতক্ষণ কাজ করেছে বলতে পারবে না, হঠাৎ দরজার কলবেল বেজে ওঠায় চমকে উঠল ঝরনা।

হাতঘড়ি দেখল ও। রাত প্রায় এগারোটা। এত রাতে কে আসবে? ইতস্তত করছে, আবার বেল বাজল—এবার অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে।

ফাইল রেখে দিয়ে দেরাজ থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিল ঝরনা, তারপর লবিতে বেরুল। কোনও শব্দ না করে চেইন লাগাল, তারপর কবাটের একপাশে সরে কয়েক ইঞ্চি খুলল সদর দরজা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'দরজা খোলো, ঝরনা, আমি রানা।'

'মেরে ফেলল! মাসুদ ভাই, ইকো আমাকে মেরে ফেলল!' কাঁধের ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছে রানা, তারই ফাঁকে মলির কাতর গোঙানি আর সাহায্যের আবেদন শুনতে পাচ্ছে।

পাঁচবারের চেষ্টায় কবজা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এল দরজা। কবাটের গায়ে কয়েকটা লাথি মেরে আরও একটু ঢিল করে নিল রানা, তারপর সাবধানে ধরে সরাবার চেষ্টা করছে ওটাকে, ভয় পাচ্ছে তা না হলে মলির গায়ের উপর পড়বে। লবিতে দাঁড়িয়ে এখনও শুনতে পাচ্ছে ও, চৌকাঠের একেবারে সামনে কোথাও থেকে ফোঁপাচ্ছে মলি।

সিটিং রুমে আলো জ্বলছে। বাঁকা হয়ে ঝুলে থাকা দরজার ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকল রানা, হাতে পিস্তল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে কামরার মেঝে, সেই রক্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে মলি।

ওকে দেখে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল ও, বলল, 'অন্যায় করেছি, মাসুদ ভাই, অনেক আগেই সব কথা বলা উচিত ছিল আপনাকে। আমাকে তুমি মাফ করে দিয়ো...বলো, মাফ করবে?' রক্তে ভেজা হাত দিয়ে ট্রাউজারের পায়া, জুতো সহ রানার পা জড়িয়ে ধরল।

মলির কথা শুনছে রানা, তবে ওর সতর্ক দৃষ্টি রক্তের উপর পড়ে থাকা দ্বিতীয় ওয়ালথারটাকে দেখছে। সন্দেহ হলো, ওটাও ওর। তবে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য ওটায় হাত দিল না।

'সাইমনকে আমি ভালবাসি,' কাতর সুরে বলেই চলেছে মলি। 'সেজন্যেই সব কথা আপনাকে বলতে দেরি হয়ে গেল...'

'তুমি শান্ত হও, মলি,' বলল রানা।

'এখনই আপনি পালিয়ে যান, মাসুদ ভাই!' বলল মলি। 'গোটা ব্যাপারটা আপনাকে ফাঁসানোর জন্যে সাজিয়েছে ইকো।' এই একটু আগেও, রানাকে যখন দেখেনি, বাঁচার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল মলি। এখন নিজের কথা ভুলে গিয়ে রানার নিরাপত্তা নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে। 'পিস্তলটা আপনার, চেম্বার থেকে চুরি করেছে ইকো। তার লোক আপনার ছবি...তিন জায়গা থেকে...'

রানার চোখ গিয়ে পড়ল বেডরুমের খোলা দরজায়। ও জানে, দুই কামরার

এই ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বেরুবার একটাই দরজা, যেটা দিয়ে ঢুকেছে ও। খুনি ওটা দিয়ে বেরোয়নি। তার মানে...

পা ছাড়িয়ে নিয়ে মলিকে পাশ কাটাল রানা, সাবধানে এগোল। সিটিং রুমের আলোয় দেখল কপালে ফুটো নিয়ে বেডরুমের মেঝেতে পড়ে রয়েছে সাইমন। সার্চ করে কাউকে পেল না ও। জানালার কাঁচ খুলে নদীর উপর চোখ বুলাল। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। বেশ জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, পানিতে কেউ থাকলেও দেখা যাবে না তাকে।

দেয়ালে আটকানো ক্রেডল থেকে রিসিভার নামিয়ে হাসপাতালে ফোন করল রানা, সাইমনের ঠিকানা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা অ্যামবুলেন্স পাঠাতে অনুরোধ করল। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পুলিশকে কিছু জানাবে না। ওদের মধ্যে ইকোর কিছু বন্ধু থাকতে পারে, তাদেরকে জানানো উচিত হবে না খুন হওয়ার কাছাকাছি সময়ে এখানে ছিল ও।

তাড়াতাড়ি মলির কাছে ফিরে যাচ্ছে রানা, দেখা দরকার কোথায় গুলি লেগেছে। কিন্তু গিয়ে দেখল ওর চোখ দুটো দেয়ালের দিকে স্থির হয়ে আছে, তাতে কোনও প্রাণ নেই।

মলির চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এল রানা। জানে ইকোর লোকজন ওর ছবি তুলছে বা তুলবে, কিন্তু জানে না কোথায় লুকিয়ে আছে তারা, কীভাবে তাদেরকে ধরা যায়।

না, তা ধরা সম্ভব নয়; এই ষড়যন্ত্রের জাল থেকে ওকে অন্য কোনওভাবে বেরিয়ে আসতে হবে। কাছেই ওর এক এজেন্টের বাড়ি, এই মুহূর্তে ওখানেই ওর যাওয়া উচিত।

তবে অনেক রাস্তা ঘুরে, গাড়ির পিছনটা বারবার দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল রানা, কেউ ওর পিছু নেয়নি।

রানার গলা চিনতে পেরে ঝরনার সারা শরীর গরম হয়ে উঠল, পরমুহূর্তেই আবার শীত অনুভব করল, একটা বিট মিস করেছে ওর হার্ট। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে হাতের পিস্তল হাউসকোটের পকেটে ভরল, তারপর চেইন সরিয়ে দরজা খুলল ও।

সামনে রানা দাঁড়িয়ে। হালকা চকলেট রঙের ওভারকোট বৃষ্টির পানিতে ভিজে চকচক করছে। 'এত রাতে এলাম, দুঃখিত,' বলল ও। 'তোমাকে বিব্রত করছি না তো?'

'না, মাসুদ ভাই! ভেতরে আসুন,' বলল ঝরনা, বসের ফ্যাকাসে চেহারা দেখে শীত শীত ভাবটা চেপে বসছে সারা বুকে। 'আপনার কোটটা খুলে দেব?'

গম্ভীর একটু হেসে মাথা নাড়ল রানা, নিজেই খুলল কোটটা।

হাত বাড়িয়ে সেটা নিল ঝরনা। 'আমি এটা বাথরুমে রেখে আসি,' বলল ও। 'আপনি আগুনের ধারে ওই চেয়ারটায় বসুন।'

বাথরুম থেকে কিচেনে ঢুকল ঝরনা, পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাতে একটা ট্রে নিয়ে ফিরে এল, তাতে দু'কাপ ধূমায়িত কফি।

'ধন্যবাদ,' একটা কাপ ট্রে থেকে তুলে নিয়ে চেয়ার টেনে আগুনের ধারে বসল রানা। বলল, 'বলে দিতে হয় না, কখন কী করতে হবে সব তোমার মনে থাকে।'

প্রশংসাটুকু বিশেষ খেয়ালই করল না ঝরনা, লক্ষ করছে বসের চোখ দুটো বরফের কঠিন টুকরো হয়ে আছে। 'কী হয়েছে?' ওর সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল। 'মাসুদ ভাই, প্লিজ, বলুন!'

দ্রুত তাকাল রানা, তারপর হাত বাড়িয়ে ওর কবজি চাপড়াল। বসের স্পর্শ অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগল ঝরনার। 'শক্ত হও, ঝরনা,' বলল রানা। 'আমরা আরও দুজন এজেন্টকে হারিয়েছি।'

শিউরে উঠল ঝরনা। ভাবল, শুনতে ভুল করছি? 'আরও...: দুজন?' বিড়বিড় করল। ' কে...কারা...কেন...' ওর মাথা ঘুরছে।

'মলি, সাইমন,' বলল রানা। 'ওদেরকে খুন করা হয়েছে আমাকে ফাঁসানোর জন্যে।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ঝরনা, মুখ থেকে সব রক্ত নেমে যাচ্ছে। 'ও আল্লাহ্! কিন্তু, কিন্তু... কীভাবে?'

'সাইমনকে ভালবাসত মলি,' বলল রানা। 'কী কারণে জানি না ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল। তবে ইকো জানত কোথায় ওরা দেখা-সাক্ষাৎ করে—সাইমনের ফ্ল্যাটে। আমার পিস্তল চুরি করে নিয়ে সেখানে হাজির হয় সে, ওদেরকে জিম্মি করে, তারপর মলিকে দিয়ে আমাকে ফোন করায়। আমি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার একটু পরেই মারা যায় মলি, ও-ই এ-সব কথা বলে গেছে—আমাকে ফাঁসানোর জন্যে দৃশ্যটা সাজানো হয়েছে...'

'দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলেন আপনি, তা হলে খুনি কোন্ পথে পালাল?'

'নিশ্চয়ই জানালা দিয়ে নদীতে লাফ দিয়েছে,' বলল রানা। 'তোমার একটা ফোন দাও, যেটার কল ট্রেস করা যাবে না।'

'সে ইকো কি না...'

'মলি তা-ই বলেছে...'

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, ইকোকে না পাহারা দেয়ার কথা জিসানের?' বলল ঝরনা।

'সেজন্যেই তো ওকে ফোন করা দরকার,' রানার গলায় তাগাদার সুর। 'সবাইকে সাবধানও করতে হবে।'

চেয়ার ছাড়ল ঝরনা, টেবিলের দেরাজ খুলে একটা মোবাইল বের করে জিসানের নম্বর টিপল।

অপরপ্রান্ত থেকে জিসানের গলা ভেসে এল। 'হ্যালো?'

'ঝরনা হক, রানা এজেন্সি, ক্যাটস্‌কিল,' বলল ঝরনা। 'মাসুদ ভাই জানতে চাইছেন, ইকো কোথায়?'

'আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি,' বলল জিসান। 'মাসুদ ভাইকে দিন, প্লিজ।'

সেটটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ঝরনা। 'আপনার সঙ্গে কথা বলবে।'

'ইয়েস, জিসান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইকো তার বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরোয়নি,' বলল জিসান। 'কেন জানতে চাইছেন, মাসুদ ভাই?'

'তুমি শিওর, জিসান, ইকো বেরোয়নি?'

'জী, মাসুদ ভাই, অবশ্যই শিওর! আমি তো একা না, মাশরাফিকে পেছনের দরজায় বসিয়ে রেখেছি। আধ ঘণ্টা পর পর বাড়িটার সামনে দিয়ে হাঁটছে ও। ভেতরে আলো জ্বলছে, টেলিভিশন চলছে।'

'ঠিক আছে, এখনই তুমি ঝরনার ফ্ল্যাটে চলে এসো—লেখো,' ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা। তারপর আরও কয়েক জায়গায় ফোন করল।

পাঁচ মিনিট পর মোবাইল সেটটা ঝরনাকে ফেরত দিল রানা। 'এজেন্সির সলিসিটর শহীদ সাবের আসছে। সে যে কিছু করতে পারবে, তা নয়। আরেকটা খারাপ খবর হলো, টিসাকে কোথাও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।'

চেয়ারে বসে ভ্রূ কোঁচকাল ঝরনা, কী যেন চিন্তা করছে।

লক্ষ করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, ঝরনা?'

'না, মানে...কী যেন একটা মনে পড়তে চাইছে, মাসুদ ভাই,' সিলিঙের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছে ঝরনা, 'টিসার সঙ্গে সম্পর্ক আছে...'

'কিছুক্ষণ ভুলে থাকো, তারপর চেষ্টা করো,' পরামর্শ দিল রানা।

এক মিনিট মাথা নিচু করে বসে থাকল ঝরনা। তারপর হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল ওর চেহারা। 'মনে পড়েছে, মাসুদ ভাই। তবে বুঝতে পারছি, এটার বোধহয় কোনও তাৎপর্য নেই।'

'শুনি তবু,' বলল রানা।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে ঝরনা বলল, 'মাস তিন-চার আগের কথা। গাড়িতে কোথাও যাচ্ছিলাম দুজন। সাইন্স অ্যাকাডেমি স্ট্রিটে একটা টাওয়ারের গায়ে অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখিয়ে টিসা আমাকে বলল, ওটার টপ ফ্লোরে থাকতে কেমন লাগবে তোমার?'

'কী নাম টাওয়ারটার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পিয়ার্স,' বলল ঝরনা।

'তারপর?'

'বললাম ভালই লাগবে, কিন্তু ওরকম একটা পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সামর্থ্য কোনও দিনও হবে না আমার। টিসা বলল, আমারও তো সেটাই সমস্যা।'

'গুড গড!' ঝরনা থামতেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'এখন তো আমরা জানি, ঝরনা, সামর্থ্য ওর ছিল! কে জানে, নতুন বাড়িটার মত হয়তো ওই পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্টও কিনেছে টিসা! ইকোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্ল্যাকমেইলিং থেকে কম টাকা তো কামায়নি।'

চট করে হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে রানার দিকে তাকাল ঝরনা। 'ভাবছেন ওখানে লুকিয়ে রয়েছে টিসা?'

'খুবই সম্ভব সেটা,' বলল রানা। 'হয়তো শুধু আমাদের ভয়ে নয়, ইকোর

ভয়েও।'

'প্রয়োজন ফুরালে ওকেও খুন করবে ইকো?' মাথা ঝাঁকাল ঝরনা। 'হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু তা আমরা হতে দিতে পারি না,' বলল রানা। 'টিসা যদি কোনও অপরাধ করে থাকে, আইন ও কোর্ট ওর শাস্তির ব্যবস্থা করবে—মাফিয়া নয়।'

এই সময় গাড়ির আওয়াজ ভেসে এল ফ্ল্যাটবাড়ির নীচ থেকে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রানা বলল, 'জিসান আর সাবের, দুজনেই পৌঁছে গেছে।'

'মাসুদ ভাই, আমাকে তা হলে একবার দেখে আসতে হয়,' চেয়ার ছাড়ল ঝরনা। 'টিসাকে পেলে আমি কি পুলিশকে ইনফর্ম করব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, আগে আমাকে খবর দেবে,' বলল ও। 'আমি নিজে যাব ওখানে। পুলিশকে খবর দেয়ার আগে শুনতে হবে ওর কী বলার আছে।'

'ঠিক আছে, আমি গেলাম, মাসুদ ভাই,' বলে দরজার দিকে এগোল ঝরনা।

'হ্যাঁ, যাও, তবে সাবধানে, ঝরনা।'

'জী, ধন্যবাদ, মাসুদ ভাই,' বলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ঝরনা।

আঠারো

অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে লোহার মই বেয়ে উপরে উঠছে ইকো ভিটোরি। জেটির পাটাতন বরাবর মাথাটা তুলে ডানে-বাঁয়ে তাকাল, নির্জন বন্দর সংলগ্ন এলাকা জুড়ে কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাকি কটা ধাপ বেয়ে জেটির উপর উঠে পড়ল সে।

জেটি ধরে ডাঙার দিকে দ্রুত, দৃঢ় পদক্ষেপে এগোল ইকো, শেষ মাথায় পৌঁছে একটা অন্ধকার কুঁড়ের সামনে থামল। হাত দিয়ে ঠেলে কবাট খুলল, ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালার পর চারদিকটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে। কেউ নেই; কুঁড়ের অর্ধেকটা দখল করে রেখেছে কাঠের বাক্স আর পিপে।

ঢাকনি তুলে একটা বাক্সে হাত ভরল ইকো, বের করে আনল নতুন একটা সুটকেস। আজ দিনের বেলা এটা এখানে রেখে গিয়েছিল। পরনের ভিজে কাপড়চোপড় খুলে তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা মুছল সে। তারপর দ্রুত হাতে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রস্থ কাপড় পরল, পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ গুঁজে রাখল সুটকেসে—ওগুলোর সঙ্গে মলি আর সাইমনের পিস্তল দুটোও রয়েছে।

কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসে ডাইনে-বাঁয়ে সাবধানে তাকাল ইকো, তারপর হাতের সুটকেসটা ফেলে দিল নদীতে। টুপ করে ডুবে গেল ওটা। এদিক-ওদিক আবার একবার তাকাল, কেউ কোথাও নেই দেখে সন্তুষ্ট বোধ করল, দ্রুত হেঁটে নেমে এল জেটি থেকে, রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল সরু একটা গলিতে।

গলি থেকে এগারো নম্বর স্ট্রিটে বেরিয়ে এল ইকো। সাবওয়েতে পৌঁছে

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠছে, টিকিট কাটবে, এই সময় শুনতে পেল সাইরেন বাজিয়ে পুলিশ কার ছুটে যাচ্ছে। ওটা পাঁচ নম্বর স্ট্রিটের দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আপনমনে ছোট্ট করে একটু মাথা ঝাঁকাল, খুশি খুশি লাগছে চেহারাটা।

ট্রেনে চড়ে একশো এগারো নম্বর স্ট্রিটে পৌঁছাল ইকো, এরপর একটা ট্যাক্সি নিল, ড্রাইভারকে বলল, 'মিউজিয়াম স্ট্রিট।'

ট্যাক্সির এক কোণে বসেছে ইকো, চুইংগাম চিবাচ্ছে, হলদেটে চোখ দুটোয় চিন্তার ভাব। একটু পর পর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে পিছু নিয়ে কেউ আসছে কি না।

মিউজিয়াম স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। প্রায় ফাঁকা রাস্তা, দু'একজন পথিক যাও বা আছে, উল্টোদিকে যাচ্ছে তারা। পায়ে হেঁটে সাইন্স অ্যাকাডেমি স্ট্রিটে পৌঁছাল সে।

ইকো দেখল বাইশতলা টাওয়ারটা অন্ধকার হয়ে আছে, আলো জ্বলছে শুধু টপফ্লোরের অ্যাপার্টমেন্টে। গেটের পাশেই দারোয়ানের ঘর, ভেতর থেকে নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে। লবিতে ঢুকে সারি সারি এলিভেটরের দিকে এগোল ইকো। থামল শেষ মাথায়, 'পেন্টহাউস' লেখা প্রাইভেট একটা এলিভেটরের সামনে।

টপ ফ্লোরে উঠে এল এলিভেটর, অন্ধকার প্যাসেজে নেমে কয়েক পা হেঁটে অ্যাপার্টমেন্টের দুটো দরজার একটার সামনে থামল। বেডরুম, সিটিং রুম, দুটোর ভিতরই আলো জ্বলছে। পালা করে দুটোর সামনেই কান পেতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সে। কোনও রকম ব্যস্ততা নেই, ধীরে ধীরে চুইংগাম চিবাচ্ছে।

এক দুই করে ছয় মিনিট পার হলো। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কোনও শব্দ পাচ্ছে না ইকো। এতক্ষণে কলবেলের বোতামে চাপ দিল সে। শুনতে পেল সিটিং রুমের দরজার ওপারে টুং টুং করে বেল বাজছে। দু'তিন মিনিট অপেক্ষা করল, কিন্তু ভিতর থেকে কারও কোনও সাড়া নেই। আবার বেল বাজাল সে, ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে।

একটু পর হঠাৎ আলোর বন্যায় ভেসে গেল প্যাসেজ। সিটিং রুমের দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে টিসা। ইকো লক্ষ করল, একটু একটু টলছে ও, চোখ দুটো আধ বোজা।

'এসো, তোমার সঙ্গে আজ আমার বোঝাপড়া আছে,' জড়ানো গলায় বলল টিসা, সরে গিয়ে পথ করে দিল ইকোকে।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ইকো, বলল, 'এখানে আমি হেরোইন রেখেছি ডিলাররা এসে যাতে টাকা দিয়ে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে। তুমি নেশা করবে জানলে...'

'এরইমধ্যে ভুলে গেলে, কেন আমি নেশা করি?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল টিসা। 'নোরা বার্নকে লেখা নাহিদের চিঠি দেখিয়ে আমার মাথাটা তুমি নষ্ট করে দাওনি? তখন কী জানতাম ও-সব চিঠিতে নাহিদের সইগুলো নকল করেছ তুমি! যাচ্ছিলাম আত্মহত্যা করতে, উপকারী বন্ধুর মত সাহায্যের নামে আমাকে তুমি হেরোইন ধরাওনি? তারপর তোমার এই জঘন্য ব্ল্যাকমেইল ব্যবসাতে ঢোকাওনি?'

ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সিটিংরুমের এক ধারে দাঁড় করানো ছোট্ট একটা বার-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইকো। সরু, লম্বা একটা গ্লাসে তিন আউন্সের মত ব্র্যাণ্ডি ঢালল; চুমুক দিল, ঘুরে তাকাল টিসার দিক, তারপর জানতে চাইল, 'কী যেন বোঝাপড়া আছে বলছিলে, সেনিওরা?'

ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে টলছে টিসা। 'তোমার সঙ্গে আমার এরকম কথা ছিল—নাহিদকে তুমি খুন করবে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'তোমাকে আমি বলিনি, নেশা করানোর বিনিময়ে আমার সমস্ত কিছু পাবে তুমি, কিন্তু ভাল আমি শুধু নাহিদকেই বাসব?'

'ভুলে যাচ্ছ, নাহিদ ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল? পুলিশকে সব বলে দিতে যাচ্ছিল ও।'

'তাই বলে আমার ভালবাসা তুমি কেড়ে নেবে?' জিজ্ঞেস করল টিসা, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে। 'ওর প্রাণ বাঁচিয়েও নিশ্চয়ই কিছু একটা করা যেত...'

হঠাৎ হাসল ইকো, তারপর আরেকটা চুমুক দিল গ্লাসে। 'তোমার অভিযোগ শুনে আমি কিছু মনে করছি না, কারণ জানি নেশার ঘোরে প্রলাপ বকছ তুমি।'

'একের পর এক ওদেরকে খুন করছ তুমি,' বলল টিসা। 'আমার বান্ধবী নোরা বার্ন, এজেন্সির মক্কেল মার্টিন ক্রো তোমার হাতে খুন হয়েছে—এটাও কি আমার প্রলাপ? মার্টিন ক্রোকে তো তুমি দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় আমার চোখের সামনে খুন করলে!'

'নোরা খুন না হলে তুমিই বিপদে পড়তে,' বলল ইকো। 'বিপদে অবশ্য সেই পড়তেই হলো তোমাকে,' শেষ কথাটা বিড়বিড় করে বলল, টিসা যাতে শুনতে না পায়।

'কী বলছ?'

'কিছু না,' বলল ইকো। 'তুমি ভুলে গেছ, নোরা যে সন্দেহ করছে, এটা তুমিই আমাকে বলো; তুমিই ওকে নতুন একটা ফ্ল্যাটে তুলেছিলে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'বাদ দাও। এবার অন্য একটা প্রসঙ্গ।'

'অন্য আবার কী প্রসঙ্গ?'

'তুমি হয়তো জেনে খুশি হবে না যে খুনের আরও দুটো ব্যাপার ঘটেছে। প্লিজ, আমাকে দায়ী কোরো না!' হেসে উঠে বলল ইকো। 'খুন দুটো করেছে তোমাদের শ্রদ্ধাভাজন মাসুদ ভাই—রানা। আর কাদেরকে খুন করেছে শুনবে?'

'মাসুদ ভাই কখনও মানুষ খুন করেন না,' গলায় দৃঢ়তা এনে বলবার চেষ্টা করলেও, ইকোর কানে টিসার কণ্ঠস্বর ফ্যাঁসফেঁসে লাগল। 'ওঁর হাতে মারা যায় শুধু নরাধম পশুরা।'

'কারা খুন হয়েছে, শুনতে চাও না?' জিজ্ঞেস করল ইকো।

কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে থাকল টিসা, একটু একটু টলছে।

'আমাকে সাহায্য করেছে সাইমন, সেটা জেনেও চুপ করে ছিল মলি,' বলল ইকো। 'এই অপরাধে ওদেরকে গুলি করে মেরেছে রানা।'

'কী? গুলি করেছে? নিজের এজেন্টদের? কাকে কী বোঝাও? অসম্ভব, আমি

বিশ্বাস করি না।'

'হায়, কাল সকালের কাগজ দেখার সুযোগ পেলে বিশ্বাস না করে পারতে না,' আবার ফিসফিস করল ইকো।

'কী বলছ বিড়বিড় করে?'

'কই, কিছু না তো।' হাসছে ইকো।

'তুমি জানলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল টিসা। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওই সময় ওখানে যেন তুমি ছিলে।'

'খুব একটা দূরে ছিলাম না,' সহাস্যে বলল ইকো। 'কী হয়েছে না হয়েছে কমবেশি দেখেছি।'

'ও, আচ্ছা, বুঝেছি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টিসা। 'এই দুটো খুনও তুমি করেছ!'

'ও-মা, এত বুদ্ধি তোমার!' বিদ্রূপাত্মক সুরে বলল ইকো। 'বুঝেই যখন ফেলেছ, কী করবে তুমি এখন?'

'অনেক হয়েছে, আর নয়,' বলল টিসা। 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি।'

'সেটা কীভাবে, একটু ব্যাখ্যা করবে, প্লিজ?' নতুন একটা চুইংগামের মোড়ক খুলছে ইকো।

উত্তর দিতে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল টিসা। 'আমি আত্মহত্যা করব।' আসলেও নিজ অপরাধের কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করবার কথা ভাবছে।

'প্লিজ, না, আমি চাই না এভাবে তুমি ফাঁকি দাও আমাকে,' বলল ইকো, কৃত্রিম গাম্ভীর্যে থমথম করছে চোখ-মুখ। তারপর ফিসফিস করল, 'বেশ্যা মাগী, আমাকে তুই খুনের নেশা থেকে বঞ্চিত করতে চাস!'

'তুমি ব্যঙ্গ করছ করো, তবে কিছু একটা করতে হবে আমাকে,' বলল টিসা। 'এই জীবনের প্রতি আমার আর কোনও ভালবাসা নেই।'

'তা হলে তো আর কারও কিছু বলার থাকে না,' বলে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ইকো। হাত উঁচু করে পরদার লাল একটা কর্ড ধরল, হুকের সঙ্গে ঝুলছে। আঙুল দিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ওটার শক্তি পরীক্ষা করছে।

'কী করছ তুমি?'

'এটা অসাধারণ একটা জিনিস,' বলল ইকো। 'বেশ কিছুদিন ধরে পরদার এরকম একটা কর্ড খুঁজছিলাম। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, তবে ঠিক এরকম একটা শেড কোথাও দেখিনি।' হুক থেকে কর্ডটা খুলে ল্যাম্পের দিকে এগোল ভাল করে পরীক্ষা করবার জন্য। 'মনে আছে কোত্থেকে কিনেছ?'

'প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছ তুমি,' বলল টিসা। 'শোনো। আমি আত্মহত্যা করব ঠিকই, তার আগে তোমারও একটা ব্যবস্থা করে যাব। একটা কাগজে তোমার সব ক্রাইমের কথা লিখে লেফটেন্যান্ট মার্লির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।'

'প্রসঙ্গ থেকে সরছি না,' মৃদুকণ্ঠে বলল ইকো, তার আঙুল থেকে লাল সাপের মত ঝুলছে কর্ডটা। 'কোত্থেকে এটা কিনেছ মনে করতে পারলে ভাল হত।'

'মনে নেই,' বলল টিসা, আড়চোখে টেলিফোনটার দিকে তাকাল। 'ওটা

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

রেখে এবার তুমি বিদায় হও, ইকো। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'মনে না থাকলে, নেই,' বলল ইকো, টিসার দিকে তাকিয়ে আছে, হলদেটে চোখ দুটো হঠাৎ করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। টিসাকে আরেকবার চোরাচোখে টেলিফোনটার দিকে তাকাতে দেখল সে।

টলতে টলতে ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগোল টিসা, চুল থেকে ক্লিপ খুলছে।

ওর পিছু নিয়ে হেঁটে আসছে ইকো, হাতের কর্ড দিয়ে লুপ বানাল। কলবেলের আকস্মিক আওয়াজে অটল মূর্তিতে পরিণত হলো সে।

ভ্রূ কুঁচকে মুখ তুলল টিসা। আয়নায় ইকোর প্রতিফলন দেখতে পেল। ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, হাত দুটো উঁচু করা, ওর মাথার উপর ঝুলে আছে লুপটা।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল টিসা, কী করতে যাচ্ছে ইকো। এক পাশে সরে যাওয়ার সময় টলে উঠল ও, পিছন ফিরল ইকোর দিকে। 'আমি দেখছি,' কোনও রকমে উচ্চারণ করেই ছুটল দরজার দিকে। বাধা দেওয়ার আগেই ইকোর নাগালের বাইরে চলে গেছে। 'কে?' প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইল।

শিকার আপাতত হাতছাড়া হয়ে গেছে বুঝতে পেরে দ্রুত পিছু হটল ইকো, তারপর স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়ল টিসার বেডরুমে।

'আমি ঝরনা, টিসা; দরজা খোলো,' প্যাসেজ থেকে ঝরনার গলা ভেসে এল।

টিসার বিশ্বাস হচ্ছে না রানা এজেন্সির কেউ এখানে আসতে পারে, দরজা খুলে আলোকিত প্যাসেজে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাল।

'কী হয়েছে তোমার? ভয় পেয়েছ নাকি?' টিসাকে দেখে জিজ্ঞেস করল ঝরনা, ওর হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে।

'শুধু ভয় পেয়েছি?' খসখসে গলায় বলল টিসা। 'আমি আতঙ্কিত। ভেতরে এক লোক...'

নিঃশব্দে বেডরুমের দরজা খুলে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ইকো, হাতে একটা .৩৮ পুলিশ স্পেশাল। ঝরনার মাথার দিকে তাক করল সেটা, বলল, 'হাতের ওটা পায়ের কাছে ফেলে দাও, ঝরনা, তারপর ঘরে ঢোকো।' চোয়াল নাড়ার ফাঁকে হাসছে সে। 'অপ্রত্যাশিত, তা সত্ত্বেও স্বাগতম।'

ঝরনার হাতে পিস্তল রয়েছে, কিন্তু সেটা ইকোর দিকে তাক করা নয়, টিসার পাশ ঘেঁষে সিটিং রুমের ভিতর তাকিয়ে আছে। ও দেখল, ইকোর দিকে ফিরতে হলে নব্বুই ডিগ্রি ঘুরতে হবে ওকে। তবে সময় পাওয়া যাবে না, তার আগেই গুলি করবে ইকো।

দরজার বাইরে উঁকি দিতেই ইকোকে দেখে টিসার একটা হাত মুখে উঠে গেল। 'আমার গলায় ফাঁস পরাতে যাচ্ছিল,' হতচকিত ঝরনাকে বলল ও, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল চৌকাঠের উপর।

উনিশ

রানার কথা শেষ হতে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল সলিসিটর সাবের। 'কঠিন বিপদ, রানা, অত্যন্ত কঠিন বিপদ,' শুকনো, ভারি গলায় মন্তব্য করল; তারপর চোখ বুজে ডুবে গেল গভীর চিন্তায়।

জিসানের দিকে তাকাল রানা। 'যেভাবেই হোক তোমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে ইকো...'

'মলি নিশ্চয়ই ভূত দেখেনি,' বিড়বিড় করল জিসান। 'কিন্তু, মাসুদ ভাই, আমার মাথায় ঢুকছে না কীভাবে এটা সম্ভব হলো।'

'ইকোর ফোন নম্বর আছে তোমার কাছে,' বলল রানা। 'রিং করে দেখতে পার বাড়িতে সে আছে কি না।'

রিং করল জিসান। অপরপ্রান্তে কেউ রিসিভার তুলছে না।

'তোর এখন একটা কাজই করার আছে, রানা,' বন্ধুকে বলল সাবের। 'আমার সঙ্গে হেডকোয়ার্টারে চল, সব কথা খুলে বল কমিশনারকে।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলল রানা। 'সরাসরি সহায়তা যদি না-ও করে, ইকোর ফিরে আসাটাকে অনেক পুলিশ অফিসার সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখছে—ভবিষ্যতে দু'পয়সা কামাবার লোভে। তা ছাড়া, আমার ওপর ওদের একটা পুরানো রাগ তো আছেই।'

'না,' মাথা নেড়ে বলল জিসান। 'আমি মনে করি মাসুদ ভাইয়ের আত্মসমর্পণ করাটা উচিত হবে না।'

'কেন উচিত হবে না?' রেগে উঠে জানতে চাইল সলিসিটর, রানার দিকে তাকাল। 'তুই বুঝতে পারছিস না, এই ফাঁদ থেকে বেরুবার এটাই তোর একমাত্র পথ?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না রে, দোস্ত, ব্যাপারটা ঠিক উল্টো,' বলল ও। 'একবার যদি ওদের হাতে গিয়ে পড়ি, বেরুবার আর রাস্তা রাখবে না। ওরা প্রায় সবাই আমাকে শত্রু বলে মনে করে।'

'ননসেন্স! তুই পালালে ডেথ ওয়ারেন্টে সই করা হবে! লড়াইটা তুই আমাকে লড়তে দে, রানা। তোকে আমি কথা দিচ্ছি, এমন ফাইট করব, আইনের জগতে ইতিহাস হয়ে থাকবে।'

'ইতিহাস দিয়ে কী হবে, মাসুদ ভাইকে যদি ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হয়?' মাথা নাড়ল জিসান। 'এ-সব বাদ, মিস্টার সাবের, আমরা কোর্টের বাইরে লড়াই করব।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ঠিক তাই। ইকোকে ধরতে পারলে ওর মুখ থেকে আসল কথা বের করা কঠিন হবে না।'

'জী, মাসুদ ভাই,' উৎসাহের সঙ্গে বলল জিসান। 'আমি ধরে আনি, আপনি

তার টুঁটি চেপে ধরুন।'

মাথার চুল প্রায় ছিঁড়ে ফেলছে সলিসিটর। হঠাৎ লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল, বলল, 'তোরা কিন্তু মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছিস!' ঝড়ের বেগে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'খুব ভাল করেই জানিস প্রয়োজনের সময় কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে।'

সলিসিটর চলে যাওয়ার পর দরজাটা বন্ধ করে দিল জিসান।

মেঝেতে পায়চারি শুরু করল রানা। 'ইকোকে ধরতে না পারলে পুলিশ আমার জীবন হেল করে ছাড়বে,' বলল ও।

'আমরা তাকে ঠিকই...'

'আরে, ঝরনা ফিরতে এত দেরি করছে কেন?' হঠাৎ মনে পড়তে পায়চারি থামিয়ে হাতঘড়ি দেখল রানা। কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে ঝুঁকল ও, নিচু টেবিলে রাখা ক্রেডল থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল ঝরনার মোবাইলে।

কপালের রেখা আরও গভীর হলো। অপরপ্রান্তে রিং হচ্ছে, কিন্তু ধরছে না কেউ। আরও কয়েকবার ডায়াল করল রানা। একই অবস্থা। ক্রেডলে রিসিভার রেখে সিধে হলো, বলল, 'ঝরনাকে একা ছাড়া উচিত হয়নি আমার। নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে ওর।'

'গেছে তো শুধু একটা ঠিকানা কনফার্ম করতে, তাই না, মাসুদ ভাই?' বলল জিসান। 'কোনও কারণে মোবাইলটা হয়তো বন্ধ করে রেখেছে। এসে পড়বে।'

'না, ব্যাপারটা দেখতে হয়,' বলল রানা, দরজার দিকে হাঁটা ধরল। 'আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না।'

এই সময় যেন ওকে বাধা দিয়েই ফোনটা বেজে উঠল। কাছাকাছি রয়েছে জিসান, হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলতে গেল।

ইতিমধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রানা, বাধা দিয়ে বলল, 'ধরো না, আগে ডিসপ্লেতে নম্বরটা দেখো। কেউ হয়তো খোঁজ নিচ্ছে আমি কোথায় আছি।'

ডিসপ্লের দিকে চোখ, জিসান বলল, 'নম্বর নয়, মাসুদ ভাই, একটা নাম দেখা যাচ্ছে—মন্টানা।'

'ক্যাটস্‌কিল শাখার নতুন এজেন্ট,' বলল রানা, দ্রুত চিন্তা করছে।

'কী করব, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল জিসান।

'ধোরো না,' সিদ্ধান্ত দিল রানা। 'তুমি শুধু আনসারিং মেশিনটা অন করো। জরুরি হলে মেসেজ দিক মন্টানা।'

তাই করল জিসান। আনসারিং মেশিনের সঙ্গে রেকর্ডিং মেশিনও নিজে থেকে চালু হয়ে গেল।

এরপর দুজনেই ওরা মন্টানার নার্ভাস গলা শুনতে পেল। 'জরুরি একটা মেসেজ দিচ্ছি। সোর্স: কোড টু-ফাইভ টু-ফাইভ।'

'কোড টু-ফাইভ টু-ফাইভ মানে,' জিসানকে বলল রানা, 'তথ্যটা আমাদের একজন ইনফরমার জানিয়েছে। কমিশনারের বাড়িতে চাকরি করে সে।'

'মিস্টার মাসুদ রানার গতিবিধি ভিডিও ক্যামেরায় তুলে পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। কে পাঠিয়েছে তা জানা যায়নি। ভিডিও করা একটা

দৃশ্যে দেখা গেছে মিস্টার লরেন্স সাইমনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন মিস্টার রানা,' অপরপ্রান্ত থেকে বলে চলেছে মন্টানা। 'দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা গেছে গাড়িতে ওঠার আগে ফুটপাথে জমা পানি দিয়ে জুতো আর ট্রাউজারে লেগে থাকা রক্ত পরিষ্কার করছেন মিস্টার রানা। ছবিতে তারিখ ও সময় দেয়া আছে; ডাক্তাররা বলছেন ঠিক ওই সময়ই খুন করা হয়েছে মিস্টার সাইমন ও মিস মলিকে—মিস্টার সাইমনের ফ্ল্যাটে।

'পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে মিস্টার রানার নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে। শুধু তাই নয়—ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওঁকে সশস্ত্র, বিপজ্জনক চরিত্র বলে প্রচার করতে। ওঁর খোঁজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে পুলিশ, তাদের ওপর নির্দেশ আছে মিস্টার রানা গ্রেফতার এড়াতে চাইলে গুলি করা যাবে। দ্যাট'স অল।'

তিন সেকেণ্ড কেউ কিছু বলল না।

নীরবতা ভাঙল জিসান, 'আপনার আর বাইরে বের হওয়া চলে না, মাসুদ ভাই।'

রানা গম্ভীর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'না।'

'ঝরনার ব্যাপারটা আমি দেখছি,' বলল জিসান। 'সাইন্স অ্যাকাডেমি স্ট্রিটে গেছে, তাই না, মাসুদ ভাই? পিয়ার্স টাওয়ার, টপ ফ্লোর?'

মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা। অসহায় বন্দি মনে হচ্ছে নিজেকে ওর। 'যত তাড়াতাড়ি পারো পৌঁছাতে চেষ্টা করো, জিসান।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় নেমে এসে হাঁটছে জিসান, গায়ের রেইনকোট টেনে-টুনে ভাল করে জড়াল। রাস্তার মাথায় পার্ক করা আছে ওর গাড়ি।

মেইন রোডে পাঁচ মিনিট গাড়ি চালিয়ে জিসানের ধারণা হলো, শহরে সম্ভবত অতিরিক্ত পুলিশ আনা হয়েছে, কিংবা সবার ছুটি বাতিল করে রাস্তায় টহল দিতে পাঠিয়েছে। খানিক পর পর একটা করে পুলিশ কার ছুটে যেতে দেখছে ও। সন্দেহ নেই রানা এজেন্সির ডিরেক্টরকে খুঁজতে বেরিয়েছে অফিসাররা।

আরও পনেরো মিনিট খুব সাবধানে গাড়ি চালাল জিসান। তারপর সামনে সাইন্স অ্যাকাডেমি স্ট্রিটের রোড সাইন দেখতে পেল, কিন্তু সেদিকে বাঁক নিতে গিয়েও নিল না, কারণ দেখল ওর দিকে আরেকটা পুলিশ কার ছুটে আসছে।

ড্রাইভারের পাশে বসা অফিসার রেডিও-ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল, জিসানকে ভাল করে দেখবার জন্য জানালা দিয়ে মুখটা বের করে দিল। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অফিসার।

পুলিশ কার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর গাড়ি ঘুরিয়ে সাইন্স অ্যাকাডেমি স্ট্রিটে ঢুকল জিসান। পিয়ার্স টাওয়ার খুঁজে বের করতে ওর কোনও সমস্যা হলো না। রাস্তা থেকেই দেখতে পেল দালানটা বাইশতলা, আলো জ্বলছে শুধু টপফ্লোরে।

গাড়িটা একটু দূরে রেখে টাওয়ারের গেট দিয়ে লবিতে ঢুকল জিসান। দারোয়ানের নাক ডাকার আওয়াজ স্বস্তি এনে দিল মনে। কয়েক পা এগোতেই

দেখল একটা এলিভেটরের মাথায় লেখা রয়েছে—'পেন্টহাউস'।

এলিভেটরে চড়ে টপফ্লোরে উঠে এল জিসান। প্যাসেজে নেমে দেখল দুটো দরজার নীচেই আলো দেখা যাচ্ছে। শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে কান পেতে অপেক্ষা করছে ও। এক মিনিট, দু'মিনিট। কোনও শব্দ পাচ্ছে না।

খালি হাতটা তুলে কলবেলের বোতামে চাপ দিল। আড়ষ্ট হয়ে অপেক্ষা করছে। দশ সেকেণ্ড পর আবার বেল বাজাল। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। ভাবল, ফ্ল্যাটে কেউ নেই নাকি? কিন্তু তা হলে আলো জ্বলবে কেন?

দরজার একপাশে সরে এসে হাতলটা সাবধানে ধরে মোচড় দিল জিসান। ওটা ঘুরছে দেখে দম আটকাল। কী ব্যাপার! তালা দেওয়া নয় কেন?

মৃদু ধাক্কা দিয়ে কবাটটা সবটুকু খুলে ফেলল। সাজানো- গোছানো সিটিংরুম খালি পড়ে রয়েছে ওর সামনে, কিন্তু মানুষজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভিতরে ঢুকে খুক খুক করে কাশল জিসান, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কেউ আছেন?' নাকে ব্র্যাণ্ডির ঝাঁঝ পাচ্ছে।

জবাব পাওয়া গেল না।

ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল জিসান। ঘুরে দাঁড়াবার পর এই প্রথম চোখে পড়ল ব্র্যাণ্ডির খালি গ্লাসটা; ফায়ার প্লেসের পাশে, কার্পেটের উপর দাঁড় করানো। একটু দূরে পড়ে রয়েছে ভাঙা গ্লাসের কয়েকটা টুকরো।

দৃশ্যটা জিসানের ভাল লাগছে না। এখানে সম্ভবত ধস্তাধস্তি, কিংবা মারামারি হয়েছে। কামরার চারদিকটা ভাল করে দেখছে ও, যদিও জানে না ঠিক কী খুঁজছে—এমন কিছু, যেটা থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কী কারণে দরজায় তালা দেওয়া হয়নি, কেনই বা ফ্ল্যাটে কেউ নেই।

সেটিতে সাদা কী যেন একটা পড়ে রয়েছে, দেখতে পেয়ে সাবধানে সেদিকে এগোল জিসান, একটা চোখ রেখেছে পাশের ঘরে ঢোকার দরজার উপর। ওটা মাত্র ইঞ্চি কয়েক খোলা।

জিনিসটা মেয়েদের একটা রুমাল, এককোণে দুটো হরফ এমব্রয়ডারি করা—J.H.।

খুশি হবে, নাকি উদ্বিগ্ন, বুঝতে পারছে না জিসান। এটুকু পরিষ্কার যে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে সফল হয়েছে ঝরনা, এখানে এসে টিসাকে পেয়েছে, তা না হলে ফ্ল্যাটের ভিতর ঢুকত না।

কিন্তু এর মানে কি টিসাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে ঝরনা? বেরুবার সময় আলো নেভাতে, দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে? দুটো ভুল একসঙ্গে করল? তাও দুজন?

না, এরকম হয় না।

টিসা নেশা করছিল, কলবেলের আওয়াজ শুনে হাত থেকে পড়ে যাওয়ায় ভেঙে গেছে গ্লাসটা? পাশের ঘরের দিকে এগোবার সময় ভাবছে জিসান। দরজায় হাত দিয়ে ঠেলল, আলোকিত বেডরুমেও নেই কেউ।

জিনিস-পত্র সব যেমন থাকবার কথা, স্বাভাবিক। তবে বাথরুমের দরজা ইঞ্চি কয়েক খোলা। কেন?

ওদিকে দ্রুত এগোল জিসান, চাপ দিল দরজায়। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও খুলল

কবাট। ও চাপ দেওয়ায় উল্টোদিকে বাড়ি খেল ভারী কিছু।

নীল-সাদা বাথরুমে ঢুকল জিসান, একটা বিট মিস করল ওর হার্ট। যা দেখতে পাবে বলে কিছুটা প্রস্তুত হয়ে ছিল তাই দেখতে পেল, তা সত্ত্বেও টিসার মরা মুখটার দিকে তাকানো মাত্র ওর পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

কবাটের গায়ে বিদঘুটে ভঙ্গিতে ঝুলছে টিসা। হাঁটু দুটো উঁচু হয়ে আছে, যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করবার চেষ্টায়; ফুলে রয়েছে মুখ, দু'সারি সাদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভ বেরিয়ে পড়েছে। লাল সিল্কের কর্ড ওর গলার চারধারে গভীর কামড় বসিয়েছে, হাত দুটো থাবা মারবার ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে থাকায় জিসান ধারণা করল জীবনের শেষ মুহূর্তে কাউকে যেন আঘাত করতে চেয়েছিল টিসা।

লাশের একটা হাত ধরল। এখনও গরম। চোখে কঠিন দৃষ্টি, এক পা পিছাল জিসান।

বেডরুম হয়ে সিটিং রুমে ফিরে গিয়ে চিন্তা করছে ও। পেন্টহাউসে এসে টিসার লাশ দেখতে পেয়েছে ঝরনা? নাকি আসবার পর, ওর সামনে খুন হয়েছে মেয়েটা?

পায়চারি শুরু করে জিসান অনুভব করল ওর জুলফি থেকে ঘাম গড়াচ্ছে। ভাবল, টিসা খুন হয়েছে, খুনি সম্ভবত ঝরনাকে ধরে নিয়ে গেছে, এ-কথা শুনলে কাভার ভেঙে বেরিয়ে আসবেন মাসুদ ভাই। বিশেষ করে ঝরনা ইকোর হাতে আছে জানলে কারও কথা শুনবেন না তিনি।

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল জিসান। ভাবল, ঝরনা বোধহয় এখন ইকোর হাতেই বন্দি। অন্য পথ ধরে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যায়নি তো? এটা হয়তো ফলস্ অ্যালার্ম।

ব্যাপারটা জানা দরকার। পায়চারি থামিয়ে ঝরনার বাড়িতে ফোন করল জিসান। শুনতে পেল অপরপ্রান্তে রিং হচ্ছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ও।

হঠাৎ ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, তারপর ভেসে এল অচেনা একটা কণ্ঠস্বর। 'হ্যালো, কে ফোন করছেন?'

সাবধানে জানতে চাইল জিসান, 'এটা কি ওয়েস্ট জোন ৪৯৭৭৫৪৩৮?'

'হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?'

গলার আওয়াজ মাসুদ ভাইয়ের নয়, পরিষ্কার বুঝতে পারছে জিসান। 'আমি মিস ঝরনা হকের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল ও।

'তিনি এখানে নেই,' অচেনা গলা বলল। 'আপনি কে বলছেন?'

'বারবার একই প্রশ্ন করছেন, জানতে পারি—আপনি কে? আর মিস হকের ফ্ল্যাটে কী করছেন, তিনি যখন নেই ওখানে?' জানতে চাইল জিসান।

'আমি হোমিসাইড ব্যুরোর লেফটেন্যান্ট মার্লি,' ধমকে উঠল অফিসার। 'সময় নষ্ট করবেন না! কে আপনি?'

রিসিভারটা তাড়াতাড়ি ক্রেডলে রেখে দিল জিসান।

বিশ

হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে, ঝরনার সিটিং রুমে পায়চারি করছে রানা; চোখ দুটো ঠাণ্ডা, কঠিন। কিছুক্ষণ পর পর হাতঘড়ি দেখছে। ফ্ল্যাট থেকে ঝরনার বেরিয়ে যাওয়ার পর দেড় ঘণ্টা পার হতে চলেছে। ওর খবর নিতে বেরিয়েছে জিসান, তাও চল্লিশ মিনিট হয়ে গেল।

পায়চারি থামিয়ে জানালার দিকে এগোল রানা, পরদার কোণ একটু সরিয়ে নীচের ভিজে রাস্তায় তাকাল।

বৃষ্টির ফোঁটা জানালার কাঁচে বিচিত্র সব নকশা তৈরি করছে।

এক মিনিট পর পরদা টেনে দিয়ে ওখান থেকে সরে আসতে যাবে, একটা গাড়ির উজ্জ্বল হেডলাইট দেখতে পেল। খুব দ্রুত ছুটে আসছে গাড়িটা। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার, ভাবল ঝরনা ফিরে আসছে?

রাস্তার মাঝখান থেকে সরে এসে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল কারটা। ওটার মাথায় লাল ফ্ল্যাশার দেখতে পেল রানা, তবে জ্বলছে না; গায়ে সাদা-কালো রঙ।

পুলিশ!

সাইরেন না বাজিয়ে ছুটে আসবার কারণ কী? ওরা কি জানে এখানে আছে ও? নাকি সম্ভাব্য জায়গায় খোঁজ নিতে বেরিয়েছে? কামরার আরেক মাথায় ফিরে এসে কোটটা হাতে নিল রানা, ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে ঘুরল, কিন্তু এক পা ফেলেই স্থির হয়ে গেল। কপালে চিন্তার রেখা।

এই ফ্ল্যাটের কোথায় কী আছে জানা নেই ওর। পিছন দিয়ে বেরুবার যদি কোনও ব্যবস্থা না থাকে? এক মুহূর্ত ইতস্তত করে কোটটা আবার চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখল, ভাবল, কোণঠাসা হয়ে থাকলে হয়েছে; পকেটমারের মত পালাতে গিয়ে ধরা পড়াটা অপমানকর। তা ছাড়া, পালানো কোনও সমস্যার সমাধান নয়। দেখাই যাক না কী বলে পুলিশ।

আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা, হাত দুটো পিছনে, কঠিন মুখ থমথম করছে।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল, কেউ আসছে না। ফলস্ অ্যালার্ম? পুলিশ অন্য কোথাও এসেছে? স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাবে, এই সময় তীক্ষ্ণ শব্দে কলবেল বেজে উঠল।

ঘুরল রানা, দ্রুত পায়ে চলে গেল নিচু টেবিলটার সামনে। ক্রেডল থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল সলিসিটর সাবেরের নম্বরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল সাবের। 'হ্যাঁ, বল, জেগে বসে আছি।'

'শোন,' বলল রানা। 'তুই-ই জিতলি। ওরা কলবেল বাজাচ্ছে।'

'কিচ্ছু বলবি না,' দৃঢ়স্বরে নির্দেশ দিল সলিসিটর। 'তোকে ওরা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবার আগেই ওখানে আমি পৌঁছে যাব। গোটা ব্যাপারটা

তুই আমার ওপর ছেড়ে দে। শুধু মুখ খুলবি না। জিসান কোথায়?'

'ও এখানে নেই। পারলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবি, বুঝলি, বলবি কোনওভাবেই যেন অ্যারেস্ট না হয়।'

'ঠিক আছে,' বলল সলিসিটর। 'সব আমাদের ওপর ছেড়ে দে।'

কিছু বলতে যাবে রানা, এই সময় আবার দরজায় বেল বাজল। 'ওরা অস্থির হয়ে উঠেছে। হেডকোয়ার্টারে দেখা হবে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল।

কামরার আরেক দিকে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলল রানা। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে লেফটেন্যান্ট মার্লি উইলিয়াম, একটা হাত কোটের পকেটে। তার দাঁড়ানোর ধরনটায়, অশালীন যদি কিছু না-ও থাকে, বেয়াদবির একটা ভাব আছে বলে সন্দেহ করল ও। লোকটার চেহারা ও আচরণে যে মার্জিত ভাব এতদিন দেখে এসেছে সেটা আজ অনুপস্থিত। তবে, ভাবল রানা, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে।

'হ্যালো, লেফটেন্যান্ট মার্লি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এটা আনএক্সপেক্টেট। তা কী মনে করে?'

'ভেতরে আসতে পারি, মিস্টার রানা?' বিনয়াবনত, এক পা বাড়িয়ে অনুমতি চাইল লেফটেন্যান্ট মার্লি।

'আপনি একা?'

'না, সঙ্গে একজন আছে,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'তাকে নীচে রেখে এসেছি।' এমন সুরে কথাটা বলল, এটার যেন বিশেষ কোনও অর্থ আছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা। 'ঢুকে পড়ুন।' হেঁটে আগুনের সামনে চলে গেল ও, তারপর মার্লির দিকে ফিরল।

সিটিং রুমে ঢুকল লেফটেন্যান্ট, দরজা বন্ধ করল। সন্দেহের দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

'আমি এখানে একা,' বলল রানা। 'ঝরনা বাইরে।'

ছোট্ট, কুচকুচে কালো গোঁফের উপর কড়ে আঙুলের নখ বুলাল লেফটেন্যান্ট। 'ব্যাখ্যা করে নিশ্চয় বলতে হবে না, মিস্টার রানা, কেন আমি এসেছি?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'আন্দাজে বাঘ মারা বহুকাল আগেই ছেড়ে দিয়েছি,' বলল ও। 'শোনা যাক কী বলার আছে আপনার।'

'আপনার নামে জোড়া খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'নিজ এজেন্সির অপারেটর লরেন্স সাইমন ও মলি চৌধুরিকে খুন করেছেন আপনি।' তার ছোট আকৃতির, কঠিন চোখ দুটো রানার দিক থেকে সরে গেল।

'এ কাজে আপনি আসায় অবাক হচ্ছি,' বলল রানা। 'আমার ধারণা আপনি আমাকে সার্ভিস দিতেই বেশি পছন্দ করেন। নাকি বলা উচিত করতেন?'

কিছু বলবার জন্য মুখ খুলতে যাবে লেফটেন্যান্ট, একটা হাত তুলে থামিয়ে দিল রানা। 'আরেকটা কথা। এই সার্ভিস দেয়ার ব্যাপারটা পারস্পরিক ছিল—মনে পড়ছে আপনার বাবার হার্ট অপারেশনের সময় বিশ হাজার ডলার, ছেলেকে ভাল স্কুলে ভর্তি করার জন্যে দশ হাজার ডলার, এভাবে গত দু'বছরে ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার ডলার রানা এজেন্সির সহায়তা তহবিল থেকে দেয়া হয়েছে আপনাকে।'

লেফটেন্যান্টের চোখমুখ আরও শক্ত হয়ে গেল। 'আমি এখনও সার্ভিস দিচ্ছি, মিস্টার রানা। সেজন্যেই আর কাউকে না পাঠিয়ে আমি নিজে এসেছি। ভাবলাম অ্যারেস্টটা আমি যদি করি, সবদিক থেকে সেটাই নিরাপদ হবে।'

রানার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'মানে?'

'গ্রেফতার এড়াতে গিয়ে বহু লোক পিঠে গুলি খায়,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ওপরমহলে এমন বহুলোক আছেন, আপনাকে খুন হতে দেখলে আনন্দে বগল বাজাবেন, মিস্টার রানা।'

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, পুলিশ কমিশনার...আর কে?'

একদিকের কাঁধটা একটু উঁচু করল লেফটেন্যান্ট। 'কী জানি, বলতে পারছি না। তবে আমার ধারণা, ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে আপনাকে একটা সার্ভিস দিচ্ছি আমি। কেসটা খারাপ, মিস্টার রানা। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বলছেন, ওয়াটারটাইট।'

রানা কিছু বলছে না, শুধু শুনে যাচ্ছে।

'অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই যে ওই সময় লরেন্স সাইমনের ফ্ল্যাটে আপনি গিয়েছিলেন,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'তাই না, মিস্টার রানা?'

'সলিসিটর আমাকে কথা না বলার পরামর্শ দিয়েছেন,' হালকা সুরে, হাসিমুখে বলল রানা। 'শুভানুধ্যায়ীর কথা আমাকে শুনতে হবে।'

'তা শুনুন,' বলল লেফটেন্যান্ট মার্লি। 'কিন্তু সলিসিটরও ভিডিও-র ছবি বিশ্বাস করতে বাধ্য। দিন-তারিখ দেয়া সচল ছবি মিথ্যে বলবে না।'

'যে ছবি তুলল সে নিশ্চয়ই জানত খুন করতে ওখানে কেউ যাবে,' বলল রানা। 'তারপরেও দু'দুটো খুন হতে দিল সে, খুনিকে পালিয়ে যেতেও বাধা দিল না—কোর্টে এ-সব প্রশ্ন উঠবে না?'

মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। 'হুম, তা ঠিক। এই কেস নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড হবে কোর্টে।'

রানা বলল, 'আপনাকে দেরি করিয়ে দিই কেন, চলুন বেরিয়ে পড়ি।' দরজার দিকে এগোবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, অমনি ঝরনার টেলিফোনটা বেজে উঠল।

দুজন একযোগে হাত বাড়ালেও, ক্রেডল থেকে রিসিভারটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল লেফটেন্যান্ট মার্লি।

চোখ সরু করে তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, থমথম করছে চেহারা।

'হ্যালো, কে ফোন করছেন?' অপরপ্রান্তের কথা শুনে আবার বলল, 'হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?' আবার শুনল, তারপর বলল, 'তিনি এখানে নেই। আপনি কে বলছেন?'

রানার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা শিরশিরে ভাব নেমে গেল। বোঝাই যাচ্ছে যে জিসান ফোন করে ঝরনার কথা জানাতে চাইছে।

'আমি হোমিসাইড ব্যুরোর লেফটেন্যান্ট মার্লি,' ফোনে ধমকে উঠল লেফটেন্যান্ট। 'সময় নষ্ট করবেন না! কে আপনি?'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বিড়বিড় করে গালি দিল সে, তারপর নিজেই ডায়াল করল একটা নম্বরে। 'অপারেটর! লেফটেন্যান্ট মার্লি, পুলিশ

হেডকোয়ার্টার। কোত্থেকে করা হলো কলটা?' বিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, তারপর বলল, 'ধন্যবাদ। আমাকে হেডকোয়ার্টারের লাইন দিন।' আবার কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হলো। 'রবিন? মার্লি। প্রথমে ঠিকানাটা লিখে নাও।' দ্রুত বলে গেল ঠিকানাটা। 'এখনই একটা গাড়ি নিয়ে চলে যাও ওই পেন্টহাউসে। ওখানে কিছু সমস্যা হয়ে থাকতে পারে। কী দেখলে রিপোর্ট করবে আমাকে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। 'আপনার বিরুদ্ধে আরেকটা খুনের অভিযোগ আনা হলে আমি একটুও বিস্মিত হব না, মিস্টার রানা।'

কথা না বলে কঠিন চোখে লোকটাকে দেখছে রানা।

'ফোনটা করা হয়েছে পিয়ার্স টাওয়ারের পেন্টহাউস থেকে। ওখানে রানা এজেন্সির সানসিটি শাখার এজেন্ট টিসা হাসান থাকে। ফোনটা কে করেছিল, তা-ও আমি জানি। প্রশ্ন হলো, জিসান ওখানে কী করছে? মিসেস হাসানই বা টেলিফোন ধরছেন না কেন?'

'জিসান?' ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'ও ওখানে?'

'জিসান যে আপনাদের একজন স্লিপার এজেন্ট, এ তথ্য টিসা হাসানের কাছ থেকে আগেই পেয়েছি আমরা। সেই থেকে ওর গতিবিধি মনিটর করছি আমরা। টেলিফোনে ওর গলা আগে শুনেছি, তাই চিনতে পারলাম। ওখানে কী করছে সে, মিস্টার রানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি তার কী জানি।'

'শুনলাম চেষ্টা করা হচ্ছে টিসা হাসান যাতে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেন,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'কমিশনারও বলেছেন, ওই সাক্ষীর নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয়।'

'তার নিরাপত্তা তিনি নিজেই যদি নষ্ট করে বসেন, কার কী করার আছে,' বলল রানা। 'আমরা যাব কি না?'

'আমরা অপেক্ষা করব,' সুরে কাঠিন্য এনে বলল লেফটেন্যান্ট, কামরার চারদিকে হাঁটাহাঁটি করছে, বারবার তাকাচ্ছে রানার দিকে।

একটা সোফায় বসল রানা। মুখের ভিতরটা শুকনো লাগছে, হার্টবিট যেন ছন্দ খুঁজে পাচ্ছে না। টিসার ওখানে কী হয়েছে না হয়েছে তা অন্তত জানা যাবে এখন।

নীরবে অপেক্ষা করছে ওরা। ফায়ার প্লেসের মাথার উপর রাখা ঘড়িটা টিকটিক আওয়াজ করছে।

আট মিনিট পর টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলল লেফটেন্যান্ট। 'বলো, আমি মার্লি,' বলল সে। '...কী বললে?...ওহ্, গড! জিসানকে ওরা ধরেছে?...সব টহল কারে ওর চেহারার বর্ণনা পাঠিয়ে দাও। দশ মিনিট আগেও ওখানে ছিল সে। ...ওকে আমি চাই, ব্যস।... হাতের কাজ সেরে আসছি আমি। ...টিমোথিকে সামলাতে বলো।' ঝনাৎ করে রিসিভারটা রেখে দিল সে।

নিজেকে শক্ত করল রানা। লেফটেন্যান্টের হাবভাব দেখেই বুঝে নিয়েছে খারাপ কিছু ঘটেছে।

'আপনার সানসিটি শাখার এজেন্ট টিসা হাসানকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে,' বলল লেফটেন্যান্ট, রাগে তার সাদা চামড়া টকটকে লাল হয়ে উঠল। 'শুনে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, মিস্টার রানা? জিসানকে পাঠিয়ে এই খুনটাও আপনি করাননি তো? ওঁর মুখ বন্ধ করার জন্যে?'

'মারা গেছে?' সোফা ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে রানা।

'খুন হয়েছে। আপনার আরেক এজেন্ট নোরা বার্নের মত দরজার পেছনে ঝুলছে।'

টিসার জন্য শোক করবার, কিংবা ওকে ক্ষমা করবার সময় পর্যন্ত পাচ্ছে না রানা; মনে প্রশ্ন জাগল, ঝরনা কোথায় গেল?

ঠাণ্ডা হিম একটা ভয় চেপে বসছে ওর বুকে। যেভাবেই হোক জানতে হবে কোথায়, কেমন আছে ঝরনা।

'পঞ্চাশ হাজারে কিছু কেনা যায়, লেফটেন্যান্ট?' শান্তকণ্ঠে জানতে চাইল রানা, মার্লির মুখে স্থির হয়ে আছে চোখ।

'ছেলেমানুষিরও একটা সীমা থাকা উচিত !' তিরস্কার মেশানো বিদ্রূপের সুরে বলল লেফটেন্যান্ট। 'এখনও বুঝতে পারছেন না, আপনার দিন শেষ হয়ে গেছে! কমিশনার এমন ব্যবস্থা করেছেন, কাল সকাল থেকে ফ্লোরিডার কোনও ব্যাঙ্ক আপনার চেক নেবে না। যার কাছে টাকাই নেই, সে পঞ্চাশ হাজার ডলার অফার করে কীভাবে! চলুন, এবার আমরা রওনা দিই।'

'ক্যাটস্‌কিল অফিসে প্রচুর টাকা আছে,' বলল রানা। 'বোকামি করবেন না। কেউ জানে না কোথায় আছি আমি। বেরিয়ে যাবার একটা পথ করে দিন আমাকে, পঞ্চাশ হাজার...ঠিক আছে, এক লাখই সই, পকেটে ভরে নিয়ে চলে যাবেন।'

নিঃশব্দে হাসছে লেফটেন্যান্ট। 'এই মুহূর্তে আপনার সেফের পাশে একজন অফিসার বসে আছে। সম্ভাব্য সমস্ত দিক কাভার করেছেন কমিশনার। ফ্লোরিডায় আপনার আসলে কোনও টাকাই নেই। আসুন!' হঠাৎ প্রায় ভোজবাজির মত তার হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল। 'কিছু মনে করবেন না, স্রেফ নিয়ম রক্ষা, আপনাকে সার্চ করব আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ও এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ঝরনাকে বিপদের মধ্যে রেখে কোনমতেই হাজতে ঢুকবে না। শান্ত, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মার্লির দিকে এগোল।

'হল্ট!' অকস্মাৎ প্রায় গর্জে উঠে সরাসরি রানার বুকে পিস্তল তাক করল লেফটেন্যান্ট। 'কোনও রকম চালাকি নয়, মিস্টার রানা।' রানাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে নার্ভাস একটু হাসল। 'দ্যাট'স বেটার। এবার দয়া করে পেছন ফিরুন।'

অগত্যা বাধ্য হয়ে পিছন ফিরল রানা।

'সার্চ করার সময় যদি বুঝি গোলমাল করতে যাচ্ছেন, আপনার শিরদাঁড়া গুঁড়ো হয়ে যাবে,' বলে রানার মেরুদণ্ডের উপর মাজল ঠেকাল লেফটেন্যান্ট, এক হাতে দ্রুত সার্চ করল। ওর শোল্ডার হোলস্টার থেকে টান দিয়ে বের করে নিল ওয়ালথারটা, রেখে দিল ওভারকোটের পকেটে। 'এবার ঘুরুন, আমাকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যান।'

হাসল রানা। 'এত নাটকীয়তা না করলেও পারেন, লেফটেন্যান্ট। আমি যদি পালাইও, যাব কোথায়? লড়াইটা কোর্টে চালাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'আর কোনও কথা নয়,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'দেখে-শুনে, শান্ত ভাবে হাঁটুন।'

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। চার প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে নীচের লবিতে নামল। শেষ ধাপটার পাশে, দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাল-মুখো ডিটেকটিভ, অলসভঙ্গিতে টুথপিক চিবাচ্ছে। রানাকে একবার আপাদমস্তক দেখল, তারপর মার্লির দিকে তাকাল।

'চলো, যাওয়া যাক,' ধৈর্য হারানোর সুরে বলল লেফটেন্যান্ট। 'এই লোককে ভেতরে ভরার পরেও হাতে একটা মার্ডার কেস আছে।'

'ফর গড'স্ সেক!' চোখ-মুখ কুঁচকে অসন্তোষ প্রকাশ করল ডিটেকটিভ 'ভাবছিলাম লেট নাইট বক্সিংটা দেখতে যাব, তা আর হলো না।'

লাল-মুখোর পিছু নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। পুলিশ কারের ড্রাইভিং সিটে বসল ডিটেকটিভ। গাড়ির পাশে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ওর শিরদাঁড়ায় পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে খোঁচা মারল লেফটেন্যান্ট।

'কোনও রকম চালাকি করতে দেখলেই,' হিসহিস করে বলল সে, 'আপনার নাড়িভুঁড়ি রাস্তায় ছড়িয়ে দেব।'

'সম্মানিত একজন সিটিজেনকে আপনি খুব কম সম্মানই দেখাচ্ছেন,' বলে একটু হাসল রানা।

'ভেতরে!' ধমকের সুরে বলল লেফটেন্যান্ট। 'সাবধানে!'

কিছু করবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না, অগত্যা বাধ্য হয়ে পুলিশ কারে উঠল রানা, ওর পিছু নিয়ে মার্লিও।

'ওকে, জনসন,' ডিটেকটিভকে বলল সে। 'যত জোরে পারো!'

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল লাল-মুখো অফিসার।

অটল বসে আছে রানা, বুকের পাশের একটা হাড়ে পিস্তলের কঠিন স্পর্শ অনুভব করছে। ওর ভিতরটা প্রচণ্ড রাগে টগবগ করে ফুটছে। রাগ শুধু শত্রুদের উপর নয়, নিজের ওপরও—সময়মত সাবধান না হওয়ায়, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার জন্য। এখন আর পালানো সম্ভব নয়।

একটু পরেই বুঝতে পারল রানা, ওরা পুলিশ হেডকোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছে না। তারপর উপলব্ধি করল শহরতলির দিকে ছুটছে কার, তা-ও প্রধান সড়কগুলোকে সযত্নে এড়িয়ে। একটা ব্রিজ পেরিয়ে শহরটাকে পিছনে ফেলে এল কার। যা বোঝার বুঝে নিল ও।

'মতলবটা কী?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল রানা। 'হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি না কেন?'

শব্দ করে মৃদু হাসল লেফটেন্যান্ট। 'প্রথমে জরুরি একটা কাজ সারতে হবে আমাকে। রিল্যাক্স, ভয় পাবেন না। কোথাও যাবার তাড়াহুড়ো নেই আপনার।'

'অথচ তারপরেও সেখানে উনি ঠিকই পৌঁছে যাবেন,' হেসে উঠে বলল লাল-মুখো ডিটেকটিভ।

একুশ

পেশি ঢিল করে দিয়ে সিটের এক কোণে হেলান দিল রানা। ওর বোঝা উচিত ছিল যে-লোক মাত্র একজন ডিটেকটিভকে সাঙ্গ নিয়ে ওকে অ্যারেস্ট করতে এসেছে, এক লাখ ডলারের লোভও সংবরণ করতে পারে, নিশ্চয় অন্য কোথাও বাঁধা পড়েছে তার আনুগত্য। সেই বাঁধন অত্যন্ত শক্তও বটে। মার্লির উপর নির্দেশ আছে, মাসুদ রানাকে বাঁচিয়ে রাখবার দরকার নেই।

নির্দেশটা নির্দিষ্ট একজন দিয়েছে, তা না-ও হতে পারে। ইকো ভিটোরিকে যারা সাহায্য করছে তাদের তালিকা খুব একটা ছোট হওয়ার কথা নয়।

লেফটেন্যান্টের হাতে ধরা পিস্তলটা দেখল রানা। ওর দিকে তাক করা ওটা, ট্রিগারে আঙুল পেঁচানো। সিদ্ধান্ত নিল, গাড়ির ভিতর কিছু শুরু করে লাভ নেই। সুযোগটা নিতে হবে গাড়ি থেকে ওরা বেরুবার পর।

এই মুহূর্তে নদীর কিনারা ঘেঁষে এগোচ্ছে ওরা। গাড়ির ছাদে ড্রাম বাজাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা। উইণ্ডশিল্ড পরিষ্কার রাখবার জন্য আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অনবরত অর্ধবৃত্ত তৈরি করছে উয়াইপার।

এত রাতে নদীর ধারে কেউ নেই, চারদিক ফাঁকা পড়ে আছে। কাউকে খুন করতে হলে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না, ভাবল রানা। মাথায় একটা গুলি করো, তারপর ফেলে দাও নদীতে; ব্যস, ঝামেলা শেষ।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল লেফটেন্যান্ট, 'ঠিক আছে, জনসন।' তার গলায় আঁটসাঁট, ধাতব একটা সুর।

পুলিশ কারের স্পিড কমাল ডিটেকটিভ। বড়সড় একটা গুদামঘরের ছায়ায় থামল।

'নামুন!' কর্কশ, ধমকের সুরে হুকুম করল লেফটেন্যান্ট।

রানা বুঝল, মুখোশটা পুরোপুরি খুলছে মার্লি। তবে এরকম আচরণের পিছনে অপরাধ বোধেরও একটা ভূমিকা থাকে।

তার দিকে তাকাল রানা। 'কী এটা?' জানতে চাইল। 'আনঅফিশিয়াল এক্সিকিউশন?'

ওর পাঁজরে মাজল ঠেসে ধরল লেফটেন্যান্ট। 'বেরোও শালা!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'আমি চাই না গাড়িতে তোমার রক্ত পড়ুক।'

নিজের দিকের দরজা খুলছে রানা, তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে এল ডিটেকটিভ, টান দিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করছে। লেফটেন্যান্ট না বেরুনো পর্যন্ত রানাকে কাভার দিল সে।

'সাক্ষী রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, লেফটেন্যান্ট,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'আমাকে তুমি খুন করলে ডিটেকটিভ তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করবে।'

হেসে উঠল জনসন। 'আমি আর লেফটেন্যান্ট একটা টিম হিসেবে কাজ করি,

বন্ধু,' বলল সে। 'আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, তোমার আল্লাহকে ডাকো।'

হাতের পিস্তল তুলে রানার বুকে লক্ষ্যস্থির করল লেফটেন্যান্ট। 'তোমার পাওনা বুঝে নাও, মাসুদ রানা,' বলল সে, ট্রিগারে চাপ বাড়াচ্ছে। 'পিছিয়ে দেয়ালের দিকে যাও।'

পিছানোর সময় একটু তির্যক পথ ধরল রানা, তাতে নদীর কিনারা আরেকটু কাছে চলে এল, কিন্তু তারপরেও অনেক দূর—ছুটে গিয়ে নিরাপদে পানিতে পড়ার সময় পাওয়া যাবে না।

'নদীতে ঝাঁপ দেবে?' ও কী ভাবছে বুঝতে পেরে হাসছে লেফটেন্যান্ট। 'তা দাও না, দাও! আমি না হয় তোমার খুলির পেছনটা উড়িয়ে দেব। যাও, আরেকটু সরো ওদিকে। তারপর ঘুরে দৌড় দাও।'

রানা জানে, মৃত্যু বোধহয় আর দু'তিন সেকেণ্ড দূরেও নয়। বিস্মিত হয়ে উপলব্ধি করল, এতটুকু ভয় পাচ্ছে না ও: ভিতরে শুধু একটা নিষ্ফল আক্রোশ থেকে যাচ্ছে, হাতের নাগালে ইকোকে পাওয়া হলো না। আর বাঁচার কথা যদি ওঠে, শেষ একটা চেষ্টা না করে কী কেউ মরে!

এক পা সরতে যাচ্ছে রানা, এরপরেই লাফ দেবে মার্লিকে লক্ষ্য করে—যা আছে কপালে। হঠাৎ চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'তোমরা পেছনটা একবার দেখবে না, লেফটেন্যান্ট?'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল মার্লি। 'এ-সব পুরনো কৌশলে কি কাজ...' ট্রিগারে তার আঙুল চেপে বসছে।

'লেফটেন্যান্ট!' অকস্মাৎ আঁতকে উঠল ডিটেকটিভ জনসন।

মনোযোগ ছুটে গেল মার্লির। জনসনের গলায় এমন কিছু আছে, ঘাড় না ফিরিয়ে পারছে না সে। আর এই সুযোগে বাঘের মত তার উপর লাফিয়ে পড়ল রানা।

আবার রানার দিকে ফিরছে লেফটেন্যান্ট, সেই সঙ্গে ট্রিগারও টেনে দিচ্ছে, চোখে আতঙ্ক। গুলি বেরুবে, এক পলক আগে তার নাগাল পেল রানা। ওর বগলের তলায় ঢুকে পড়ল পিস্তল সহ মার্লির লম্বা করা হাত। গুলির আওয়াজ হলো ওর কানের ঠিক পিছনে।

একটা নয়, গুলি হয়েছে দুটো, দ্বিতীয় গুলিটা অন্য কারও পিস্তল থেকে। মার্লির গুলি কাউকে লাগেনি, সোজা ছুটে গিয়ে রানার পিছনের দেয়ালে বিঁধেছে। কিন্তু অপর পিস্তলের গুলি জনসনের ডান কাঁধের খানিকটা উড়িয়ে দিয়েছে। মাটিতে পড়ে ব্যথায় চেঁচাতে শুরু করল সে।

মার্লির পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল রানা, কোঁত করে আওয়াজ ছেড়ে কুঁজো হয়ে গেল সে, হাতের পিস্তল ছেড়ে দিল। এই সময় দ্বিতীয় পিস্তলটা আবার গর্জে উঠল। একটা ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে পড়ল লেফটেন্যান্ট, গুলিটা তার হাঁটুর পিছন দিয়ে ঢুকে মালাইচাকিটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। জনসনের সঙ্গে সে-ও এবার ব্যথায় কাতরাতে শুরু করল, যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

দৃষ্টিপথে এখন আর কোনও বাধা না থাকায় রয় ফিজিওকে পরিষ্কার দেখতে

পাচ্ছে রানা। পুলিশ কারের পিছন দিক থেকে হেঁটে আসছে ও।

'মনে হলো, বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেছে, বস্,' সহাস্যে বলল রয়। মার্লির নিতম্বে একটা লাথি মেরে বলল, 'এই ব্যাটা হারামি লেফটেন্যান্টকে কক্ষনো বিশ্বাস করতে পারিনি।'

এক পা পিছিয়ে মার্লির পিস্তলটায় লাথি মারল রানা। তারপর কয়েক পা এগিয়ে জনসনের পিস্তলেও আরেকটা লাথি মারল, দুটোই নদীতে গিয়ে পড়ল। 'উফ্! বুট থেকে তুমি যদি আরেকটু দেরি করে বেরুতে, আমার ভবলীলা বোধহয় সাঙ্গ হয়ে যেত, রয়,' বলল ও, ঝুঁকে যন্ত্রণায় কাতর মার্লির ওভারকোটের পকেটে হাত গলাল, আলগোছে বের করে নিল নিজের ওয়ালথারটা।

'চাইছিলাম যেন কোনও আওয়াজ না হয়,' বলল রয়। 'এই ভক্ষক দুজনকে নিয়ে কী করব, বস্?' জানতে চাইল।

'ঘণ্টা কয়েক অচল করে রাখো,' বলল রানা। 'কীভাবে করবে?'

'পানির মত সোজা,' বলে এগিয়ে এসে মাটিতে পড়ে থাকা জনসনের মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারল।

সেটা দেখে ক্রল করে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে লেফটেন্যান্ট মার্লি।

রানা বলল, 'এই, যাচ্ছ কোথায়?' দাঁতে দাঁত পিষল ও। 'ইচ্ছে হচ্ছে কপালটা ফুটো করে দিই।'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকল লেফটেন্যান্ট। 'পুলিশের গায়ে হাত দিয়ে এ-দেশে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি,' চোখ-মুখ বিকৃত করে বলল সে। 'তোমরাও পাবে না।'

তার খুলির পিছনে জোরসে একটা বাড়ি মারল রয়। অজ্ঞান হয়ে গেল মার্লি।

'ওদের সঙ্গে থাকো, রয়,' বলল রানা। 'টেনে আড়ালে কোথাও সরিয়ে নাও। আমার দু'ঘণ্টা লাগবে।'

'বস্, একটা অনুরোধ,' ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল রয়। 'তাড়াহুড়ো করে একা কিছু করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমি ফোন করে আমাদের ফোর্সকে আনাচ্ছি।'

'ওদের সঙ্গে থাকো, রয়,' তীক্ষ্ণসুরে বলল রানা। 'এটা আমার অর্ডার।' হেঁটে গিয়ে পুলিশ কারের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল।

স্টার্ট দেওয়ার পর জানালার দিকে ঝুঁকল রানা। 'ধন্যবাদ, রয়। রানা এজেন্সি সব সময় তোমাদেরকে সার্ভিস দেবে, ঠিক তোমরা যেভাবে দিচ্ছ।'

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল ও, তারপর শহরের দিকে ছোটাল।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ফোর্সকে খবর পাঠাতে শুরু করল রয় ফিজিও।

বাইশ

জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মিটমিট করছে ঝরনা। হলুদ রঙের একটা ল্যাম্প থেকে আলো পড়ছে সিলিঙে। ওই আলো ছুরির মত আঘাত করছে ওর মাথার ভেতর। চোখ বুজল তাড়াতাড়ি, কান্না ঠেকানোর জন্য ঠোঁট কামড়ে ধরল।

কয়েক মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকল, অজ্ঞান থাকার ফলে যে ধোঁয়াটে ভাব তৈরি হয়েছে ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে সেটা, সেই সঙ্গে ফিরে আসছে চিন্তাশক্তি। কোথায় যেন ছিল ও? মনে আছে জ্ঞান হারিয়ে একটা চৌকাঠের উপর পড়ে যায় টিসা। মনে আছে হাঁটু মুড়ে বসে টিসার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল ও। তারপর বাতাস কাটবার একটা তীব্র শব্দ শুনেছে। বুঝতে পেরেছে, কিছু একটা আঘাত করবে ওকে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

আবার চোখ মেলল ঝরনা। এবার আর আলোটার দিকে তাকাচ্ছে না। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখে গরম সুই বেঁধানোর অনুভূতিটা আর থাকল না।

এটা নিশ্চয়ই কোনও জাহাজের কেবিন হবে, ভাবল ঝরনা। লাকশারি কেবিন, লালচে-খয়েরি ওয়ালনাট কাঠের ফার্নিচার দিয়ে সাজানো, শুধু মূল্যবান নয়, রুচিশীলও। একটা বিছানায় শুয়ে রয়েছে ও। হঠাৎ আঁতকে উঠল, দ্রুত দেখে নিল পরনে কিছু আছে কি না।

গায়ে রেইনকোট নেই, পায়ে জুতো নেই। বাকি সব ঠিক আছে। না, নেই—ওর হাতে পিস্তল ছিল, সেটা কোথাও নেই। ধীরে ধীরে মাথাটা তুলল ও, খুলির পিছনে ব্যথা লাগায় চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল।

'আমাদের মাঝে ফিরে এলে তুমি, সত্যি ভাল্লাগছে,' কাছাকাছি থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ চমকে দিল ঝরনাকে। ঝট করে বাম দিকে তাকাল ও।

লম্বা-চওড়া এক লোক, যেন কুস্তিগির, একটা আর্মচেয়ারে বসে রয়েছে, ওটার পিঠ কেবিনের বন্ধ দরজার গায়ে ঠেকানো। লোকটার ডান জুলফির নীচ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত শুকনো একটা ক্ষতচিহ্ন। বাম চোখের উপর কালো পট্টি বাঁধা। ব্যাণ্ডেজ করা কবজির যত্ন নিচ্ছে লোকটা।

'আঘাতটা নিশ্চয় খুব জোরালো ছিল,' বলল লোকটা। 'জ্ঞান ফিরতে এক ঘণ্টারও কিছু বেশি লাগল।'

লোকটার চোখের দৃষ্টি দেখে স্কার্টটা টেনেটুনে যতটুকু পারা যায় নীচের দিকে নামিয়ে দিল ঝরনা।

'উত্তেজিত হয়ো না,' সিগারেটের প্যাকেট খোলার সময় বলল একচোখো লোকটা। 'এরকম সুন্দর পা এই প্রথম দেখছি না।' মুখের এক কোণে সিগারেট ঝুলিয়ে দেশলাই জ্বালল।

'আমি কোথায়?' ঝরনার নিজের কানেই কাঁপা কাঁপা শোনাল গলাটা।

'মিস্টার ইকোর ইয়টে,' বলল দাগী লোকটা। 'একটু পরেই চলে আসবেন

তিনি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'তুমি কে?' আধবসা হয়ে জিজ্ঞেস করল ঝরনা।

'আমাকে ম্যাক বলতে পার, কিংবা আর্থার,' বলে নিঃশব্দে হাসল আর্থার। 'মিস্টার ইকোর যারা কাজ করে, আমি তাদের লিডার। সেজন্যেই এত যত্ন নিচ্ছি তোমার। তুমি কিছু জানতে চাও?'

'এখানে আমাকে নিয়ে এল কে?'

'বললাম না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান তিনি। শোনো, কোনও স্বপ্ন পুষে লাভ নেই। সত্যি কথা বলতে কী, তুমি আর বেশিক্ষণ বেঁচে নেই,' বলে ভাল চোখটা টিপল আর্থার—গাল কুঁচকে ওঠায় টের পাওয়া গেল, ওটা চোখের পাতা ফেলা নয়। 'মিস্টার ইকো এত দ্রুত লাশ ফেলছেন, গোনা ছেড়ে দিয়েছি। আজ রাতে টিসাকে ফেলেছেন। সুন্দরী মেয়েদের এরকম অপচয় দেখে বুকটা ভেঙে যাচ্ছে আমার, কিন্তু কিছু করার নেই, তিনি ওরকমই। তুমি জানো, টিসার গলাটা লম্বা করে দিয়েছেন মিস্টার ইকো?'

হঠাৎ অসুস্থ বোধ করল ঝরনা।

'তবে তুমি যদি আমাকে সুযোগ-সুবিধে দাও,' বলল আর্থার, আবার ডান চোখটা টিপল, 'মিস্টার ইকোকে বলে তোমার বাঁচার ব্যবস্থা আমি করতে পারব।'

'তোমাকে কাছে আসতে দেখলে আমি চেঁচাব!' কঠিন সুরে সাবধান করে দিল ঝরনা, জানে কোনও মেয়েকে একা পেলে ভিলেনের অনুপস্থিতিতে সহযোগীরা বেপরোয়া হয়ে উঠতে চায়।

মুখটা হাঁড়ি করল আর্থার, সিগারেটের ছাই ফেলল মেঝেতে। 'মিস্টার ইকো ইয়ট ছেড়ে চলে গেলে, যত খুশি চেঁচিয়ো। মিস্টার ইকো ছাড়া আমাদের ছয় মাইলের মধ্যে আর কেউ নেই। তা, ঠিক আছে, তুমি যদি সহযোগিতা না করো, না-ই করলে। এক-আধটু বাধা পছন্দ করি আমি।'

ঝরনা কিছু বলল না। চোরা চোখে কামরার চারদিকে তাকিয়ে পালাবার কোনও পথ করা যায় কি না দেখছে। না, শুধু দরজা দিয়েই বেরুনো যায়। কিন্তু দরজার গায়ে চেয়ার ঠেকিয়ে বসে আছে গুণ্ডাটা। ওর সঙ্গে জোরাজুরি করে পারবে না।

কিছু শোনার ভঙ্গিতে মাথাটা একদিকে কাত করল আর্থার, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। 'মিস্টার ইকো আসছেন,' বলল সে। 'সাবধান কিন্তু, ওঁকে খেপিয়ে দিয়ো না! খেপে গেলে উনি আর মানুষ থাকেন না!'

চেয়ারটা সরাল আর্থার, পরমুহূর্তে খুলে গেল দরজা।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কেবিনের ভিতর তাকাল ইকো, তার চোয়াল অনবরত নড়ছে, হাত দুটো পকেটে, হলুদাভ চোখ জোড়া স্থির হলো ঝরনার উপর। 'গেট আউট!' কেবিনের ভিতর ঢুকে হুকুম করল আর্থারকে।

একটাও শব্দ না করে বস্‌কে পাশ কাটাল প্রকাণ্ডদেহী আর্থার, তারপর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

চেয়ার টেনে বসল ইকো। 'দুঃখিত, মিস ঝরনা। আসলে, বাধ্য হয়ে তোমাকে আমার আঘাত করতে হয়েছে। কিন্তু তুমি খুব বিচ্ছিরি একটা সময়ে

হাজির হলে। কেন গিয়েছিলে?'

'আমাকে এখানে নিয়ে আসার কারণ কী?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল ঝরনা, পা দুটোকে নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসল।

'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে,' বলল ইকো, গলার সুরে অকস্মাৎ ঘরঘরে একটা ভাব চলে এল। 'সহযোগিতা না করলে ম্যাককে ডেকে তার হাতে তুলে দেব তোমাকে, তখন আমার বদলে সে-ই কথা আদায় করবে—যেভাবে পারে। বলো, কেন তুমি টিসার পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলে?'

ইতস্তত করছে ঝরনা। ঠাণ্ডা, ভাবলেশহীন হলুদ চোখ দুটো ওর মনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। তবে না, যত টরচারই করা হোক, স্বীকার করা যাবে না যে ওর ইচ্ছে ছিল ইকোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজি করাবে টিসাকে। শুনলে নিশ্চয় মানুষ থাকবে না এই লোক।

'কোনও কারণ ছাড়াই ওখানে যাই আমি,' বলল ঝরনা। 'আমাদের লোক, কেন যাব না?'

'আমার বিরুদ্ধে তাকে যাতে কোর্টে দাঁড় করানো যায়, সে-চেষ্টা করতে গিয়েছিলে?'

'না,' শান্ত সুরে বলল ঝরনা, ভ্রূ জোড়া সামান্য কোঁচকাল।

ওকে খুঁটিয়ে দেখছে ইকো, বোঝার চেষ্টা করছে সত্যি কথা বলছে কি না। 'রানা কোথায় তুমি জানো না?'

মাথা নাড়ল ঝরনা।

'সত্যি জানো না?'

এবারও মাথা নাড়ল ঝরনা।

'তা না জানলেও, এটা তো জানো যে মলি চৌধুরি আর লরেন্স সাইমনকে খুন করেছে রানা, পুলিশ ওকে খুঁজছে?' জিজ্ঞেস করল ইকো।

'শুনেছি খুন হয়েছে ওরা, তবে আমি জানি মাসুদ ভাই-এর সঙ্গে কোনও ভাবে জড়িত নন,' বলল ঝরনা।

হঠাৎ হাসল ইকো। 'ও, আচ্ছা, অনেকের ধারণা তুমি আসলে রানাকে গোপনে ভালবাস; দেখা যাচ্ছে সেটা মিথ্যে নয়।'

হ্যাঁ-না কিছু বলছে না ঝরনা।

'কথাটা সত্যি, না? ওকে তুমি ভালবাস না?' তীক্ষ্ণসুরে জানতে চাইল ইকো।

'না, তুমি ভুল শুনেছ,' বলল ঝরনা। 'তা ছাড়া, তোমার কোনও ব্যাপার নয়...'

'হতেও পারে আমার ব্যাপার।' চিন্তিত ভঙ্গিতে ঝরনার দিকে তাকিয়ে আছে ইকো। 'পুলিশ এখনও ওকে অ্যারেস্ট করতে পারেনি, আর রানার মত মহাহারামির মুক্ত থাকাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পুলিশ হয় তাকে তাড়াতাড়ি চোদ্দো শিকে ভরুক, তা না হলে আমাকেই কিছু একটা করতে হবে।'

'কিডন্যাপিং ক্যাপিটাল অফেন্স,' বলল ঝরনা। 'আমাকে এখানে আটকে রেখে মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি। ভাল চাও তো এখনই ছেড়ে দাও।'

'খুনও ক্যাপিটাল অফেন্স,' হেসে উঠে বলল ইকো। 'বেশ অনেকগুলোই তো

করলাম। তোমাকে দেখেও হাত নিশপিশ করছে। তবে এখনই তোমাকে মারছি না। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যদি দেখি তখনও রানাকে অ্যারেস্ট করা হয়নি, আমিই খুঁজে বের করব ওকে—আর তখনই তোমাকে দরকার হবে আমার।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

নিঃশব্দে হাসল ইকো। 'তুমি আমার হাতে বন্দি, রানা এটা জানার পর আর কোনও সমস্যা হবে বলে মনে করি না। আমার ধারণা, আমার শর্তে রাজি হবে ও। তারপর, বলাই বাহুল্য, নাহিদ হাসানের মত আত্মহত্যা করবে। পুলিশ ওর গুলি খাওয়া লাশ পাবে, হাতে পিস্তল। কোনও একটা পদ্ধতি ক্লিক করলে আমি সেটার ভক্ত হয়ে পড়ি।'

'ক্রাইম ডাজ নট পে,' হিসহিস করে বলল ঝরনা।

হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে ফেলল ইকো, জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন বলছিলাম?'

'লক্ষণ ভাল নয়,' মৃদু কণ্ঠে বলল ঝরনা। 'একদিন দেখা যাবে নামটাও ভুলে গেছ, নিজেকে আর চিনতে পারছ না।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' আবার শুরু করল ইকো, ভাব দেখাল ঝরনার কথা শুনতে পায়নি। 'কিছুদিন পর জলে ডোবা লাশ পাওয়া যাবে তোমার। তারা ধরে নেবে নোরা বার্নের পথ ধরে তুমিও আত্মহত্যা করেছ—প্রেমিক যেখানে বেঁচে নেই, আমি কেন বেঁচে থাকি, এরকম একটা দার্শনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। প্রচলিত একটা পদ্ধতি, কেন আমি রিপিট করব না, বলো?'

'কোনও সুস্থ মানুষ এভাবে কথা বলতে পারে না,' বলল ঝরনা। 'তুমি একটা পাগল।'

'পাগল হয়েছি তো কী হয়েছে? পাগল হওয়ার মধ্যে খারাপ কী আছে, অ্যাঁ? এটা তো ভয়ের কোনও ব্যাপার নয়। পাগলামি আসলে স্রেফ একটা দৃষ্টিভঙ্গি। আমার মাথা যেভাবে কাজ করে, তা নিয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, কারণ তাতে আমি যা চাই তা পাচ্ছি, যেভাবে চাই সেভাবেই পাচ্ছি। আর কিছু তো দেখার দরকার নেই আমার। শুধু নিজের স্বার্থ দেখো, শুধু নিজের পাতে ঝোল টানো—এভাবে কাজ করেই তো মানুষ ওপরে উঠছে। আমাদের হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে হলে আমাকেও...'

'এরকম কথা শুধু একটা পশুই বলতে পারে।'

'সাবজেক্ট হিসেবে মার্ডার খুবই ইন্টারেস্টিং,' বলল ইকো, ঝরনা কী বলছে না বলছে গ্রাহ্য করছে না। 'আমাদের পেশায় এটা শুধু বাড়তে থাকে; আর যত বাড়বে ততই চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে প্রভাব-প্রতিপত্তি। এরপর তোমাকে বিদায় দেয়ার পালা। তারপর আসবে ওই ছোকরার পালা, জিসান। এভাবে একের পর এক বহু লোককে চুপ করাতে হবে আমার। একটা সাম্রাজ্য চালানো কী ছেলেখেলা কথা, কাজেই সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার পরেও এই খুন-খারাবির ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।'

ইকোর দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে ঝরনা।

'রানা আমাকে খুব অশান্তির মধ্যে রেখেছে,' বলল ইকো। 'অত্যন্ত বিপজ্জনক

লোক। খেপা ষাঁড়ঃ বাছ-বিচার নেই, যে-কোনও প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালাবে। তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট না হলে আমার জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।'

'যদি ভেবে থাকো আমার কথা ভেবে মাসুদ ভাই তোমার সঙ্গে আপস করবেন, ভুল করবে,' বলল ঝরনা। 'চাকরি করি, এটা ছাড়া ওঁর সঙ্গে অন্য কোনও সম্পর্ক নেই আমার।'

হেসে উঠল ইকো। 'রানার মনটা খুব নরম। শুনি, কর্মচারীদের বিপদে নিজের প্রাণ বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে ওকে। রানা অ্যারেস্ট না হলে, তোমাকে টোপ বানিয়ে ওর জন্যে একটা ফাঁদ পাতব।' চেয়ার ছাড়ল সে। 'এখন যাই, কাল সকালে আবার আসব।'

ঝরনা কিছু বলছে না।

কিন্তু দরজার দিকে না ঘুরে ইকোকে কেবিনের আরও ভিতরে হেঁটে আসতে দেখে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল ও। চিৎকার করে কিছু বলতে যাবে, দেখল সরাসরি ওর দিকে আসছে না লোকটা।

বিছানার গোড়ার দিকে থামল ইকো। হাত তুলে একটা পরদা সরাল। কম্বিনেশন লক সহ একটা ওয়ালসেফ দেখতে পেল ঝরনা। ডায়াল ঘোরাচ্ছে ইকো, সংখ্যাগুলো মনে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করছে ঝরনা—বিশেষ কিছু ভেবে নয়, এমনি।

ক্লিক করে আওয়াজ হওয়ার পর ওয়ালসেফের ভারী দরজাটা খুলল ইকো। ভিতরে চোখ পড়তে ঝরনার চোখ একটু বড় হলো, দমও একটু আটকাল। বাণ্ডিল করা ডলার স্তূপ হয়ে আছে সেফের ভিতর। পকেট থেকে আরেকটা বাণ্ডিল বের করে ওগুলোর সঙ্গে রাখল ইকো, তারপর দরজা বন্ধ করে ডায়াল ঘুরিয়ে তালা লাগাল। এতক্ষণ একবারও ঝরনার দিকে তাকায়নি সে। এইবার তাকালঃ

'এর ভেতর অনেক টাকা আছে। সব নাহিদের নাম দিয়ে মক্কেলদের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেইল করে কামানো। এই টাকা এবার পুলিশকে খাওয়াতে শুরু করেছি, ওদেরকেও ব্ল্যাকমেইলের শিকারে পরিণত করব।'

হাসল ইকো।

দরজা খুলে আর্থারকে কেবিনের ভিতরে ঢোকার ইঙ্গিত করল, 'কড়া নজর রাখবে। কাল সকাল দশটায় আসছি।'

'ইয়েস, বস্,' বলল আর্থার। 'যেমন রেখে যাচ্ছেন, ফিরে এসে ঠিক তেমনই পাবেন।'

'তাই যেন পাই,' বলে কেবিন থেকে সরু প্যাসেজে বেরিয়ে গেল ইকো, দ্রুত পায়ে কম্প্যানিওনওয়ে হ্যাচের দিকে যাচ্ছে।

মুখ ভর্তি হাসি, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করছে আর্থার, শরীরটাকে সামনে-পিছনে দোল খাওয়াচ্ছে। একটু পর স্থির হলো, কয়েক মিনিট একচুল নড়ল না। তারপর দুজনেই ওরা একটা মোটর বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার গর্জন শুনতে পেল।

এখনও আর্থার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

তাকে দেখছে ঝরনা, বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে, কোলের উপর ঠাণ্ডা

হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে আছে।

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ওরা, যতক্ষণ না মোটর বোটের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে। তারপর কেবিনে ঢুকল দানবটা। দরজা বন্ধ করল। তালায় চাবি ঘোরাল, কী হোল থেকে বের করে পকেটে রেখে দিল সেটা। হাসছে নীরব, বীভৎস হাসি।

তেইশ

ঝরনার ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, যে-কোনও বিপদের জন্য সজাগ হয়ে আছে চোখ দুটো। দালানটার সামনে পুলিশের কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছে না, তবে ঝরনার ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। মনে পড়ল, ওখান থেকে ওকে বের করার সময় একটা আলোও নেভায়নি পুলিশ।

পুলিশ কার নিয়ে দালানটাকে দ্বিতীয়বার পাশ কাটানোর সময় রানা ভাবল, না, জিসান এখানে আসেনি। দেখা যাক, ওদের সলিসিটর ওর কোনও খবর দিতে পারে কি না। একটা পাবলিক বুদ থেকে শহীদ সাবেরকে ফোন করল ও।

সাবেরের স্ত্রী নীলা সাড়া দিল। 'তুমি কোথায়, ভাই?' উদ্বিগ্ন সুরে জানতে চাইল ও, তারপর পরম স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'হেডকোয়ার্টারে বসে তোমার বন্ধু তো সারাক্ষণ ছটফট করছে, দুজন পুলিশ অফিসার নিয়ে তুমি নাকি গায়েব হয়ে গেছ!'

'নীলা, হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলো ওকে, প্লিজ,' বলল রানা। 'এটা একটা পাবলিক বুদ, এখানে ফোন করুক—নাম্বারটা লিখে নাও...'

তিন মিনিট পর ফোন বাজল। 'হ্যালো! রানা! কোত্থেকে? তুই এখন কোথায়? পুলি...'

'থাম,' বাধা দিল রানা। 'এখন সব কথা বলার সময় নেই। শুধু জেনে রাখ—ঝরনাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সম্ভবত ইকো ওকে ধরে নিয়ে গেছে; ওদিকে টিসা খুন হয়েছে।'

'ও আল্লাহ!'

'শোন, জিসানের সঙ্গে যোগাযোগ করবি,' বলল রানা। 'বলবি আমি ওকে ডানকান ডকইয়ার্ডে যেতে বলেছি। ওখানে রয় ফিজিও আছে, ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'কিন্তু লেফটেন্যান্ট মার্লি আর ডিটেকটিভ জনসনের কোনও খোঁজ না পাওয়ায় শুধু পাগল হতে বাকি আছে পুলিশ কমিশনার,' বলল সলিসিটর। 'ওদের গাড়ির রেডিও ডেড হয়ে আছে, কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা কী? ওরা তোকে তা হলে অ্যারেস্ট করেনি?'

রেডিওটা বন্ধ করে রেখেছে রানা। 'সময় নেই, সব কথা এখন বলা যাচ্ছে

না,' বলল ও। 'রাখি।'

'কিন্তু, তোর দোহাই লাগে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিস!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে সরাসরি সানসিটি শহরে পৌঁছাল রানা, থামল বাইশতলা দালানটার সামনে। লবিতে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল বেযমেন্টে। নিজের কামরায় বসে টেলিভিশনে বক্সিং দেখছে মোটাসোটা কেয়ারটেকার নিকেল।

রানার মনে পড়ে গেল লোকটার গোঁফ সম্পর্কে কী বলেছিল জিসান—সামুদ্রিক আগাছা। ওরও ঠিক তাই মনে হলো। বুলেট আকৃতির মাথায় ক্যাপ পরে আছে নিকেল।

'আমাকে তুমি চেনো, নিকেল?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ার ছাড়ল কেয়ারটেকার, রানার দিকে একবার মাত্র তাকাল। ফাইটার দুজন রিঙের চারদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে রাজি নয়। 'দেখছেন না, আমি এখন ব্যস্ত? কী চাই আপনার?'

'সাততলার মিস ফ্লোরাকে দরকার,' বলল রানা। 'ওর ঠিকানাটা দাও আমাকে। ব্যাপারটা জরুরি।'

'মিস ফ্লোরার ঠিকানা? তিনি তো ওই সাততলাতেই থাকেন, ওটাই ওঁর ঠিকানা,' বলল নিকেল, একজন বক্সারকে মার খেতে দেখে মুখ বিকৃত করল।

'ধন্যবাদ,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা।

'রাত দুপুরে ওঁকে আপনার কী জন্যে দরকার?' পিছন থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল নিকেল। 'আপনি আসলে কে?'

'এফবিআই,' বলল রানা। 'মিস ফ্লোরাকেই বলব কী দরকার।'

'ও-ও-ও! জী, হে-হে, ঠিক আছে,' হঠাৎ বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল নিকেল। 'চলুন আপনার সঙ্গে আমিও যাই।'

'না, তার কোনও দরকার নেই।'

একাই এলিভেটরে চড়ে সাততলায় উঠে এল রানা। প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে, শুনতে পেল নিউজ এজেন্সির অফিস থেকে লোকজনের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওটাকে পাশ কাটিয়ে গায়ে 'আর্ট সেন্টার' লেখা একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল একবার। কবাটের নীচের ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে।

তারপর প্যাসেজের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত হেঁটে সিলিং, ভেন্টিলেটার, সুইচবোর্ড, ছাদ সংলগ্ন ডাক্ট, ওয়্যারিং ইত্যাদি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা—আসলে জিসানের অসমাপ্ত কাজটা শেষ করছে।

রানা এজেন্সির অফিস থেকে বেরিয়ে মাইক্রোফোনের সরু তার সিলুয়েট্ আর্টিস্ট মিস ফ্লোরার অফিস-কাম-রেসিডেন্টে গিয়ে ঢুকেছে।

আবার আর্ট সেন্টার লেখা দরজার সামনে চলে গেল রানা। পিতলের কড়া ধরে নক করল। দরজার ফ্রেমের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা পা তৈরি হয়ে আছে প্রয়োজনে দরজার ভিতরে ঢুকিয়ে গোঁজ হিসাবে যাতে ব্যবহার করা যায়, হাত দুটো রেইনকোটের পকেটে ঢোকানো।

খানিক পর একটা বোল্ট সরানোর আওয়াজ হলো। খুলে গেল দরজা। বেশ লম্বা মেয়েটা, কাঁধে স্তূপ হয়ে আছে লাল চুল, হলদেটে-খয়েরি স্ল্যাকস পরে আছে, চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকাল। খুব বেশি হলে ত্রিশ বছর বয়স হবে। সুন্দরী হলেও, মুখের গড়নে কাঠিন্য লক্ষ করবার মত, চিবুকটা মারমুখো। গায়ে আঁটসাঁট সোয়েটার।

'মিস ফ্লোরা?' মাথার হ্যাটটা একবার ছুঁলো রানা।

খয়েরি চোখ ওর কালো চোখে তাকাল। আধো হাসিতে বাঁকা হলো লাল ঠোঁট। 'শিওর। কী চাই তোমার?'

'আমি ডিউক,' বলল রানা। 'ভাল নাম সুকুমার বিশ্বাস। 'ডিটেকটিভ। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

হাসিটা ম্লান হলো না, তবে মেয়েটার চোখ দুটো হঠাৎ করে সতর্ক হয়ে উঠল। 'তুমি যদি পুলিশ হও,' তিরস্কারের সুরে বলল সে, 'আমি তা হলে হিলারি ক্লিনটন।'

পকেট থেকে একটা আইডি কার্ড বের করে দেখাল রানা, মাঝে-মধ্যে প্রয়োজন হয় বলে এ-ধরনের কার্ড সঙ্গে রাখতে হয়। 'এবার বিশ্বাস হলো?'

'উও, প্রাইভেট ডিটেকটিভ!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ফ্লোরা। 'কেটে পড়ো, মিস্টার। কোনও অ্যামেচারকে সময় দিতে রাজি নই আমি।' দরজা বন্ধ করতে গিয়ে না পারায় চোখ নামাল ফ্লোরা, দেখল রানার পা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'এর মানে কী?' কর্কশসুরে জিজ্ঞেস করল সে।

রানা লক্ষ করল, মেয়েটা বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছে না। 'তোমাকে না আমি বললাম, কথা আছে? ভেতরে ঢুকতে দাও!'

'কার কাছে এসেছ জানো না, আমার কানেকশন সম্পর্কেও তোমার কোনও ধারণা নেই,' বলল ফ্লোরা। 'বাড়াবাড়ি করলে নিজের দুর্ভোগ ডেকে আনবে নিজেই।'

'সুন্দরী একটা মেয়ের মন গলাতে হলে, একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে,' বলল রানা, ইতিমধ্যে বড়সড় সিটিং রুমে ঢুকে পড়েছে। দরজা বন্ধ করে হেলান দিল ওটার গায়ে। 'স্রেফ কৌতূহল, মাথায় ও-সব নিজে থেকেই গজিয়েছে, নাকি রঙ করিয়েছ?'

ফ্লোরার খয়েরি চোখে একটু হাসির ভাব ফুটল। 'খুবই চতুর দেখা যাচ্ছে!' কৃত্রিম অসহায় ভাব দেখা গেল চেহারায়। 'এরকম প্রতিদিনই দু'একজনের সঙ্গে দেখা হয় আমার। ঢুকেই যখন পড়েছ, কী বলতে চাও ঝটপট বলে বিদায় হও।'

চারদিকে তাকাল রানা। বিশাল ফায়ার প্লেস, ছাপ্পান্ন ইঞ্চি টেলিভিশন, দেয়াল জোড়া অ্যাকুয়েরিয়ামে দুষ্প্রাপ্য মাছ, শোকেস ভর্তি শো পিস, সিলিং থেকে ঝুলছে সোনালি ঝাড়বাতি, মেঝেতে ইরানি কার্পেট। 'এত সব দামী আসবাব, সিলুয়েট ব্যবসা করে ভালই কামাচ্ছ তা হলে।'

'আমার আরও ব্যবসা আছে, সেগুলোর কথাও বলো, তা না হলে তোমার বাম চোখে খোঁচা মারব,' বলল ফ্লোরা; চোখে তির্যক দৃষ্টি, ঠোঁটে দুষ্টামি ভরা হাসি, হেঁটে গিয়ে একটা আর্মচেয়ারে বসতে না বসতে প্রায় অর্ধেকটা ডুবে গেল।

'নাকি ব্ল্যাকমেইল ব্যবসা থেকে ভাল রোজগার হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রা মেয়েটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে।

চোখের কোণ দিয়ে ওর দিকে তাকাল ফ্লোরা, মুখের পেশি শক্ত হয়ে উঠল 'এটা কী কথা বললে তুমি?' ঠাণ্ডাস্বরে জানতে চাইল।

'তোমার খুব বিপদ,' বলে আগুনের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'এখা তোমার চলার পথ থেমে গেছে। দশ বছর জেলখানায় থাকতে কেমন লাগা তোমার?'

'মিস্টার ডিটেকটিভ, কেন তোমার মনে হচ্ছে জেলে যেতে হবে আমাকে?'

'ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড ফিগার্স,' বলল রানা। 'তোমার ফিগার নয়, ম্যাথামেটিকাল।'

'কী ফ্যাক্টস?'

'ইকোর ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেছে। আরও কয়েকজনের মত তুমিও তার স হাত মিলিয়েছিলে। তার বিরুদ্ধে যা যোগাড় করার করেছি। এখন অপেক্ষা কর বেরুলেই তাকে ধরব। এই অপেক্ষার সময়ে চুনোপুঁটি ধরছি, যেমন তোমাকে।'

ভ্রু জোড়া কপালে তুলল ফ্লোরা। 'ইকো কে? এ-সব কী বলছ তুমি!'

হাসল রানা। 'ন্যাকামি করো না। তুমি ইকোর বাড়তি কান হিসেবে কা করছিলে। রানা এজেন্সির অফিসে যে যা বলছিল, এখানে বসে সব তুমি শুনছিলে তারপর ইকোর কানে ঢেলে দিচ্ছিলে। কাজেই বিচারক তোমাকে মূল অপরাধী সহযোগী হিসেবে দেখবেন।'

'তুমি পাগল নাকি?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল ফ্লোরা। 'ভাল চাও তো কেটে পড়ো তা না হলে পুলিশ ডাকব আমি।' বলে টেলিফোনের দিকে এগোল সে।

'লেফটেন্যান্ট মার্লিকে ডাকবে তো? সে আসবে না, তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। যাকেই ডাকো, কোনও লাভ নেই, দশ কি বারো বছর জেল তোমাবে খাটতেই হবে।'

'কিছুই তুমি প্রমাণ করতে পারবে না,' বলল ফ্লোরা, টেলিফোনে হাত রেখে।

'তোমার ঘরে মাইক্রোফোনের তার ঢুকেছে, ইকোকে সাহায্য করার প্রমাণ নয় এটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'নাহিদ হাসান, নোরা বার্ন, মার্টিন ক্রো, মলি চৌধুরি, এবং ঘণ্টা দুই আগে হাসানকে খুন করেছে সে। আমরা প্রমাণ করতে পারব নাহিদ হাসানকে খুন করতে তাকে তুমি সাহায্য করেছ। সাবধান না হলে জেল খাটার বদলে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে তোমাকে।'

টেলিফোনের রিসিভার তোলার জন্যে রানার দিকে খানিকটা পাশ ফিরল ফ্লোরা, তারপর অকস্মাৎ টান দিয়ে একটা দেরাজ খুলল, পিস্তল বের করে ঘোরাল ওর দিকে। 'নড়বে না, মিস্টার প্রাইভেট আই!' মুখটা শক্ত, চোখ দুটো চকচক করছে। 'গুলি করে মেরে পুলিশকে বলব, চোর মনে হয়েছিল।'

'ওই খেলনা দিয়ে? ওটা আমার এক ফোঁটা রক্তও ঝরাতে পারবে না,' বলল বটে রানা, তবে মনে জোর পাচ্ছে না।

'একটু নড়লেই দেখতে পাবে রক্তের কেমন বান ডাকে!'

'আমি মাসুদ রানা, দুনিয়ার মানুষ আমার সম্পর্কে জানে, কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবে তোমার ঘরে আমি চুরি করতে ঢুকেছিলাম?'

'কী বললে?' হাঁ হয়ে গেল ফ্লোরা। 'তু-তুমি মাসুদ রানা?' হাতের পিস্তল একটু নিচু হয়ে গেল।

'এ-সব করে কী লাভ হচ্ছে তোমার?' প্রশ্ন করল রানা। 'মাথা খাঁটিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ না কেন?'

'কী সেটা?' বিস্ময়ের ধাক্কাটা দ্রুত সামলে নিয়ে টেবিলের কিনারায় নিতম্ব ঠেকাল ফ্লোরা, হাতের ছোট্ট পিস্তল আবার রানার বুক বরাবর তাক করল।

'ইকোকে দরকার আমার,' বলল রানা। 'তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার আপত্তি নেই। কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে সে। কোথায় যেতে পারে?'

রানাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে ফ্লোরা। 'ধরো আমি জানি, এ-ও ধরো আমি তোমাকে বলে দিলাম: তারপর কী, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'তুমি শহর ছাড়ার পর বারো ঘণ্টা সময় পাবে, কেউ তোমার পিছু নেবে না। বারো ঘণ্টা পর পুলিশকে আমার জানাতে হবে ইকোকে তুমি সাহায্য করেছ। তবে মাথায় বুদ্ধি আর গ্যারেজে গাড়ি থাকলে বারো ঘণ্টায় অনেক দূরে চলে যেতে পারবে তুমি।'

'ইকো সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না,' বলে হেসে উঠল ফ্লোরা। 'আরে, এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম! তুমি এখানে ঢোকার আগে ইকো বলে কারও নামই আমি শুনিনি। এবার যাও, ভাগো!'

'আমি চলে গেলে পুলিশ আসবে,' বলল রানা। 'ওরা কিন্তু তোমাকে কথা বলাবার ব্যবস্থা করবে, মনে রেখো।'

'গেট আউট!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তুমি কিন্তু চেয়ারে বসার ঝুঁকি নিচ্ছ।'

'গেট আউট!'

'ওয়ান-ট্র্যাক মাইণ্ড,' মন্তব্য করল রানা। 'বলতে ভুলে গেছি, বারো ঘণ্টা সময় দেয়ার সঙ্গে পথ-খরচার একটা ব্যাপারও ছিল।' ফ্লোরাকে একটু সচকিত হয়ে উঠতে দেখল ও। তারপর ঘুরে দরজার দিকে এগোল, জানে কাজ হবে এতে।

'আমি শুনতেও চাই না,' নির্লিপ্ত সুরে বলল ফ্লোরা, তবে গলায় তেমন জোর নেই।

রানা থামছে না, দরজার কাছে পৌঁছে গেল।

'কত?'

ঘুরল রানা। 'পাঁচ হাজার ডলার।'

'আগ্রহ বোধ করছি না,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল ফ্লোরা। 'ও তো মুরগির খাবার। যাও, বেরোও!'

'তুমিই না হয় বলো কত।'

ইতস্তত করল ফ্লোরা। 'পঁচিশ।'

'দশ, এক পয়সাও বেশি নয়,' বলল রানা। 'তুমি জানো কোথায় আছে সে?'

মাথা ঝাঁকাল ফ্লোরা।

'কোথায়?'

'আমাকে তুমি বোকা ধরে নিয়েছ, না?' তীক্ষ্ণস্বরে বলল ফ্লোরা। 'আগে টাকা!'

'কোথায় সে?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আগে ঠিকানা দাও, তারপর টাকা পাবে।'

'না, আগে টাকা,' জেদের সুরে বলল ফ্লোরা।

তার কবজি ধরে ঝাঁকাল রানা। 'শোনো, আমার আরেকজন এজেন্টকে কিডন্যাপ করেছে ইকো। আমি যদি ওকে খুঁজে না পাই, সে তাকে খুন করবে তা যদি করে, তোমাকে আমি ছাড়ব না। কোথায় সে?'

ইতস্তত করছে ফ্লোরা। 'কী করে বুঝব তুমি সত্যি কথা বলছ? তোমার এজেন্টের নাম কী?'

'ঝরনা হক।'

মাথা নাড়ল ফ্লোরা। 'মিথ্যেকথা, এই নামে তোমার কোনও এজেন্ট নেই, বলল সে, সন্দেহের চোখে তাকাল রানার দিকে।

'সানসিটিতে নেই, ক্যাটস্‌কিলে আছে,' অধৈর্য হয়ে বলল রানা। 'টিসার ফ্ল্যাটে যাবার পর ওর কোনও খবর নেই। পুলিশের কাছ থেকে জেনেছি টিসাকে ওখানে খুন করে দরজার গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই সব খুনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাও তুমি?'

'সত্যি বারো ঘণ্টা সময় দেবে, সঙ্গে দশ হাজার ডলার?' নিচু গলায় জানতে চাইল ফ্লোরা।

'হ্যাঁ। কোথায় সে?'

'টাকাটা কোত্থেকে আসবে?' জানতে চাইল ফ্লোরা। 'এত টাকা নিশ্চয়ই তোমার পকেটে নেই।'

'শহীদ সাবের, আমাদের সলিসিটর, দেবে তোমাকে,' বলল রানা।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ফ্লোরা, তারপর বলল, 'লারগো বে-তে ওর একটা ইয়ট আছে। ওখানেই সাপ্তাহিক ছুটি কাটায় ইকো। আর কোথাও যদি না পাও, ওখানে নির্ঘাত পাবে। গেলেই চোখে পড়বে: ওখানে ওটাই নোঙর ফেলা একমাত্র ইয়ট।'

'তুমি সত্যি কথা বলছ তো?'

'অবশ্যই! এবার বলো, টাকাটা পাব কীভাবে?'

নোটবুক বের করে একটা চিরকুট লিখল রানা। 'সলিসিটরকে এটা দিলেই হবে, টাকা পেয়ে যাবে তুমি।'

'কিন্তু যদি না দেন...'

'দেবেন,' আশ্বস্ত করল রানা। 'আজ রাতে হয়তো পারবেন না, তবে সকালে ঠিকই দেবেন। ওই সময় থেকে বারো ঘণ্টা গোনা হবে, কথা দিচ্ছি।'

'আমি কি ওই ঠিকানায় এখনই যাব?' জানতে চাইল ফ্লোরা।

'সকালে যাওয়াই ভাল। রাতে এত টাকা পাবেন কোথায়।'

'না, এখনই যেতে চাই,' বলল ফ্লোরা। 'যা পারেন দিলেন, বাকিটা আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।'

'বেশ, তাই হবে,' বলে দরজার দিকে এগোল রানা। 'আমার কাজ আছে।'

রানা চলে যাওয়ার পর দরজায় তালা লাগাল ফ্লোরা, তারপর কামরার মাঝখানে ফিরে এসে চিন্তা করছে, চোখে রাজ্যের উদ্বেগ। দশ সেকেণ্ড পরেই অস্থির হয়ে উঠল সে, বেডরুমে গিয়ে বড় আকারের দুটো সুটকেসে দরকারী জিনিস-পত্র গোছাতে শুরু করল।

গত কয়েকদিন ধরে খবরের কাগজে একের পর এক রহস্যময় খুন নিয়ে খুব লেখালেখি হচ্ছে, পড়তে গিয়ে তার সন্দেহ হয়েছে এ-সবের সঙ্গে ইকোই বোধহয় জড়িত। রানা আসবার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে, শহর ছেড়ে কেটে পড়বে। এই মুহূর্তে আতঙ্কিত বোধ করছে, পুলিশ না নক করে দরজায়!

সলিসিটর সাবের এক হাজার ডলার দিলে আজ রাতেই শহর ত্যাগ করবে ফ্লোরা। কাপড় পাল্টানোর ঝামেলায় না গিয়ে সুটকেস দুটো দু'হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোল সে।

এই সময় নক হলো দরজায়।

আঁতকে ওঠায় হাত থেকে সুটকেস দুটো পড়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে ফ্লোরা দেখল দরজার হাতল ঘুরছে, তারমানে ইকো এসেছে! একমাত্র তার কাছেই এই ফ্ল্যাটের চাবি আছে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ইকো, আবার সেটা বন্ধ করল। আতঙ্কিত, হঠাৎ পঙ্গু হয়ে পড়া ফ্লোরাকে একবার দেখল, চোখ নামিয়ে তাকাল কার্পেটে পড়ে থাকা সুটকেস দুটো, সারাক্ষণ চোয়াল নাড়ছে।

'হ্যালো, ফ্লোরা,' শান্ত সুরে বলল সে।

ফ্লোরা কিছু বলল না।

'পালাচ্ছ?' আবার দেখল সুটকেস দুটো।

'কী বলছ?' কোনও রকমে বলতে পারল ফ্লোরা। 'পালাব কেন? সাপ্তাহিক ছুটিতে যাচ্ছি।'

'তবে আর ফিরে আসবে না,' বলল ইকো। 'ভয় পেয়েছ, না?'

'কেন ভয় পাব?' গলার আওয়াজ স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করছে ফ্লোরা। 'তোমার কী হয়েছে বলো তো? ছুটি-ছাটায় আমি কোথাও যেতে পারি না?'

'ছুটিতে গেলে আমার কিছু বলার নেই, ফ্লোরা।' কামরার চারদিকে হাঁটাহাঁটি শুরু করল ইকো। 'কিন্তু তুমি আসলে পালাচ্ছ, তাই না?'

'না, কেন আমি...'

'আমার প্ল্যান সফল হতে চলেছে, ফ্লোরা। রানা এজেন্সির মালিককে আজ রাতে গ্রেফতার করা হচ্ছে, নিজের দুই এজেন্টকে খুন করার অপরাধে। ফ্লোরিডায় ওদের আর কোনও অফিস থাকবে না। ভাবতে পারো, কী মিষ্টি একটা প্রতিশোধ নিচ্ছি আমি!'

ফ্লোরা যেন সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছে ইকোর দিকে।

'আমার ড্যাডির মৃত্যুর জন্যে যারা দায়ী, আমাদের সাম্রাজ্য ভেঙে দিতে এফবিআইকে যারা সাহায্য করেছিল, তাদের প্রত্যেককে নিজের হাতে খুন

করেছি। সামনে উৎসব আর আনন্দের দিন, গান-বাজনা আর মদ-গাঁজা নিয়ে ফুর্তির দিন, অথচ তুমি কি না পালাচ্ছ!'

ফ্লোরার চোখ সারাক্ষণ অনুসরণ করছে ইকোকে।

'তোমার হাত কি খালি, ফ্লোরা?' হঠাৎ জানতে চাইল ইকো। 'বেশ কিছু টাকা তুমি বোধহয় পাও-ও, তাই না?'

'না, ঠিক আছে,' মৃদুকণ্ঠে বলল ফ্লোরা। 'এই মুহূর্তে আমার টাকা দরকার নেই।'

হাসল ইকো। 'এই প্রথম এ-কথা শুনলাম তোমার মুখে। তুমি বোধহয় আমার টাকা নিতে ভয় পাচ্ছ, ফ্লোরা? ভয় পাবার কিন্তু আসলে কিছু নেই।'

'সঙ্গে থাকলে দিতে পারো,' বলল ফ্লোরা। 'তবে আমার হাত খালি নয়।'

'ও।' জানালার পাশে দাঁড়াল ইকো, পরদার কর্ডটা পরীক্ষা করছে। 'আরে, অদ্ভুত কো-ইন্সিডেন্স! বেশ কিছুদিন হলো এ-ধরনের একটা কর্ড খুঁজছি। বললে বিশ্বাস করবে না, ঠিক এরকম শেড কোথাও পাচ্ছি না।' হুক থেকে কর্ডটা খুলে নিল সে, ভাব দেখাল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। 'কোত্থেকে কিনেছ মনে আছে তোমার?'

'ভিনাস রো থেকে,' বলল ফ্লোরা, চোখে-মুখে অস্বস্তি নিয়ে দেখছে তাকে।

'তাই? কিন্তু,' শান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এগোল ফ্লোরার দিকে, 'আমি তো ওখানে গিয়ে পেলাম না।'

কর্ডটার দিকে তাকাল ফ্লোরা, দেখল এখন সেটা ইকোর আঙুলের মাঝখানে একটা লুপ-এর আকৃতি পেয়েছে। পিছু হটতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

'কাছে এসো না!' বুজে আসা গলায় বলল ফ্লোরা।

'আরে, কী ব্যাপার?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল ইকো, হাসছে। 'হঠাৎ এরকম ভয় পেলে যে? প্লিজ, এ-কথা বোলো না যে অপরাধ বোধে ভুগছ তুমি।'

ফ্লোরার কয়েক ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে ইকো। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে হঠাৎ দরজা লক্ষ্য করে ছুটল সে। ক্ষিপ্রবেগে, নিঃশব্দ পায়ে তার পিছু নিল ইকো।

দরজার নাগাল পেয়ে গেছে ফ্লোরা, ঠিক তখনই পিছন থেকে তার গলায় লুপটা পরিয়ে দিল ইকো ভিটোরি।

চব্বিশ

গাড়ি থেকে নামছে সলিসিটর সাবের, দেখল অন্ধকার থেকে একটা ছায়ামূর্তি হেঁটে আসছে। 'শহীদ!'

'ইয়া আল্লাহ! রানা, তুই?' চোখে অস্বস্তি নিয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল সাবের, ভয় পাচ্ছে ওদেরকে কেউ দেখতে পাচ্ছে কি না। 'এখানে কেন? কী হয়েছে?

অফিসাররা কোথায়?'

'তোর গাড়িটা নিতে এসেছি,' বলল রানা, পুলিশ কার ব্যবহার করা নিরাপদ নয় বলে দুই কিলোমিটার দূরে ওটাকে ফেলে এসেছে ও। পথে চুরি করবার মত কোনও গাড়ি পায়নি।

'কেন, কোথায় যাবি?' জিজ্ঞেস করল সাবের। 'দূরে কোথাও?'

'সামান্য দূরে, কেন?'

'ট্যাংক প্রায় খালি।'

'সেরেছে!' মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে চুলে হাত চালাল রানা। 'আমার খোঁজে চারদিকে ছুটোছুটি করছে পুলিশ, পেট্রল পাম্পে থামা উচিত হবে না। এখন উপায়?'

'কোনও চিন্তা নেই, আগে ভেতরে চল,' বলল সলিসিটর। গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার বাগানের ভিতর দিয়ে রানাকে পথ দেখাল ও।

বন্ধুর পিছু নিয়ে লবিতে ঢুকল রানা।

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল নীলা। 'চলো, রানা, আগুনের ধারে বসবে।' ভিজে কোটটা খুলতে রানাকে সাহায্য করছে ও।

'না, ও বসবে না, নীলা,' বলল সাবের। 'আমাদের গাড়িটা দরকার ওর, কিন্তু পেট্রল নেই ট্যাংকে। তুমি যদি...'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, এক্ষুনি যাচ্ছি,' স্বামীর বাড়ানো হাত থেকে চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেল নীলা।

'জিসানের সঙ্গে তোর যোগাযোগ হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সলিসিটর। 'এখানে আসতে বলেছি ওকে। ঝরনাকে খুঁজছে ও। ফোনে আর কোনও কথা হয়নি, তুই বল কী হয়েছে। মার্লি আর জনসন গায়েব হয়ে যাওয়ায় হেডকোয়ার্টারে মাতম শুরু হয়ে গেছে। এভাবে অ্যারেস্ট এড়িয়ে তুই যে কী বিপদে আছিস! তুই আমার সঙ্গে হেডকোয়ার্টারে গেলেই বোধহয় ভাল করবি।'

'কে বলল আমি অ্যারেস্ট এড়িয়েছি?' বন্ধুকে বলল রানা। 'মার্লি আমাকে ওয়ান-ওয়ে জার্নিতে নিয়ে যাচ্ছিল। ডানকান ডকইয়ার্ডে আমার গার্ড সময়মত হাজির না হলে ওখানেই আমার লাশ পড়ত।'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সলিসিটর। 'তুই সিরিয়াস?'

'অবশ্যই সিরিয়াস। লেফটেন্যান্ট মার্লি কোনও রকম রাখ-ঢাক করেনি। তার ওপর ওপরমহলের নির্দেশ আছে, মাসুদ রানাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। আমাকে গুলি করতে যাচ্ছে সে, এই সময় ওখানে ফেডারেল পুলিশের একজন এজেন্টের গুলি খায় ও। তোর সঙ্গে হেডকোয়ার্টারে গেলে, ওখানেও আমাকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে ওরা।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছল সলিসিটর। 'কমিশনারকে সব আমি জানাচ্ছি, আমার কথা নিশ্চয়ই তিনি শুনবেন...'

'যারা আমাকে সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে তাদের মধ্যে পুলিশ কমিশনারও একজন,' বলল রানা।

'হোয়াট?' হতচকিত হয়ে পড়ল সাবের। 'কী বলছিস, রানা!'

'এফবিআই আর ফেডারেল পুলিশের সদস্যরা বোধহয় এতক্ষণে তা অ্যারেস্ট করার জন্যে রওনা হয়ে গেছে।'

'তখন থেকে এফবিআই, এফ.এফ করছিস, ব্যাপারটা কী বল্ তো?' চো সরু করল সলিসিটর।

'দেড় বছর আগের কথা স্মরণ কর। রানা এজেন্সির গোপন সহযোগিতা নি মাফিয়া ডন ডিকোর সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ওরা। এফবিআই চিফ আর আ একমত হই, দু'দিন আগে বা পরে, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রানা এজেন্সির ওপ হামলা করবে ওরা। আমরা সিদ্ধান্ত নিই, পরিস্থিতি মনিটর করার জন্যে ওদে নিয়োজিত একজন চোখ রাখবে রানা এজেন্সির ওপর। সেই চোখকেই ডানকা ডকইয়ার্ডে রেখে এসেছি, মার্লি আর জনসনকে পাহারা দিচ্ছে ও।'

সাবেরের চোখ বিশাল হয়ে উঠেছে। 'রয় ফিজিও?'

'রয় ফিজিও।'

'ওরে, আল্লাহ! অথচ সবাই জানে তোর সবচেয়ে বিশ্বস্ত শোফার রয়। ত আসল কাজটা দেখা যাচ্ছে করেই রেখেছিস তুই,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল সলিসিটর। 'গুড, ভেরি গুড। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মার্লির স্বীকারোক্তি আদায় শুর হয়ে গেছে। না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে যাই আমি, তা না হ কমিশনারের অ্যারেস্টটা মিস করব।'

এই সময় বাইরে থেকে গাড়ির আওয়াজ ভেসে এল।

'পুলিশ?' ফিসফিস করল সলিসিটর, জানালার পরদা সরিয়ে উঁকি দিল। 'না, জিসান।'

'ওর গাড়িটা নিয়ে যাই আমি,' বলে লবি থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

অন্ধকার বাগানে দেখা হলো জিসানের সঙ্গে। 'ওহ্, গড! মাসুদ ভাই!'

'আমার সঙ্গে এসো। ঝরনা কোথায়?' জিসানের হাত ধরে গাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রানা।

'এখনও আমি ওর কোনও খোঁজ পাইনি,' বলল জিসান। 'ভাবলাম সিলুয়েট আর্টিস্ট ফ্লোরা জানতে পারে...ওমা, গিয়ে দেখি সেই একই কায়দায় বাথরুমের দরজার গায়ে ঝুলছে...'

রানার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠল, কিছু না বলে গাড়িতে উঠে জিসানের পাশে বসল। স্টার্ট দিল জিসান। 'কোথায়, মাসুদ ভাই?'

'লারগো বে,' বলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল জিসান। 'ওখানে কী, মাসুদ ভাই?'

'ছ'মাইল দূরে ইকোর একটা ইয়ট আছে, আমার ধারণা ওখানেই ঝরনাকে আটকে রেখেছে সে,' বলল রানা। 'গলফ্ ক্লাবটা চেনো? ওটার এক মাইল সামনে লারগো বে। আগেও গেছি ওদিকে, তাই জানি ওখানে একটা বোটহাউস আছে।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

তিন মিনিট পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল রানা। 'পেছনে ফেউ লেগেছে, জিসান!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস পেডালে পা চাপল জিসান। 'পুলিশ?'

'হ্যাঁ। হয়তো তোমার গাড়ির নম্বর লক্ষ করেছে। তোমাকেও তো খুঁজছে ওরা।'

'মাসুদ ভাই, আমার পুরানো গাড়ি টহল কারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না,' বলল জিসান। 'কী করা যায়?'

'এখন একটাই কাজ, ঝরনাকে উদ্ধার,' বলল রানা। 'ওদেরকে বোকা বানাব আমরা, জিসান। সামনের বাঁকটা ঘুরবে তুমি, স্পিড কমাও, আমি নেমে যাই। তারপর যেভাবে পারো ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে শুধু আজ রাতটুকু গ্রেফতার এড়িয়ে থাকো।'

'একেবারে পেছনে চলে এসেছে ওরা,' বলল জিসান, চাপ দিয়ে মেঝের সঙ্গে পিষে ধরল গ্যাস পেডাল। রাস্তায় চাকা ঘষার কর্কশ আওয়াজ তুলে নতুন উদ্যমে ছুটল গাড়িটা, ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার গতিতে।

বাঁক যখন আর বিশ ফুট দূরে, ব্রেক কষল জিসান। গাড়ির পিছনের চাকা পিছলে ঘুরে যাচ্ছে। পিছনের গাড়িও ব্রেক কষতে বাধ্য হলো, চাকার সঙ্গে কংক্রিটের ঘর্ষণে গা রিরি করা আওয়াজ হলো। হুইলের সঙ্গে যুদ্ধ করছে জিসান, পিছলানোর দিক ও গতিকে নিজের অনুকূলে আনবার চেষ্টা করছে। পুলিশ কারের হেডল্যাম্পের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওদের গাড়ি।

ব্রেক ছেড়ে দিয়ে গ্যাস পেডালে চাপ দিল জিসান। তীরবেগে পাশের সরু গলিতে ঢুকে পড়ল গাড়ি। পিছু নেওয়া পুলিশ কার সোজা ছুটে চলে গেল।

'গুড লাক!' রানাকে দরজা খুলতে দেখে বলল জিসান, 'মাসুদ ভাই।'

লাফ দিল রানা, গলির মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে দিল শরীরটাকে। তারপর আরেক লাফে সিধে হয়ে খিঁচে দৌড়াতে শুরু করল, সামনে তাকাতে দেখল গলির আরেক মুখের কাছে পৌঁছে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জিসানের গাড়ি।

আওয়াজ শুনে রানা বুঝল, পুলিশ কার ঘুরিয়ে নিয়ে গলিতে ঢুকছে ড্রাইভার। গলির শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে ও, একজন অফিসার গর্জে উঠল, 'হল্ট!' কিন্তু রানা থামল না, পিছন ফিরে তাকালও না। যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটছে।

গলির ভিতর ঝলসে উঠল আগুন, শব্দ হলো গুলির। রানাকে লাগল না, তবে বোঝা গেল মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। অন্ধকারে ঢাকা গলির মুখে পৌঁছে গেছে ও, বাঁক নিয়ে আরেকটা গলি ধরে ছুটছে, এটা আরও সরু।

আরও দুটো গলি পার হয়ে নদীর ধারে চলে এল রানা। কিনারায় থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে, ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। হাল ছাড়েনি পুলিশ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে লুকোবার জায়গা খুঁজছে ও। কয়েক গজ দূরে খালি কাঠের বাক্সের একটা উঁচু স্তূপ রয়েছে। ছুটে ওগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিল।

কয়েক সেকেণ্ড পর গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন অফিসার, হাতে পিস্তল। চারদিকে তাকিয়ে নির্জন নদীর কিনারাটা ভাল করে দেখল সে, তারপর কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকল।

লোকটাকে দেখছে রানা। কঠিন এক চিলতে হাসি স্থির হয়ে আছে ওর ঠোঁটের কোণে। ভাবছে কাঠের স্তূপটা সার্চ না করে কী ফিরবে অফিসার!

যা ভেবেছে ঠিক তাই; এক পা এক পা করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। ছায়ার ভিতর নিজেকে আরও গুটিয়ে নিল রানা, দম বন্ধ করল।

'ওকে, তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি!' অকস্মাৎ গর্জে উঠল পুলিশ অফিসার, পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করল। 'বেরিয়ে এসো, তা না হলে উড়িয়ে দেব তোমাকে।'

স্তূপের বাইরে থেকে ওকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়, ভাবল রানা। যেখানে আছে সেখানেই থাকল ও, একচুল নড়ল না।

কাছাকাছি পৌঁছে স্তূপটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল অফিসার। এতটুকু শব্দ না করে তার সঙ্গে তাল রেখে রানা নিজেও ঘুরছে, লোকটার দৃষ্টিপথের ঠিক বাইরে থেকে। পুরো একটা চক্কর ঘুরল ওরা।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল অফিসার, তারপর শক্তিশালী একটা টর্চ জ্বেলে নদীর কিনারা ধরে এগোল, বৃষ্টির মধ্যে নিচু করে রেখেছে মাথা।

লোকটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে উল্টোদিকে হাঁটা ধরল রানা, দ্রুত পায়ে শহরের দিকে ফিরছে। ট্যাক্সি চড়ায় ঝুঁকি থাকলেও, রাস্তায় উঠে এসেই হাত তুলে থামাল একটাকে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, ক্লাব পর্যন্ত হাঁটতে হলে আরও দেরি হয়ে যাবে।

'গলফ্ ক্লাব চেনো?' জিজ্ঞেস করল রানা। মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে রেখেছে, পুরো মুখটা যাতে দেখতে না পায় ড্রাইভার।

'চিনি, বস্,' বলল ড্রাইভার। 'এই দুর্যোগের রাতে নিশ্চয়ই গলফ্ খেলার কথা ভাবছেন না?'

'বোটহাউসটা আরও এক মাইল দূরে,' বলল রানা। 'ওখানে যাব।'

'ওটাও চিনি, বস্,' হাসিমুখে বলল ড্রাইভার। 'মারফি সেগান-এর বোটহাউস।'

ট্যাক্সিতে উঠল রানা। 'দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারলে একশো ডলার।'

'তা সম্ভব নয়, পনেরো মিনিট লাগবে আমার,' বলল ড্রাইভার।

'ঠিক আছে, তা-ই সই। গাড়ি ছাড়ো।'

শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার স্পিড তুলল ড্রাইভার।

হঠাৎ করে অত্যন্ত ক্লান্ত, বিধ্বস্ত বোধ করছে রানা। নিজের ফ্ল্যাট থেকে ঝরনা বেরিয়ে যাওয়ার পর তিন ঘণ্টা পার হতে চলেছে। বেশিরভাগ সম্ভাবনা বেঁচে নেই, বাকি মেয়েদের মত ওকেও গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করেছে সিরিয়াল খুনিটা।

বালিয়াড়ির ভিতর দিয়ে রাস্তা, আট মিনিটের মাথায় ক্লাবটাকে পাশ কাটাল ওরা। ভিতরে নাচ-গান হচ্ছে, মিউজিক আর উল্লাস ধ্বনি শুনতে পেল রানা।

চার মিনিট পর ড্রাইভার বলল, 'ওই যে, সামনে দেখা যায় সেগানের বোটহাউস।'

বৃষ্টিস্নাত উইণ্ডশিল্ডের দিকে ঝুঁকে তাকাল রানা। নদীর কিনারায় কাঠের তৈরি একটা শেড দেখতে পেল। জানালা দিয়ে আলো বেরুচ্ছে।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে রানা জানতে চাইল, 'অপেক্ষা করবে?'

'এরকম বিল পেলে সারারাত আছি,' খুশি মনে বলল ড্রাইভার।

একটা ঢাল বেয়ে নীচে নামবার পর গাড়ি থামাল নিগ্রো লোকটা। 'জেটির পাশে ওই কেবিনটায় পাবেন সেগানকে,' রানার হাত থেকে একশ' ডলার নোটটা নেওয়ার সময় বলল।

জেটির দিকে হেঁটে গেল রানা। জেটি যেখান থেকে শুরু, তার ঠিক পাশেই কেবিনটা। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে নক করল।

প্রায় বিশ সেকেণ্ড পর দরজা খুলল মোটাসোটা এক লোক, গায়ে টার্টল-নেক সোয়েটার, পায়ে রাবার বুট। ভ্রূ কুঁচকে দেখছে রানাকে। একদিকে একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

'আপনি মারফি সেগান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমিই সেগান, মিস্টার। ভেতরে আসুন।'

পরিপাটি করে সাজানো, উষ্ণ কামরার ভিতর ঢুকল রানা। গনগনে আগুনের ধারে বসে এক তরুণী ছোট্ট এক শিশুর যত্ন-আত্তি করছে। চোখাচোখি হতে সলজ্জ একটু হাসি খেলে গেল তরুণীর ঠোঁটে, তবে দৃষ্টি সরিয়ে না নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। ওকে দেখে যেন অবাক হয়েছে।

'এই মুহূর্তে আমার একটা মোটর বোট দরকার,' বলল রানা। 'বিপদের সময় মানুষকে আপনি সাহায্য করেন, এ-কথা শুনে আপনার কাছেই এলাম।'

'একদম বাজে কথা, বিপদ দেখলে আমি বরং পালাই,' বলল সেগান। 'কে আপনাকে এ-কথা বলল?'

'একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার,' মিথ্যেকথা বলল রানা।

'বকশিশের লোভে বলেছে,' বলল সেগান, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানতে চাইল, 'তা এরকম দুর্যোগের রাতে বোট নিয়ে কী করবেন? বিপদটাই বা কী আপনার?'

'লারগো বে-তে নোঙর ফেলা একটা ইয়টে যাব,' বলল রানা। 'সন্দেহ করছি, আমার একজন স্টাফকে ওই ইয়টে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। লোকটা খুনি, অনেকগুলো মেয়েকে খুন করেছে সে, আমার পৌঁছাতে দেরি হলে ওকেও মেরে ফেলবে।'

আঁতকে উঠে তরুণী বলল, 'কাগজে এর কথাই তা হলে পড়ছি? সিরিয়াল কিলার?'

'হ্যাঁ।'

তরুণী সেগানকে বলল, 'নিয়ে যাও ওঁকে, মারফি। দেখতে পাচ্ছ না কেমন অস্থির বোধ করছেন ভদ্রলোক। সময় নষ্ট কোরো না, যাও!'

রাজি হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সেগান। 'ঠিক আছে, যাব নিয়ে। পাঁচ মিনিট সময় দিন আমাকে। আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন, মিস্টার রানা।' নিজের অয়েলস্কিনটা ছোঁ দিয়ে নিয়ে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেল সে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মুখ থেকে বৃষ্টির পানি মুছল রানা। 'আপনার স্বামী

আমার নাম জানেন। তারমানে আপনারা জানেন পুলিশ আমাকে খুঁজছে,' বলল ও। 'পুলিশকে খবর দিতে গেলেন, তাই না?'

মাথা নাড়ল তরুণী। 'আরে, না! আপনি ব্যস্ত মানুষ, তাই ভুলে গেছেন, মিস্টার রানা। বছর দেড়েক আগে মাফিয়া ডন ডিকোর বিরুদ্ধে এফবিআই আর ফেডারেল পুলিশ যখন যুদ্ধ শুরু করল, দু'পক্ষের গোলাগুলির সময় মারফি মাঝখানে পড়ে পায়ে গুলি খায়। অনেকক্ষণ রাস্তায় পড়ে থাকায় রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছিল ও। যেটা ভুলে গেছেন, গোলাগুলির মধ্যে সাহস করে আপনিই ওকে পিঠে তুলে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনেন, তারপর একটা ক্লিনিকে ভর্তি করে দেন। চিকিৎসার সব খরচও আপনার কাছ থেকে পেয়ে যায় ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ। সেই থেকে খোঁড়াচ্ছে মারফি, তবে প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় প্রতিদিন আপনার জন্যে যিশুর দরবারে প্রার্থনা করে ও।'

'ওঁকে সন্দেহ করার জন্যে দুঃখিত,' বলল রানা, ইঙ্গিতে শিশুটিকে দেখাল। 'ও-ই প্রথম?'

'হ্যাঁ, তবে আরও আসবে।'

'বড় হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন ছেলেকে, আমি ওর একটা ব্যবস্থা করব।'

হেসে উঠল তরুণী মা। 'ও ছেলে নয়, মেয়ে।'

'তা হলে তো আরও ভাল, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ শিখবে।'

'আপনার যে-কোনও সাহায্য দরকার হোক, মিস্টার রানা, মারফির ওপর আস্থা রাখতে পারেন,' বলল তরুণী।

হাসল রানা। 'খুব ভাল হলো। একটু সাহায্য দরকার হতে পারে আমার।'

দরজা খুলে ভিতরে উঁকি দিল সেগান। 'সব তৈরি, মিস্টার রানা। আপনার কি একটা অয়েলস্কিন দরকার?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ধন্যবাদ, না। যতটুকু ভিজেছি, তার বেশি ভেজা আর সম্ভব কি? তবে একটা বিনকিউলার পেলে খুশি হতাম।' ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস সেগানের দিকে তাকাল ও। 'আপনাকেও ধন্যবাদ। ভুলবেন না, বড় হলে ওর জন্যে আমি কিছু করতে চাই।'

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দোল খাচ্ছে শক্তিশালী একটা স্পিড বোট। ওকে উঠতে সাহায্য করল সেগান, নোঙর তুলল, থ্রটল সামনে ঠেলে দিয়ে স্পিড তুলে রওনা হলো। নদীর মোহনার দিকে যাচ্ছে ওরা।

'কত দিতে হবে ঠিক করা হয়নি,' বলল রানা, সেগানের ঠিক পাশে দাঁড়িয়েছে। 'দুশো ডলার ঠিক আছে?'

'টাকা নিলে অপরাধ হবে, মিস্টার রানা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনার সংসার আছে, পারিশ্রমিক না দিতে পারলে আমার যে অপরাধ হবে, তার কী? শুনুন, ইয়টে কিছু সমস্যা হতে পারে। আপনি বোটেই থাকবেন। আমার এজেন্টকে যদি ওখানে পাই, তীরে পৌঁছে দেবেন আপনি আমাদের।'

'মারামারি-কাটাকাটি শুরু হলে আমাকে একটা ডাক দিতে ভুলবেন না,' বলল সেগান, চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'বিয়ের আগে মিড-ওয়েস্টে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলাম, তবে বহু বছর অ্যাকশনে নেই।'

'বউ-বাচ্চার কথা ভাবতে হবে আপনাকে,' বলল রানা। 'এই শয়তানগুলো খালি হাতে লড়ে না।'

'আমিও শুধু খালি হাতে লড়ি না,' বলে রশি বাঁধার একটা কাঠের মোটা খোঁটা দেখিয়ে বলল সেগান।

নদীর মোহনায় পৌঁছাল বোট। এখান থেকে দূরে হলেও, ইকোর ইয়টের আলোগুলো পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা।

'স্পিড আরও বাড়ান,' তাগাদা দিল রানা, হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

থ্রটল আরও একটু সামনে ঠেলে দিল সেগান। উঁচু ঢেউগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে তীরবেগে ছুটে চলেছে বোট।

চোখে বিনকিউলার সেঁটে ইয়টটার দিকে তাকাল রানা, ভাবছে, ঝরনা যদি ওখানে না থাকে? এই বৃষ্টির মধ্যে ইয়টের ডেকে কারও থাকার কথা নয়, নেইও। তবে পাহারায় তো নিশ্চয়ই কেউ থাকবে। তা থাকলেও, ওদের অন্ধকার বোটটাকে তার দেখতে পাবার কথা নয়। ইঞ্জিনের শব্দও শুনতে পাবে বলে মনে হয় না।

'স্পিড কমান,' পাঁচ মিনিট পর নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে ভেসে যান ওটার দিকে। ওরা যেন বুঝতে না পারে কেউ এসেছে।'

'ইয়েস, মিস্টার রানা।' একটু পর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সেগান। ধীরগতিতে ভাসতে ভাসতে ইয়টের দিকে এগোচ্ছে বোট। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওটার পাশে ভিড়ল ওটা।

পিতলের চকচকে রেইল ধরে বোটটাকে স্থির রাখল রানা, এই ফাঁকে রশি দিয়ে ওটাকে বাঁধল সেগান। তারপর দুজন একযোগে লাফ দিয়ে রেইলিং টপকে ইয়টে উঠল।

ইয়টের ডেকে কেউ নেই, তবে দুটো কেবিনের পোর্টহোলে আলো দেখা যাচ্ছে।

'আমি প্রথমে যাই,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল রানা, শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করে হাতে নিল। 'আপনি আড়ালে থাকুন। যদি কিছু শুরু হয়, পেছন থেকে ধরবেন ওদের।'

শিকারি বিড়ালের মত নিঃশব্দে কম্প্যানিঅনওয়ে হ্যাচের দিকে এগোল রানা। সিঁড়ির মাথায় থেমে কান পাতল। কিছু শুনতে না পেয়ে সাবধানে নামছে। এই সময় ওকে চমকে দিয়ে একটা গুলির শব্দ হলো।

স্থির হয়ে গেল রানা, হার্টবিট বেড়ে গেছে, ভাবছে কে কাকে গুলি করল? পালাবার চেষ্টা করছিল ঝরনা, তাই মেরে ফেলল ইকো?

আবার নামতে শুরু করল রানা। শেষ ধাপে পা মাত্র রেখেছে, প্যাসেজের ডান দিকে একটা কেবিনের দরজা ঝট করে খুলে গেল।

কুঁজো হয়ে গেল রানা, যদি মোকাবিলার প্রয়োজন পড়ে, এই ছায়ার ভিতর

থাকাই সুবিধাজনক।

হঠাৎ ঝরনাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে হকচকিয়ে গেল রানা।

দরজা খুলে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ঝরনা। কেবিনের আলোয় রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখটা। চোখে রাজ্যের ভয়, ব্যথা, সতর্কতা; হাতে পিস্তল। ওর সাদা পপলিনের ব্লাউজ ছিঁড়ে যাওয়ায় উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে একদিকের কাঁধ, এক প্রায়ের মোজা গোড়ালিতে নেমে এসেছে, ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে নাক দিয়ে।

'ঝরনা!' ফিসফিস করে ডাকল রানা।

'ওহ্, মাসুদ ভাই!' বলল ঝরনা, তারপর দৌড়ে এল ওর দিকে।

পঁচিশ

সিঁড়ির অর্ধেকটা নেমে এসে থমকে দাঁড়াল সেগান, ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। ওর ধারণা ছিল গুণ্ডা-পাণ্ডায় ভর্তি থাকবে ইয়ট, তাদের সঙ্গে মারামারি করে উদ্ধার করতে হবে মাসুদ রানার এজেন্টকে। কিন্তু তার বদলে সুন্দরী এক মেয়ে ছুটে এসে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরছে দেখে থতমত খেয়ে গেল বেচারা।

সেগানের বিস্ময় রানাকে স্পর্শ করছে না। প্রথমে ও জেনে নিচ্ছে নাক ছাড়া আর কোথাও ঝরনা আহত হয়েছে কি না।

'ধস্তাধস্তি শুরু করায় গুণ্ডাটা এলোপাথাড়ি ঘুসি মেরেছে আমাকে,' রানাকে ছেড়ে দিয়ে বলল ঝরনা, ব্যথার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'কে সে? ইয়টে ওরা কজন?' দ্রুত জানতে চাইল রানা। 'কে কাকে গুলি করল?'

'শুধু ম্যাক আর্থার গুণ্ডাটা আছে,' রানার রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল ঝরনা। 'ইকোর ডান হাত সে। হঠাৎ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ওরই পিস্তল কেড়ে নিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছি।' হাত তুলে কেবিনটা দেখাল ও। 'ওটার মেঝেতে পড়ে আছে, বোধহয় বেঁচে নেই।'

সেগানের দিকে তাকাল রানা। 'একটু দেখুন তো সত্যি মরেছে কি না।'

ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সেগান, কেবিনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। এক মিনিট পরেই বেরিয়ে এল, বলল, 'আপনার গুলিতে, ম্যাডাম, লোকটার শুধু তিনটে পাঁজর গুঁড়ো হয়েছে।' মাথা নাড়ল। 'মরবে না।'

'আপনার কি মনে হয়, লোকটাকে বোটে তুলতে পারবেন? সাক্ষী হিসেবে ওকে আমাদের দরকার হতে পারে।'

'জী, খুব পারব।'

'গুড। ধন্যবাদ,' বলল রানা, তারপর ঝরনার কবজি ধরে মৃদু টান দিল। 'চলো, ফেরা যাক।'

'না, মাসুদ ভাই, দাঁড়ান!' হঠাৎ মনে পড়ায় উত্তেজিত হয়ে উঠল ঝরনা। 'আপনার লোক আর্থারকে নিয়ে চলে যাক, আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।'

এইসময় অচেতন আর্থারকে কাঁধে ফেলে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সেগান। 'জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিল,' হাসিমুখে বলল রানাকে। 'গোটা দুই জ্যাব মারতে হয়েছে।'

'ঠিক করেছেন,' বলল রানা।

'ক্ষতটায় কাপড় জড়িয়ে রক্ত পড়াটা বন্ধ করেছি,' ওদেরকে পাশ কাটাবার সময় বলল সেগান। 'তা না হলে মারা যাবে।'

'ভেরি গুড,' বলল রানা, তারপর ঝরনার পিছু নিয়ে কেবিনের ভিতর ঢুকল। ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে ঝরনা, হাঁটার সময় পেট, পাঁজর ও ঘাড়ে হাত বুলাচ্ছে। রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য প্রাণপণে লড়তে হয়েছে ওকে।

পরদা সরিয়ে বাল্কহেডের গায়ে তৈরি ওয়ালসেফটা রানাকে দেখাল ঝরনা। বলল, 'আমার সামনে এটা একবার খুলেছিল ইকো। দেখলাম ভেতরটা ভর্তি হয়ে আছে ডলারের বাণ্ডিলে। বলল, এ-সব আমাদের ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে আদায় করা টাকা। আপনার কি মনে হয় কথাটা সত্যি, মাসুদ ভাই?'

'হতে পারে,' বলল রানা।

'তা হলে আমরা এই টাকাই ক্লায়েন্টদের ফিরিয়ে দেব,' বলল ঝরনা। 'নিজেদের পকেট থেকে দিতে যাব কেন?'

'যুক্তিটা ঠিক আছে,' বলল রানা, 'কিন্তু কমবিনেশন লক খুলবে কীভাবে? কোড জানো?'

ব্যথা ভুলে মুচকি একটু হাসল ঝরনা, তারপর বলল, 'বোধহয় জানি। আপনি অনুমতি দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি খোলা যায় কি না।'

'একেই বলে কাজের মেয়ে,' সস্নেহে মন্তব্য করল রানা। 'বেশ, অনুমতি পেয়েছ, দেখি খুলতে পারো কি না।'

একবার চেষ্টা করল ঝরনা, দু'বার—নাহ্, ওয়ালসেফের তালাটা খোলা যাচ্ছে না। 'কম্বিনেশন কোড মিলছে না,' হতাশ গলায় বলল ও। 'দূর থেকে দেখেছি তো, দু'একটা নম্বর ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। হয়তো আমি যেটাকে ১ ভাবছি সেটা হবে দু'পাশের যে-কোনও একটা সংখ্যা, অর্থাৎ ০ কিংবা ২। দেখা যাক,' বলে আবার শুরু করল।

পরবর্তী সাত মিনিটে প্রায় পঞ্চাশবার সংশোধিত কোড ব্যবহার করল ঝরনা, কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হলো না। হাল প্রায় ছেড়ে দিল ও, বলল, 'এই শেষবার।' ডায়াল ঘোরানো শেষ হতেই এবার ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল ওরা। তারপর ব্যস্ত হাতে ওয়ালসেফের ভারী দরজাটা খুলে ডলারের বাণ্ডিলগুলো রানাকে দেখাল ঝরনা।

কয়েকটা বাণ্ডিল হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল রানা। বেশিরভাগই পাঁচশো ডলারের নোট, তবে একটাও নতুন নয়, সব ব্যবহার করা।

'এত টাকা নেব কীভাবে, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল ঝরনা।

'একটা অয়েলস্কিন দরকার, খুঁজলেই পাবে,' চারদিকে তাকাল রানা। হঠাৎ কী যেন একটা দেখে স্থির হয়ে গেল ও, চেহারায় বিমূঢ় একটা ভাব। 'ঝরনা?'

'জী, মাসুদ ভাই?' ঝট করে রানার দিকে ফিরল ঝরনা।

'দরজাটা বন্ধ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না,' বলল রানা। 'তবে কি তুমি

বন্ধ করেছ?' দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল, কিন্তু নড়ল না ওটা। 'অদ্ভুত ব্যাপার! বাইরে থেকে তালা দিল কে?'

'এর মানে কী, মাসুদ ভাই?' ঝরনার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। 'ইকো ফিরে আসেনি তো?'

'কী জানি, দেখা যাক,' বলে দরজার গায়ে ঘুসি মারল রানা। 'ও হে, সেগান, দরজা খোলো! আমরা এখানে আটকা পড়ে গেছি!'

'মাসুদ ভাই! দেয়ালে হাত রেখে দেখুন, কাঁপছে। তার মানে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে কেউ, ইয়ট চলতে শুরু করেছে!'

দেয়ালে হাত রাখল রানা। মৃদু কম্পন অনুভব করে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক বলেছ। হয়তো ইয়ট নিয়ে তীরে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগান। এদিকে যে এখানে *হাম-তুম এক কামরে মে বান্দ হুঁ*, ও জানে না।'

'উঁহুঁ, সেগান নয়,' বেসুরো গলায় বলল ঝরনা। 'ইকো।'

দ্রুত একটা পোর্টহোলের সামনে চলে গেল রানা। বাইরেটা দেখছে। সময়মতই তাকিয়েছে ও, দেরি করলে দৃশ্যটা চোখে পড়ত না। বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক হওয়ার সুযোগ হত না।

সেগানের স্পিড বোট স্রোতের টানে দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। পাক খেতে খেতে অন্ধকারে হারিয়ে গেল একটু পরেই। তারপর, ওটার পিছু নিয়ে আরও একটা স্পিড বোটকে ভেসে যেতে দেখল রানা। প্রথমটার মত ওটাতেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ইকোই বোধহয় ফিরে এসেছে। রশি কেটে ভাসিয়ে দিয়েছে বোট। কিন্তু, ঝরনা...' কথাটা শেষ করল না ও।

কম্পনটা এত বাড়ল, কান পাতলে শুনতে পাচ্ছে ওরা। ফুল স্পিডে ছুটছে ইয়ট। পোর্টহোলে চোখ রাখতে ঝরনা দেখল, ইয়টের গায়ে বাড়ি খেয়ে সাদা ফেনা তৈরি করছে ঢেউগুলো।

'সাগরে বেরুচ্ছে ইয়ট,' বলল ঝরনা। 'কী করব আমরা, মাসুদ ভাই?'

দরজাটা পরীক্ষা করছে রানা। 'এটা ভেতর দিকে খোলে,' বলল ও। 'এদিক থেকে তালাটা ভাঙা যাবে বলে মনে হয় না। বেরুতে হলে দরজা ভাঙতে হবে।'

'এই টেবিলটা বেশ ভারী,' ওর পিছন থেকে বলল ঝরনা। 'এটার ধাক্কা দিলে কাজ হবে না?'

'হওয়া উচিত,' বলল রানা। 'এসো, দেখি। ওদিকটা তুমি ধরো, এদিকটা আমি।'

দুজন মিলে বাঁধনগুলো খুলে প্রথমে টেবিলটাকে মুক্ত করল ওরা, তারপর দরজার দিকে তাক করে পজিশন নিল।

'এক, দুই, তিন,' বলে একযোগে ছুটল দুজন। দরজার গায়ে প্রচণ্ড বাড়ি খেল টেবিল। পিছিয়ে আনল ওরা টেবিলটা, তারপর আবার ছুটল, একই ভঙ্গিতে আরেকটা ধাক্কা মারল। দরজার একটা কবাটে চিড় ধরল একটু।

'আবার,' ঝরনাকে উৎসাহ দিয়ে বলল রানা। 'মনে হচ্ছে কাজ হবে।'

এবার আগের চেয়ে একটু বেশি পিছিয়ে এল ওরা, তারপর ছুটল একযোগে।

টেবিলের একটা কোণ প্রচণ্ড গুঁতো মারল, কবাটের কাঠ ভেঙে বাইরে বেরিয়ে গেল খানিকটা। টেবিল টেনে নিতে দেখা গেল দরজার গায়ে ছোট একটা গর্ত তৈরি হয়েছে।

'দারুণ,' বলল রানা। 'আর বোধহয় দরকার নেই।' কবাটের কিছু অংশ লাথি মেরে ভেঙে ফেলল ও। ফাঁকের ভিতর হাত গলিয়ে হাতড়াতেই কী হোলে ঢোকানো চাবিটা আঙুলে ঠেকল।

চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলল রানা। 'শোনো, ঝরনা, তুমি এখানে থাকো,' বলল ও। 'কিংবা, আরও ভাল হয়, পাশের কেবিনে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও। ওদিকে দুটো অয়েলস্কিন রয়েছে।' হাত তুলে দেখাল ঝরনাকে। 'ওগুলো দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে টাকার বাণ্ডিলগুলোও নিয়ে যাও। আমি দেখছি ওপরে কী হচ্ছে।'

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, আপনাকে আমি একা...'

'কথা নয়, ঝরনা,' ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'তুমি আহত, তোমার রিফ্লেক্স এখন কোনও সাহায্য করবে না, কাজেই একান্ত বাধ্য না হলে বিপদে ঝাঁপ দেয়ার দরকার নেই।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসের নির্দেশ মেনে নিল ঝরনা। ওয়ালসেফ থেকে ডলারের বাণ্ডিলগুলো নামিয়ে প্রথমে এক করে বাঁধল, তারপর রানার দেখানো অয়েলস্কিনে ভাল করে জড়িয়ে একটা প্যাকেট তৈরি করল। সেটাকেও এক প্রস্থ রশি দিয়ে বাঁধল।

সিধে হলো ঝরনা, প্যাসেজে বেরুবার সময় বলল, 'সাবধানে থাকবেন, মাসুদ ভাই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, খুব সাবধানে।'

দ্বিতীয় কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে ঝরনা দেখল, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রানা। নিজের কাজে মন দিল ও।

উপরে ওঠার সময় রানার কান দুটো সজাগ হয়ে আছে। কিন্তু ইঞ্জিনের আওয়াজ আর সাগরের গুরুগম্ভীর গর্জন ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

সিঁড়ির প্রায় মাথার কাছে পৌঁছে থামল রানা, ঠিক বুঝতে পারছে না কিছু শুনেছে কি না। কয়েক সেকেণ্ড কান পেতে থাকল, তারপর আবার একটু উঠে অত্যন্ত সাবধানে অন্ধকার ডেক বরাবর তাকাল। সন্ত্রস্ত হওয়ার মত কিছুই ওর চোখে পড়ল না। এখানে-ওখানে ঘন ছায়া থাকলেও সামনে পুরোটা ডেক খালি পড়ে আছে। ব্রিজের দিকে তাকাল ও। সেখানেও নেই কেউ।

হুইলটাকে নিশ্চয়ই ফিক্স করে রেখেছে ইকো। তার মানে, আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে, অপেক্ষা করছে, কখন ডেকে উঠে আসে রানা।

চোখের কোণ দিয়ে সামনে, ছায়ার ভিতর, সামান্য নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। ঝট্ করে নিচু হলো, হ্যাচওয়ের উপর ওর শরীর যাতে ফুটে না থাকে।

'হ্যালো, রানা!' ছায়ার ভিতর থেকে ভেসে এল ইকোর কণ্ঠস্বর, তাতে আশ্চর্য এক উল্লাস। নাকি আক্রোশ? 'তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি! আমার পিস্তল তোমাকে কাভার করছে!'

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে তাকাল রানা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এক লাফে

নাগাল পাওয়ার মত কাছে নয় সে। এক ধাপ নীচে নামল ও, ইকো যাতে সহজে টার্গেট প্র্যাকটিস করতে না পারে।

কিন্তু সামনে শত্রু পিস্তল বাগিয়ে ধরে রাখলে কী করে এগোবে? আর এগোতে না পারলে তাকে ধরবেই বা কীভাবে?

'আমি জানতাম, এক সময় ঠিকই আমার ফাঁদে পা দেবে তুমি,' কিছুক্ষণ চুপ করে বলে উঠল ইকো। 'ঝরনার অবশ্য ধারণা, ওকে তোমার উদ্ধার করতে আসার কোনও কারণ নেই। আমি বললাম, তুমি আসবে। তোমার মানসিকতা জনপ্রিয় সিনেমার সস্তা হিরোর মতই, হাততালি পাবার জন্যে যত রকম বোকামি আছে সবই করা তোমার দ্বারা সম্ভব। তা ছাড়া তোমার জানা আছে, ও তোমাকে ভালবাসে। ওকে বাঁচাবার চেষ্টা তোমার করতেই হবে।'

'ভেবেছ ইয়ট নিয়ে পালাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোস্ট-গার্ডের প্রতিটি বোট এখন সাগর চষে ফেলছে তোমার খোঁজে।'

'মিথ্যেকথা বলছ,' জবাব দিল ইকো। 'যে ডাণ্ডা মেরেছি, জ্ঞান ফিরে পেতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে সেগানের। তারপর তোমাদেরকে খুঁজতে এলেও আসতে পারে সে, তবে ততক্ষণে তিনজনেই আমরা পগার পার হয়ে যাব।'

কী বলছে ঠিক বোঝা গেল না, তাই এক মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী বললে? তিনজনেই পগার পার মানে?'

'পগার পার মানে ধরাছোঁয়ার বাইরে,' বলল ইকো। 'তুমি, তোমার প্রেমিকা, আমি—তিনজনই আমরা পালিয়ে যাচ্ছি।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমরা কেন পালাব?'

হেসে উঠল ইকো, তার হাসির মধ্যে অস্বাভাবিক কী যেন একটা আছে বলে মনে হলো রানার। 'পালাতে তোমাদেরকে বাধ্য করা হবে, রানা,' বলল সে। 'কারণ? আমাকে তুমি পালাতে বাধ্য করেছ, তাই! টিট ফর ট্যাট, রানা, টিট ফর ট্যাট!'

তা-ও পরিষ্কার হচ্ছে না। 'কী বলতে চাও, খুলে বলো।' ভাবছে, শয়তানটা কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল?

আবার হাসল ইকো, শুনে গা-টা শিউরে উঠল রানার। 'তোমার জন্যেই আমাকে আমার এই সাজানো বাগান, বিত্ত-বৈভব, ভবিষ্যৎ প্ল্যান-প্রোগ্রাম—সব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, রানা। আমি যে পালাব, পরলোক ছাড়া আর কোথাও কোনও জায়গা তুমি রাখনি। দেড় বছর আগে আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ কোথাও ছিল না, কিন্তু এখন আছে। তখন সহজেই ছাড়া পেয়ে গেছি, কিন্তু এখন দুনিয়ার কোথাও পালিয়ে নিষ্কৃতি পাব না আমি।'

'হ্যাঁ, ধরা তোমাকে পড়তেই হবে। কিন্তু আসলে কী বলতে চাইছ এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না...'

রানাকে থামিয়ে দিল ইকো, বলল, 'তুমি জিতেছ, রানা। আমি হেরে গেছি। লেফটেন্যান্ট মার্লি এখন এফবিআই অফিসে বসে গড়গড় করে সব কথা বলে দিচ্ছে। সানসিটি আর ক্যাটস্‌কিল শহরে তোমার যারা শত্রু ছিল তাদের সবার নাম বলে দিয়েছে সে, তাদের মধ্যে আমার অন্যতম ভরসা, পুলিশ কমিশনার

সাহেবও আছেন।'

'আচ্ছা!'

'ভোর হবার আগেই অ্যারেস্ট হয়ে যাবে সবাই। শেষ খবর জানি, পালাবার চেষ্টা করায় তিনজনকে গুলি করে মেরেছে ফেডারেল পুলিশ, তাদের মধ্যে কমিশনারও থাকতে পারেন। এমনকী আমার ফাইন্যান্সিয়ার ডন ফিউগো গার্পিকে পর্যন্ত অ্যারেস্ট করেছে ওরা। ধূর্ততার সঙ্গে আগে থেকেই সব আটঘাট বেঁধে রেখেছিলে তুমি, আমাদের কাউকে কিছুই টের পেতে দাওনি। অ্যাকশন শুরু হবার পর দেখা গেল, আমাদের কেউ পায়ের তলায় আর মাটি খুঁজে পাচ্ছে না।'

'অনেক বাড়িয়ে বলছ,' বলল রানা।

'যত যাই হোক, স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি—ডিকো ভিটোরির সাম্রাজ্য ভেঙেচুরে ছারখার করে দেয়ার পেছনে তোমারই তো হাত ছিল, কাজেই আমার পরাজয়টা আমি তোমাকে নিয়েই উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'আবার সেই হেঁয়ালি...'

'না, হেঁয়ালি নয়, রানা। আগুন আর পানি বোঝো তো?' আবার হেসে উঠল ইকো, শুনে শির শির করে উঠল রানার গা। ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে সে, হাতের পিস্তল দিয়ে কম্প্যানিঅনওয়ে হ্যাচটাকে কাভার দিচ্ছে। 'প্রথমে আগুনে পুড়ছি আমরা, রানা। তারপর যাব সলিলসমাধিতে।'

'তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?' একের পর এক দ্রুতগতি ঢেউ অস্থির করে রেখেছে ইয়টকে। সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল রানা, পরপর দুটো গুলি করল।

কীভাবে যেন টের পেয়ে গিয়ে লাফিয়ে একপাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ইকো। দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরুল তার গলা থেকে, তবে কতখানি আহত হয়েছে ঠিক বোঝা গেল না।

আবার ছায়ার ভিতর ফিরে গেছে ইকো। 'তুমি একটা কাপুরুষ, রানা!' বলল সে। 'আমি তোমাকে গুলি করব না জেনেও তুমি আমাকে গুলি করলে। কাপুরুষ!'

'আর তুমি সুপুরুষ! একের পর এক নিরস্ত্র, দুর্বল মেয়েমানুষের গলায় ফাঁস পরিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছ টয়লেটের চৌকাঠ থেকে। গাড়ি চাপা দিয়ে মেরেছ নিরীহ বৃদ্ধকে। গুলি করে মেরেছ অসহায় মলি আর সাইমনকে। আমাকে তুমি গুলি করবে না, না? পিস্তল হাতে এমনি-এমনিই বেরিয়ে আসছিলে ছায়া...'

'সত্যিই করতাম না, কারণ...'

'তুমি জানো, তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করছি না আমি,' বলল রানা, তার পরেও একের পর এক মিথ্যেকথা বলে যাচ্ছ। নিজের বাঁচার ব্যবস্থা ঠিকই করে রেখেছ তুমি, কিন্তু জেনে রাখো আজ আর তোমার রক্ষা নেই। কোনও কৌশলেই আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আমি এসেছি খুনের বদলা নিতে।'

রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি, এমনি ভঙ্গিতে বলল ইকো, 'আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। যে-বোট নিয়ে ইয়টে এসেছি সেটা ভাসিয়ে দিয়েছি আমি

পানিতে,' বলল ইকো, 'কেন বলো তো? বাঁচতে ইচ্ছে হলেও কোনও সুযো
যাতে না পাই।'

'প্রলাপ বকছে নাকি হারামজাদা...' বিড়বিড় করছে রানা।

'ইয়টে আগুন দিয়েছি, রানা,' বলল ইকো, এখন আর হাসছে না। 'অ
বেশিক্ষণ লাগবে না, গোটা ইয়ট দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। দুটোই য
উপভোগ করতে না চাই আমরা, যে-কোনও একটা বেছে নিতে পারি—হয় পু
মরি, নাহয় ডুবে। তীর থেকে এখন আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি।'

যতটুকু শোনার দরকার ছিল, শুনেছে রানা। পিছলে সিঁড়ি থেকে নীচে
প্যাসেজে নেমে এল। চোখে-মুখে উদ্বেগ নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল ঝরনা।

'ব্যথা পেলে, মাসুদ ভাই?'

সিধে হয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'শোনো, ঝরনা, এখন মাথাটা ঠাণ্ডা রাখ
সময়। ইকো বলছে, ইয়টে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সত্যি না-ও হতে পারে
সত্যি হলে সাঁতরে তীরে পৌঁছাতে হবে। তোমার কী অবস্থা, সাঁতরাতে পারবে?'

হাসল ঝরনা। 'পারব না মানে! রোজ তিন কিলোমিটার তা হলে কী জ
সাঁতরাই? আমাকে নিয়ে কোনও চিন্তা করবেন না।'

'এখানে নিশ্চয়ই কোথাও লাইফবেল্ট আছে। এসো, খুঁজে বের করি।'

'খুঁজতে হবে না, আছে,' বলে দ্বিতীয় কেবিনের ভিতর ঢুকল ঝরনা, গি
নিয়ে রানাও। তিনটে লাইফবেল্ট আগেই আলাদা করে রেখেছে ঝরনা। ওগুলে
পাশেই রয়েছে অয়েলস্কিনে মোড়া বড়সড় ডলারের প্যাকেট।

'একটার সঙ্গে ডলারের প্যাকেটটা বাঁধো,' বলল রানা। 'বাকি দুটো আমাদে
জন্যে।'

'আরে, সত্যিই আগুন লাগিয়েছে, মাসুদ ভাই,' হঠাৎ বলল ঝরনা। 'ধোঁয়
গন্ধ পাচ্ছি।'

প্যাসেজে বেরুল রানা। দেখল কাঠের মেঝের ফাঁক-ফোকর গলে ধোঁ
উঠতে শুরু করেছে। ঝুঁকে হাত ছোঁয়াতে গরম লাগল মেঝে। কেবিনে ফিরে এ
ও। 'ইয়ট থেকে পানিতে নামতে হলে প্রথমে ডেকে উঠতে হবে,' বলল
লাইফবেল্ট পরতে সাহায্য করছে ঝরনাকে। 'কিন্তু সিঁড়ির মাথাটা পাহারা দি
ইকো। তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি দেখি, ওখান থেকে ওকে সরাতে প
কি না।'

'তবে, মাসুদ ভাই, সাবধানে,' বলল ঝরনা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলে কেবিন থেকে বেরুতে যাবে রানা, অকস্মাৎ একর
ঝাঁঝাল ধোঁয়া ঢুকে পড়ল ভিতরে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, দুজনেই খক
করে কাশছে।

'চলো, ঝরনা, এখানে তুমি থাকতে পারবে না।'

কাশতে কাশতে রানার পাশে চলে এল ঝরনা। কেবিন থেকে বেরি
প্যাসেজ ধরে ছুটল ওরা। ধোঁয়ার ভিতরে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে সিঁড়িটা।

লাইফবেল্ট পরেনি রানা। ইকোকে জানাতে চায় না ওদের কাছে ওগু
আছে। সিঁড়ির মাথার কাছে উঠে এসে একটা ধাপে নিজের বেল্টটা রাখ

তারপর একটু উঁচু হয়ে ডেক বরাবর তাকাল।

ব্রিজ থেকে লাল একটা আভা বেরুচ্ছে। আগুনের আঁচ এত তীব্র, ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে সামনে তাকাবার সময় হাত তুলে চোখ আড়াল করতে হলো রানাকে।

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তবে শিখাগুলোর গর্জন শুনতে পাচ্ছে। ধীরে ধীরে ব্রিজটাকে গ্রাস করছে আগুন। ডেকেও ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

সাবধানে সিঁড়ির মাথায় উঠল রানা। এখনও কোথাও ইকোকে দেখতে পাচ্ছে না।

'ঝরনা!' চাপা গলায় ডাকল রানা। পাশে চলে এল ঝরনা, ইঙ্গিতে ওকে নিচু হতে বলল ও। 'শয়তানটা কোথায় লুকিয়েছে বুঝতে পারছি না। এসো, আমরা কেটে পড়ি। প্যাকেটটা দাও আমাকে।'

'তোমার লাইফবেল্ট,' বলে রানার দিকে ওটা বাড়িয়ে ধরল ঝরনা।

হাত বাড়িয়ে নিতে যাবে রানা, আবছা মত একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল, ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে হেঁটে আসছে। ইকোই হবে। চোখে ধোঁয়া নিয়ে সেদিকে একটা গুলি করল ও, লাগাতে পারবে কি না সন্দেহ আছে। তবে দেখল গুলি হচ্ছে দেখে পিছু হটেছে ইকো, ধোঁয়ার ভিতর এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না।

বেল্ট ছেড়ে দিয়ে খপ করে ঝরনার একটা হাত ধরে টান দিল রানা, ডেকের উপর দিয়ে প্রায় ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। 'তুমি আগে লাফ দাও পানিতে,' বলল ও।

ঝরনা ইতস্তত করছে দেখে হাতের পিস্তল ডেকে রাখল রানা, তারপর দু'হাতে ধরে শূন্যে তুলল ওকে, পরমুহূর্তে রেইলিঙের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল সাগরে।

প্যাকেটটা নেওয়ার জন্য দ্রুত ফিরে এল রানা, পিস্তলটার কথা মনে নেই। ঝুঁকল, প্যাকেট নিয়ে সিধে হচ্ছে, এই সময় ওকে দেখে ফেলল ইকো।

'নড়বে না!' গর্জে উঠল সে।

ঝট করে ডানদিকে সরে গেল রানা, রেইলিঙের কাছে পৌঁছেই হাতের প্যাকেট ছুঁড়ে দিল সাগরে। নিজেও লাফ দেওয়ার জন্য হাত রেখেছে রেইলিঙে, গর্জে উঠল ইকোর পিস্তল।

পিঠে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল রানা। বুঝল, ঠিক জায়গাতেই লাগিয়েছে ইকো, পাঁজর ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েছে বুলেট; আর কী ক্ষতি করেছে কে জানে! তীব্র ব্যথায় অন্ধকার দেখছে ও চোখে। শরীরটা দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল উত্তপ্ত ডেকে।

অসম্ভব গরম হয়ে উঠেছে ডেক। ওর ভিজে কাপড় থেকে মাছ ভাজার মত চিড়চিড় করে আওয়াজ বেরুচ্ছে। উঠে বসবার জন্য ডেকে হাত রাখতেই জ্বলে উঠল তালু, এখুনি ফোসকা পড়ে যাবে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল ও, রেইলিং টপকে সাগরে পড়বার চেষ্টা করছে।

ছুটে এসে ওর নাগাল পেয়ে গেল ইকো, আসার পথে লাথি দিয়ে রানার পিস্তলটা ফেলে দিল সাগরে। খপ্ করে রানার গোড়ালি ধরে টান দিয়ে ডেকে

এনে ফেলল আবার। 'কোথাও যাচ্ছ না!' গর্জে উঠল সে, হিংস্র বাঘের মত লাগছে তাকে এখন। 'আমার সঙ্গে এখানে তোমাকেও পুড়ে ছাই হতে হবে, রানা!'

তার উরুসন্ধি লক্ষ্য করে পা ছুঁড়ল রানা। ওখানে না লাগলেও, ইকোর হাঁটুর নীচের হাড়ে ওর জুতোর কিনারা প্রায় গেঁথে গেল। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে পিছন দিকে ছিটকে পড়ল সে, সেই সঙ্গে ওর হাতের পিস্তল থেকে একটা গুলি বেরিয়ে গেল।

এক গড়ান দিয়ে ইকোর বুকে উঠে পড়ল রানা, ডেকের সঙ্গে চেপে রাখল তাকে। ব্যথা আর আক্রোশে ফুঁসছে, পিস্তল ধরা হাতটা উঁচু করবার চেষ্টা করল ইকো। তার কবজিটা দু'হাতে ধরে চাপ দিচ্ছে রানা, আহত অবস্থায় পারছে না জোরে। অনেক কষ্টে নামিয়ে আনল হাতটা মেটাল গার্ড-এর গায়ে। ইয়টের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে রয়েছে মেটাল গার্ড।

প্রচণ্ড উত্তাপে প্রায় লাল হয়ে উঠছে ওটা, ইকোর আর্তচিৎকারের সঙ্গে চামড়া পোড়ার তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে। শরীরটা যতই মোচড়াক, কবজিটা ওখান থেকে সরতে দিল না রানা।

মুক্ত হাত দিয়ে ওর কানের পাশে যেন হাতুড়ির বাড়ি মারল ইকো, কিন্তু তবু তাকে ছাড়ল না রানা। একটু পরেই অসহ্য যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে আঙুলগুলো খুলল সে, পিস্তলটা সাগরে পড়ে গেল।

কবজি ছেড়ে দিয়ে সিধে হওয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পাঁজরের ব্যথাটা এতই তীব্র হয়ে উঠল, উঁচু করা মাথাটা সশব্দে পড়ে গেল ডেকে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

একটু পরেই জ্ঞান ফিরে পেল রানা, তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে অনুভব করল পিঠে ফোসকা পড়ছে। শরীরের দু'পাশে হাঁটু গেড়ে ওর উপর ঝুঁকে রয়েছে ইকো; লোমশ, পেশল দুটো হাত দিয়ে টিপে ধরেছে ওর গলা।

ইকোর দুই কড়ে আঙুল ধরে পিছনদিকে ঝাঁকি দিল রানা, কড়াৎ শব্দে ভাঙলো আঙুলদুটো। গলাটা মুক্ত হলো। আবার ওর গলা ধরবার জন্য হাতড়াচ্ছে সিরিয়াল খুনি, নাকের উপর দড়াম করে ঘুসি মারল রানা। ডেকের উপর পিঠ দিয়ে পড়ল ইকো। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল নাক দিয়ে।

রেইল ধরে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল রানা।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ইকোও, খেপা ষাঁড়ের মত রানার দিকে ছুটে আসছে। একটুর জন্যে নাগাল পেল না, বুকে লাথি খেয়ে কেঁউ শব্দ করে ছিটকে গিয়ে পড়ল আগুনের ভিতর। জামা-কাপড়ে আগুন ধরে যাওয়ায় চেঁচিয়ে উঠল অসহ্য যন্ত্রণায়। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল, অন্ধের মত দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে রানার দিকে। রেইলিং টপকে সাগরে লাফিয়ে পড়ল রানা।

ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়ায় আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল অনেকখানি। সারফেসে উঠে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে পানি সরাল, তারপর সাগরে পিঠ দিয়ে চিৎ হলো। হতাশ বোধ করছে, এরকম আহত অবস্থায় পনেরো-বিশ কিলোমিটার কীভাবে সাঁতরাবে?

ইয়ট এখন মশালের মত জ্বলছে, আলোকিত করে রেখেছে আশপাশের

পানি। পা ছুঁড়ে আগুনের আঁচ ও ইয়ট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে রানা।

'মাসুদ ভাই!'

রানার কাঁধ জড়াল একটা হাত। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রানা। ওর পাশে চলে এসেছে ঝরনা, অপর হাতে ভারী প্যাকেটটা ধরে আছে।

'ওহ্, মাসুদ ভাই! তুমি আহত... গুলি লেগেছে?' ঝরনার ভেজা চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

'মারাত্মক কিছু নয়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'খুনিটা কোথায় জানো?'

'বোধহয় ইয়টেই আছে।'

'তোমার পিস্তল?'

ম্লান সুরে ঝরনা বলল, 'পানিতে পড়ার সময় হাত থেকে ছুটে গেছে। দুঃখিত, মাসুদ ভাই।'

'দুঃখিত আমিও, ঝরনা,' বলল রানা। 'আমারটাও নেই।'

হাত বাড়িয়ে ডলারের প্যাকেটটা টেনে নিল ও। ওটার সাহায্য পাওয়ায় মাথাটা পানির উপর তুলে রাখতে পারছে। পা দুটো ভারী সিসার মত ঝুলে আছে, পানিতে ভেসে থাকা প্যাকেটটা না থাকলে ডুবে যেত রানা।

'আমার কাছাকাছি থাকো, ঝরনা,' বলল ও। 'কম হলেও, রক্ত পড়ছেই। ঠিক সুস্থ বোধ করছি না।'

'চিৎ হন, মাসুদ ভাই,' বলল ঝরনা। 'আমি আপনাকে ধরে রাখতে পারব। তবে প্যাকেটটাও ছাড়বেন না।'

পানিতে চিৎ হওয়ার সময় ইকোকে দেখতে পেল রানা। গায়ে তার এখনও অসুরের শক্তি, ক্ষিপ্রগতিতে ওদের দিকে সাঁতরে আসছে সে, চোখ দুটো থেকে হলুদাভ দ্যুতি বেরুচ্ছে, ঠোঁট দু'পাশে সরে যাওয়ায় সাদা দাঁত ঝকঝক করছে।

'সাবধান, সরে যাও!' হাঁপাচ্ছে রানা, এক হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল ঝরনাকে।

'যাচ্ছিস কোথায়, দুজন একসঙ্গে ডুবব!' কর্কশ চিৎকার বেরুচ্ছে ইকোর গলা থেকে, দ্রুত কাছে চলে আসছে সে। 'তুই শালা আমার বাপকে মেরেছিস, আমাদের ব্যবসা ধ্বংস করেছিস, আমার সমস্ত আশ্রয় কেড়ে নিয়েছিস—পালাবার কোনও জায়গাই রাখিসনি! তোকে নিয়েই মরব আমি!'

রানার কাঁধ আঁকড়ে ধরল ইকোর হাত।

তৈরি ছিল রানা, নাগালের মধ্যে আসতেই নাক বরাবর লাথি চালাল, কিন্তু ওর শক্তি ইতিমধ্যে অনেক কমে গেছে। লাথিতে তেমন কাজ হলো না, এমনকী শত্রুকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতেও পারল না। অনুভব করল ইকোর আঙুলগুলো ওর গলার চারধারে চেপে বসছে।

একসঙ্গে ডুবল ওরা, দু'পা দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়েছে ইকো রানার কোমর, দু'হাতের আঙুল ডেবে যাচ্ছে ওর গলার গভীরে।

ওদেরকে ডুবে যেতে দেখল ঝরনা, মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে ডাইভ দিয়ে পিছু নিল, কিন্তু লাইফবেল্ট পরে থাকায় সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে এল সারফেসে।

বাঁধন খুলে বেল্ট মুক্ত হওয়ার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল ঝরনা, কিন্তু পানিতে ভিজে গিঁটগুলো শক্ত হয়ে গেছে, একটু ঢিল পর্যন্ত করা যাচ্ছে না।

'মাসুদ ভাই!' আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ঝরনার গলা থেকে, চেষ্টা করল ডুব দিতে ও, কিন্তু আবার বেল্টটা ওকে তুলে আনল সারফেসে।

এই সময় হঠাৎ করে পানির নীচে আলোড়ন উঠল। মুহূর্তের জন্য দুজনকেই দেখতে পেল ঝরনা, এখনও পরস্পরকে জড়িয়ে রেখেছে। তারপর সারফেসে উঠল ওরা। ঝরনা দেখল, রানার এক হাত ইকোর মুখের সামনে। পরমুহূর্তে ওর দু'টো আঙুল ঢুকে গেল হলদেটে চোখের ভিতর। সামান্য ধস্তাধস্তির পর আবার ডুবে গেল ওরা।

অপেক্ষা করছে ঝরনা। ওর বুকের ভিতরটা অবিরত ধড়ফড় করছে। ভয়ে মরে যাচ্ছে রানার জন্য। পানির নীচ থেকে রাশি রাশি বুদ্বুদ উঠে আসছে সারফেসে, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও।

দ্বিতীয়বার সারফেসে উঠল ওরা। ইকো এখন আর লড়ছে বলে মনে হলো না। রানার শরীরটাকে হাত-পা দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে সে। ওদিকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছে রানা।

ওদের দিকে সাঁতরে গেল ঝরনা, আবার ডুবে যাওয়ার আগে নাগাল পেতে চাইছে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করা সত্ত্বেও দেরি হয়ে গেল। ঝরনার বাড়ানো হাতের আঙুল থেকে রানা যখন আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, আবার ডুবে গেল দুজনেই।

আর কোনও আলোড়ন নেই পানিতে। এভাবে অনেকক্ষণ কাটল। লাশ দুটো সম্ভবত ভেসে গেছে দূরে, রানার জন্য একবুক কান্না নিয়ে ভাবল ঝরনা। তারপর হঠাৎ দেখল সারফেসে উঠল একজন, উপুড় হলো, আধো ডোবা অবস্থায় ভাসছে ওর পাশে।

কে ও? চিনতে না পেরে ঝরনার মনে হলো, পাগল হয়ে যাবে ও।

হাত বাড়াল ঝরনা, চিৎ করল শরীরটাকে, পরম স্বস্তিতে ফুঁপিয়ে উঠল অচেতন রানার রক্তশূন্য মুখ দেখে।

একহাতে ওকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে ঝরনা, আরেক হাতে পানি কেটে ভাসমান প্যাকেটটার দিকে এগোচ্ছে। নাগালের মধ্যে পেয়ে ওটার উপরেই রানার মাথাটা তুলে দিল।

বিশ মিনিট পর স্পিড বোট নিয়ে ইয়টের আগুন দেখতে এল মারফি সেগান। তখনও ঠিক ওভাবেই রানাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাচ্ছে ঝরনা।

***